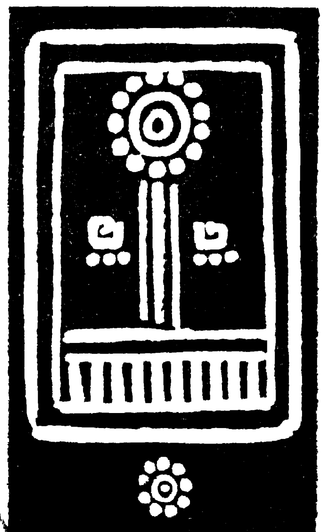
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

দেশপ্রিয়
যতীন্দ্রমোহন



রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

DESHAPRIYA JATINDRA MOHAN

A Bengali biography of

Deshapriya Jatindra Mohan Sengupta

By MONI BAGCHEE

প্রকাশক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ
জুলাই, ১৯৬২

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রভাত কর্মকার
আখ্যাপত্রের অলঙ্করণ : যামিনী রায়

মুদ্রক :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

ছয় টাকা মাত্র

লোককান্ত নেতা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের

পুণ্যস্মৃতিতে

॥ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

গৌতম বুদ্ধ, রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, রমেশচন্দ্র, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রবির আলো, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, শিক্ষাগুরু আশুতোষ, নিবেদিতা, নিবেদিতা-নৈবেদ্য, দেশবন্ধু, যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ, শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার, বীর সাভারকর, জননায়ক জওহরলাল, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র, সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক, সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী, লোকমাতা নিবেদিতা, সুধীরকুমার সেন, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ, মহাচীনে নেহেরু, ভারতরত্ন ইন্দিরা, ছোটদের গৌতম বুদ্ধ, ছোটদের ছত্রপতি, ছোটদের বঙ্কিমচন্দ্র, ছাত্রদের আশুতোষ, ছোটদের অরবিন্দ, ছোটদের বার্নার্ড শ, আমাদের দেশবন্ধু, আমাদের বিদ্যাসাগর, নানাসাহেব, আমাদের বীর সৈনিক, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, সিপাহী বিদ্রোহ, কেমন করে স্বাধীন হলাম, অমর জীবন, বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, কাজলরেখা, লীলা-কঙ্ক।

OUR BUDDHA, SISTER NIVEDITA, SWAMI ABHEDANANDA.

॥ পরবর্তী গ্রন্থ ॥

জলছবি

(লেখকের আত্মচরিত)

কিছুকাল পূর্বে আমার 'দেশবন্ধু' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পরে অনেকেই আমাকে দেশবন্ধুর প্রিয়তম সহকর্মী দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সম্পর্কে একটি জীবনী লিখবার জন্য অনুরোধ করেন। এঁদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং দেশপ্রিয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও কলকাতা পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র শ্রীসন্তোষ কুমার বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশপ্রিয় যে বছরে মারা যান তখন ইনিই কলকাতা পৌরসভার মেয়র ছিলেন। তাঁর কাছে দেশপ্রিয় সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি।

পৃথ্বীশচন্দ্র রায় দেশবন্ধুর জীবনী লিখেছিলেন। দুঃখের বিষয়, দেশপ্রিয় সম্পর্কে আজ পর্যন্ত ঠিক ঐ ধরনের একখানি জীবনীও লেখা হয়নি। বাংলায় অবশ্য তাঁর একখানি জীবনী আছে। এই বইটির লেখক শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ধর। বইটি তথ্যবহুল হলেও, এর দৃষ্টিভঙ্গী বা সিদ্ধান্ত কিছুই নিরপেক্ষ নয়। দেশবন্ধুর তুল্য হৃদয়-সম্পদে অতুলনীয় বাংলার এই জনপ্রিয় নেতা সম্পর্কে আরো দুই-একটি জীবনী লিখিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। আমার বিশেষ সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সান্নিধ্যে আসবার ও তাঁকে জানবার। তাছাড়া, কিরণশঙ্কর রায় ও সমকালীন আরো অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার কাছ থেকে দেশপ্রিয় সম্পর্কে অনেক কথা জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থে আমি বিশেষভাবে দেশপ্রিয়ের রাজনৈতিক জীবনকে তাঁর যুগের পটভূমিকায় দেখবার ও দেখাবার চেষ্টা করেছি।

৯০, বাগুইআটি রোড
কলকাতা ২৮

মণি বাগচি

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

কাজী নজরুল ইসলাম

'দেশপ্রিয় নাই' শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি
আকাশে ললাট হানিয়া কাঁদিছে ভারত চির-অভাগী ॥

মায়ের লাগিয়া প্রাণ দিয়া রণে মা'র কোলে মাথা রাখি
ঘুমাতে এসেছে শ্রান্ত সেনানী, জাগায়ো না তারে ডাকি।
দেশের লাগিয়া দিয়াছে সকলি দেয়নি নিজেরে ফাঁকি,
তাহারি শুভ্র শান্ত হাসিটি অধরে রয়েছে লাগি ॥

স্বার্থ অর্থ বিলাস বিভব গৌরব সম্মান
মায়ের চরণে দিয়াছে সে বীরে অকাতরে বলিদান,
রাজ-ভিখারীর ছিল সম্বল শুধু দেহ আর প্রাণ
তাই দিয়ে দিল শেষ অঞ্জলি দানবীর বৈরাগী ॥

আপনার ঘরে পায়নি থাকিতে প্রিয় স্বজনের পাশে,
কাটালো জীবন রুদ্ধ ভবনে বদ্ধ প্রাচীর-গ্রাসে,
আজ সে মুক্ত, বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে হাসে,
বন্ধন হলো নন্দন-ফুলহার তার ছোঁওয়া লাগি ॥

দেশবন্ধুর পাশে জ্বলিছে দেশপ্রিয়ের চিতা,
এতদিন পরে বক্ষে এসেছে দুঃখের সাথী মিতা,
ঐ সাথে জ্বলে ভারত-ভাগ্য, শোকে দীপান্বিতা,
নিভে যাবে চিতা রয়ে যাবে ধূম চিরদিন বুকে জাগি ॥

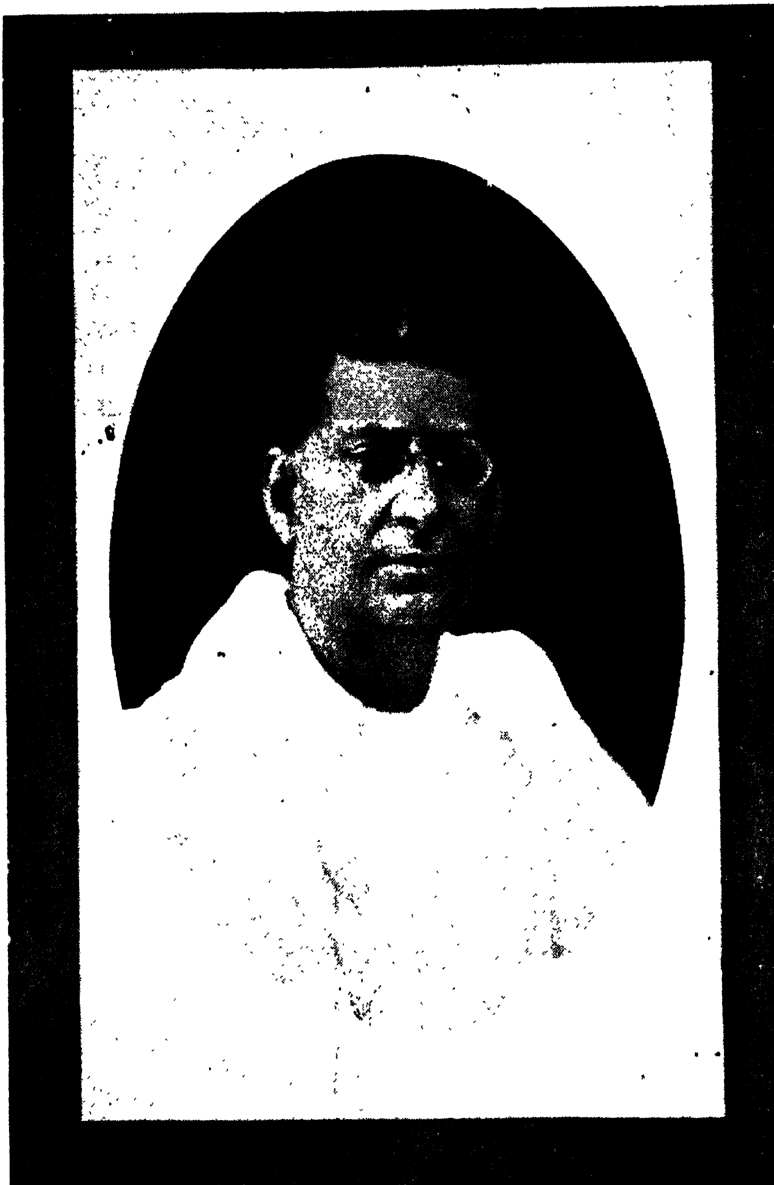
তুমি এসেছিলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হেতু
পদ্মা ও ভাগীরথীর মাঝারে তুমি বেঁধেছিলে সেতু,
দুর্দিনের এ ভগ্ন দুর্গে তুমি ছিলে জয়কেতু,
ফিরিয়াছ দ্বারে দ্বারে সন্ন্যাসী ঘরে ঘরে ঘুম ভাঙি ॥

এক যতীন্দ্র অযুত পরাণে ছড়ায়ে পড়েছে আজ
জনসমুদ্র কল্লোলে তারি শঙ্খ উঠেছে বাজি,
হে বীর, তোমার সাধ অপূর্ণ, মোরা যেন পারি করিতে পূর্ণ,
মৃত্যুতীর্থ হতে এসো তুমি অমর জীবন মাগি' ॥*

* মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র ১৩৪০



ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন



দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন



ত্রিমুকুট শোভিত যতীন্দ্রমোহন



অন্তিমশয়নে দেশপ্রিয়

॥ এক ॥

'যতীন শুধু নিখাদ সোনা নয়, ওকে ঘষলে চন্দনের গন্ধ পাওয়া যায়।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের এই সুন্দর উক্তিটির মধ্যেই যেন আভাসিত হয়েছে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সমগ্র চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ বীর যোদ্ধার স্মৃতি তার স্বদেশবাসীর মানসপটে আজ ম্লান বললেই হয়। দেশপ্রিয় আজ শুধু বিস্মৃত নন, কতকটা উপেক্ষিতও বটেন। অথচ কে না জানে যে, দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে সমগ্র বাংলা তাঁকেই নেতৃত্বে বরণ করেছিল। সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সেদিন তাঁর প্রতিষ্ঠা বড়ো কম ছিল না। মহাত্মা গান্ধী তো নিজের হাতেই যতীন্দ্রমোহনের মস্তকে সম্মানের ত্রিমুকুট পরিয়ে দিয়ে তার নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সেদিন, যেদিন দেশবন্ধুর অকালপ্রয়াণে সারা বাংলা অসহায় বোধ করেছিল। দেশবন্ধুর পর দেশপ্রিয়ের তুল্য এমন সর্বজনপ্রিয় নেতা এদেশে দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না—এই সত্যটি আজ মুক্তকণ্ঠেই ঘোষণা করা দরকার।

রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশবন্ধুর জীবিতকালেই দেশপ্রিয় বাংলার অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন--এটা তাঁর পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। চট্টগ্রামের তরুণ যতীন্দ্রমোহন যে সমগ্র বাংলার একজন জনপ্রিয় নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সে শুধু তাঁর দেশহিতৈষিতার জন্য। তিনি নির্ভীক নেতা ছিলেন। তিনি যা সত্য মনে করতেন, শাস্তির ভয়ে তা বলতে নিবৃত্ত থাকতেন না। এজন্য

তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। রাজরোষ ও নির্যাতনে তিনি চিরকাল অবিচল ছিলেন। তাঁর অন্তরের তীব্র দেশপ্রেমকে, অথবা দেশসেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা ইংরেজ সরকারের পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর হয়নি।

যতীন্দ্রমোহন শুধু নির্ভীক ছিলেন না, একজন সত্যবাদী নেতা হিসাবেও তিনি ইংরেজ রাজপুরুষদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। রাজনীতিতে কপটতার স্থান আছে, সময় সময় তার প্রয়োজনীয়তাও ঘটে থাকে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ যতীন্দ্রমোহন সত্যের পথেই বিচরণ করতেন, কপটতার পথে কদাচ নয়। অনেক সত্য তথ্য আছে, যা জানলেও যখন-তখন প্রকাশ করলে, তাতে দেশের হিত হয় না। কিন্তু যে-সত্য বলা দেশহিতের জন্য আবশ্যক, ভয়ে তা বলতে নিরস্ত থাকা অনুচিত। যতীন্দ্রমোহন এরূপ সত্য বলতে কখনো পরাঙ্মুখ হতেন না। এইটাই ছিল তাঁর চরিত্রের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। খুব কম নেতার জীবনে বা আচরণে আমরা এ জিনিস লক্ষ্য করেছি।

তাঁর শেষ যে শাস্তি হয়, যা মরণান্ত শাস্তি, তা বিনা বিচারে ও বিনা স্পষ্ট অভিযোগে হয়েছিল। চট্টগ্রামের হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুট ও অনেকের সম্পত্তি বিনাশের পর যতীন্দ্রমোহন একাধিকবার বক্তৃতায় ও ছাপার অক্ষরে কোনো কোনো রাজকর্মচারীদের ও অন্য অনেক লোকের বিরুদ্ধে যা প্রকাশ করেছিলেন তা ছিল নির্ভেজাল সত্য। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হতে পারত এবং তাহলে তিনি যা প্রকাশ করেছিলেন, তা যে প্রত্যাহার করতেন না তাও নিশ্চিত। কিন্তু সত্যের সম্মুখীন হতে সরকার পক্ষই ভীত হয়েছিলেন; তাই গভর্নমেণ্ট তখন দেশপ্রিয়ের নামে মোকদ্দমা করেন নি, তাঁর বিচার হয় নি। পরে অবশ্য তদন্ত কমিটির রিপোর্টে যা প্রকাশ পেয়েছিল তা পাঠ করে অনেকেই জানতে পারেন যে, চট্টগ্রামে হিন্দুনির্যাতনের ঘটনাবলী সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন আগাগোড়া সঠিক কথাই বলে এসেছেন

নির্ভীকতা বা সত্যবাদিতাই যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বের একমাত্র কারণ ছিল না। দেশহিতকর কাজ অন্তরের সঙ্গে করতে গেলে অনেক সময় কেবল যে নিজের শক্তি ও সময় অকাতরে দিতে হয় তা নয়, টাকাও দিতে হয়, কখনো কখনো সর্বস্বান্ত হতে হয়। যতীন্দ্রমোহনের পুঁজিপাটা যা ছিল তা তিনি দেশের হিতের জন্য ব্যয় করেছিলেন, ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন, ব্যারিস্টারিতে পসার ছিল, তাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধুর পদাঙ্কই তিনি অনুসরণ করেছিলেন। দেশবন্ধুর মতো দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করে দেশপ্রিয়কেও সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল। বাংলাদেশে দেশবন্ধুর পর তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় সর্বত্যাগী নেতা। দেশবন্ধু ত্যাগ করেছিলেন চূড়ান্ত ভোগ-বিলাসিতার পর এবং প্রৌঢ় বয়সে। দেশপ্রিয় ত্যাগের বিভূতি মেখেছিলেন যৌবনকালেই। দুঃখের বিষয়, আমরা দেশবন্ধুর ত্যাগটাকেই ত্যাগ বলে থাকি, দেশপ্রিয়ের ত্যাগের তেমন মূল্য কখনো দিই নি।

নির্ভীকতা, সত্যবাদিতা ও ত্যাগেই যে তিনি বড়ো ছিলেন তা নয়, আপাদমস্তক দেশপ্রিয় একজন খাঁটি বাঙালী ছিলেন, যেমন ছিলেন দেশবন্ধু। তাঁর হৃদয়ের ঔদার্য যেমন ছিল, তেমন ছিল তাঁর সরলতা। এমন বিনম্র ও মধুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি যে, যে কেউ একবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তার পক্ষে দেশপ্রিয়ের অনুরাগী ও অনুগামী না হওয়া কঠিন ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল যা তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরও মুগ্ধ করত। সেদিনের বাংলার রাজনীতিতে উপদলীয় স্বার্থ ও কলহের ফলে যে হলাহল উঠেছিল, তার সবটাই নীলকণ্ঠের মতো দেশপ্রিয় তাঁর নিজের কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব ছিল এইখানেই।

দেশপ্রিয়ের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পরে যথাস্থানে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এখানে শুধু এই কথাটাই বলব যে, তাঁর অকালমৃত্যুতে বাংলার যে ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ হয় নি এবং

তাঁর স্থান অধিকার করতে সমকালীন বাংলার নেতাদের মধ্যে আমরা আর কাউকে পাই নি। করতালি মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে তিনি তাঁর দেশসেবার আসন কোনদিনই পাতেন নি। দেশের সেবা করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বদা অকুতোভয়ে সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন এবং দেশমাতৃকার চরণে স্বীয় জীবনকে আহুতিস্বরূপ প্রদান করে দেশ-সেবার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে এমন একটি বলিষ্ঠ চরিত্রের ও বহুগুণের আধার মানুষ আমরা খুব কমই দেখেছি। তিনি শুধু স্মরণীয় নন, সর্বকালের বন্দনীয় একজন আদর্শ নেতা। সেই প্রিয়দর্শন, মিতবাক্ দেশপ্রিয়কে বিস্মৃত হওয়া, বা তাঁর স্মৃতির প্রতি উপেক্ষা বা অনাদর প্রকাশ করা, তাঁর স্বজাতির পক্ষে কি অগৌরবের কথা নয়?

যতীন্দ্রমোহনের কথা বলবার আগে সর্বাগ্রে তাঁর স্বনামধন্য পিতা যাত্রামোহন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ তাঁর পিতার বহুবিধ গুণের, বিশেষ করে তাঁর দেশপ্রেমের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন। তাঁর সময়ে চট্টগ্রামের অবিসম্বাদী জননায়ক ছিলেন যাত্রামোহন সেনগুপ্ত। চট্টগ্রামের সুসন্তান তিনি এবং এখানকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নে তিনিই ছিলেন সকলের পুরোভাগে। ‘সকলের নেতা বাবু যাত্রামোহন’ এই লোকসঙ্গীতে যাত্রামোহনের খ্যাতি একদা সমগ্র চটগ্রামে ঘোষিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

যাত্রামোহনের কথা বলতে হলে পিছনের ইতিহাস একটু বলতে হয়। বলতে হয় বাংলার রাজনৈতিক জাগরণের কথা, আর সেইসঙ্গে স্মরণ করতে হয় সেদিনের বাংলার সেই মুকুটহীন সম্রাটকে যিনি সূচনা করেছিলেন এই জাগরণের। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই মুকুটহীন সম্রাট। রাজনীতিতে যাত্রামোহন ছিলেন এঁরই

অনুগামী। বস্তুত আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার প্রত্যেকটি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী। রাষ্ট্রগুরুকে বাদ দিয়ে বাংলার রাজনৈতিক জাগরণের কথা চিন্তাই করা যায় না।

শুধু বাংলার বলি কেন, প্রকৃতপক্ষে নবীন ভারতের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু সুরেন্দ্রনাথ। সে একদিন ছিল যখন 'সুরেন বাঁড়ুজ্যে'—এই নামটি উচ্চারণ করলেই যুবকদের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে যেত। তাঁর বক্তৃতা শুনে মেতে উঠত না এমন লোক—কি বৃদ্ধ, কি যুবা ও কি বালক—সেদিন বিরল ছিল। সুরেন্দ্রনাথের কম্বুকণ্ঠই একদিন দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ও দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত করেছিল। এ-কথা সর্বজন-স্বীকৃত যে, তিনিই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মাবলম্বীর মধ্যে জাতীয়তার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এক অপরিমিত শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। মেধায় ও মনীষায় সমুজ্জ্বল, বাগ্‌বিভূতিতে অতুলনীয়, বহুমুখী প্রতিভায় সমলঙ্কৃত এই মানুষটি একদিন বুকভরা আশা নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করে দেশবাসীকে শুনিয়ে গিয়েছেন আশার বাণী। তাঁর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর বিশ্বাসে স্থির, অচঞ্চল ছিল। নিয়মানুগ পথের পথিক হয়েও সমস্ত হৃদয় দিয়ে তিনি আজীবন এই বিশ্বাসই পোষণ করে এসেছেন যে, ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবেই হবে।

দেশ তখন ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন, অবসাদে দুর্বল ও নিস্তেজ। সেই দুর্দিনে তাঁর স্বজাতির মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাকে জাগ্রত করবার জন্য একা সুরেন্দ্রনাথ যে অভিনব উন্মাদনা নিয়ে এসেছিলেন বর্তমানকালের বংশধরদের পক্ষে তার সঠিক ধারণা করা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। আজ তা শুধু ইতিহাসের বিষয় হয়ে আছে। এ উন্মাদনা যে কী বস্তু ছিল সেদিন, ভাষায় তা বুঝিয়ে বলা দুঃসাধ্য, কল্পনা করা তো দূরের কথা। পুরাণের ভগীরথের মতো

শঙ্খধ্বনি করে সুরেন্দ্রনাথ যেন এক নূতন ভাবগঙ্গা এনেছিলেন এই দেশে। জাতীয়তাবোধের ভাবগঙ্গা। এই শঙ্খধ্বনি সেদিন যে শুনেছে সে-ই মজেছে। তাঁর বক্তৃতা বক্তৃতামাত্র ছিল না—ছিল সিংহনাদ। বিধিদত্ত এই অসাধারণ ক্ষমতা দেশের লোকের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ সাধনে কী আশ্চর্যভাবেই না সফলতা লাভ করেছিল, সেই ইতিহাস তো আজ বিস্মৃত, এমন কি বিলুপ্ত বললেই হয়।

'He was the maker of us all'—বিপিনচন্দ্র পাল থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত সকল নেতাই এই কথা বলে গিয়েছেন। এর প্রকৃত তাৎপর্যটা এই যে, ভারতে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের আদি-গুরু তিনিই। তাঁর সমকালীনদের মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যাঁরাই কিছু-না-কিছু অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই সুরেন্দ্রনাথের হাতে-গড়া মানুষ ছিলেন। যে জাতীয়তাবোধ পরবর্তীকালে সহস্রধারায় উৎসারিত হয়েছিল এইসব খ্যাত ও অখ্যাত, পরিচিত ও স্বল্পপরিচিত নায়কদের কর্ম, চিন্তা ও ত্যাগের মাধ্যমে, সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন সেই অজ্ঞাতপূর্ব জাতীয়তাবোধের জনক। তাঁর জীবন তাই এদেশের একটি বিশেষ কালের রাজনৈতিক ইতিহাস। বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি আমরা এদেশে স্বদেশপ্রেম বা দেশাত্মবোধ যজ্ঞের সামগায়ক উদ্গাতা বলি, তাহলে সুরেন্দ্রনাথকে বলতে হয় সেই যজ্ঞের আহ্বান-কর্তা হোতা।

এই সুরেন্দ্রনাথেরই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন চট্টগ্রামের যাত্রামোহন। এই শতাব্দীর সূচনাকালে প্রসিদ্ধ ঘটনা ছিল বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। তখন সুরেন্দ্রনাথ দেশের একচ্ছত্র নেতা। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত, ফরিদপুরে অম্বিকাচরণ মজুমদার, ত্রিপুরায় আব্দুল রসুল, ঢাকায় আনন্দ রায়, মৈমনসিংহে আনন্দমোহন বসু, বহরমপুরে বৈকুণ্ঠনাথ সেন, কলকাতায় মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র আর চট্টগ্রামে যাত্রামোহন

সেনগুপ্ত। তখন থেকে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় যে কয়জন ব্যক্তি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে এই কয়জনই ছিলেন বিশিষ্ট নেতা। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এঁরাই সেদিন বাংলাকে জাতীয়তার নবীন মন্ত্রে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন।

বাংলার অন্যান্য জেলার মতো চট্টগ্রামেও নবজাগরণের শিহরণ সঞ্চারিত হয়েছিল। যাত্রামোহন তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন এবং সমগ্র জেলার নেতৃত্ব গ্রহণ করে ঐ জেলায় জাতীয় আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন। তখন থেকেই চট্টগ্রামে স্বদেশী-প্রচারের যে জোয়ার বইতে শুরু করে তা আর কখনো মন্দীভূত হয় নি। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্কালে যে কর্মসূচী নির্ধারিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল তিনটি—স্বদেশী-প্রচার, স্বদেশী-গ্রহণ এবং বয়কট অর্থাৎ বিদেশী-বর্জন। যাত্রামোহনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম এই তিনটি বিষয়েই বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল।

যাত্রামোহন ধনীর সন্তান ছিলেন না—তিনি এক সাধারণ দরিদ্র অবস্থা থেকে নিজের প্রতিভাবলে ধন-সম্পদ ও যশের শীর্ষ-দেশে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রতিভার সঙ্গে যদি পুরুষ-কারের সম্মিলন ঘটে তবেই না মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়তে পারে। উনিশ শতকের একাধিক বরেণ্য বাঙালী সন্তানের জীবনে আমরা এই জিনিস লক্ষ্য করে থাকি। কথিত আছে, যাত্রামোহন যেমন অধ্যবসায়ী তেমন কর্মিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এবং এই গুণেই তিনি উত্তরকালে জননায়কের গৌরব ও সম্মানলাভে সমর্থ হন।

যাত্রামোহনের জন্মকাল ১৮৫০। তাঁর পিতামাতা দরিদ্র ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন হলেও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি নিজের চেষ্টায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথমে এণ্ট্রান্স পরে বি. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। ওকালতি ব্যবসায়েই তিনি প্রভূত সম্পদ

ও খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সময়ে তিনিই ছিলেন এই জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ আইনজীবী এবং আইনজীবী হিসাবে তাঁর খ্যাতি সারা বাংলাদেশেই সেদিন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আধুনিক চট্টগ্রামের নির্মাতা ছিলেন যাত্রামোহন—তিনিই কালক্রমে হয়ে উঠেছিলেন চট্টগ্রামের নেতা ও প্রাণপুরুষ। এঁরই তৃতীয় সন্তান ছিলেন আমাদের এই কাহিনীর নায়ক দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন।

উকিল-ব্যারিস্টারের দলই তো বাংলাদেশে রাজনৈতিক জাগরণ নিয়ে এসেছেন। এ-কথা শুধু বাংলা সম্পর্কে সত্য ছিল না, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। উনিশ শতকের বাংলার সপ্তম দশক থেকে শিক্ষিত বাঙালীর মনে ধীরে ধীরে যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হতে দেখা গিয়েছিল তার উৎস শুধু শহর কলকাতার আইনজীবিগণ ছিলেন না। মফঃস্বলের ব্যবহারজীবীদেরও যথেষ্ট অবদান ছিল এই ক্ষেত্রে। সেকালের যে কয়জন খ্যাতনামা আইনজীবী বাংলার বিভিন্ন জেলায় আইনের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের জীবনের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা চলে না। রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার কেন্দ্রস্থল যদিও ছিল শহর কলকাতা, তথাপি বাংলার জেলায় জেলায় তার তরঙ্গধারাকে মফঃস্বল 'বারের' খ্যাতনামা আইনজীবীরাই প্রবাহিত করে নিয়ে গিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় মফঃস্বল উপেক্ষিত, মফঃস্বলের নেতারাও উপেক্ষিত হয়ে থাকেন। মফঃস্বলের নেতারা সেদিন শুধু রাজনীতিসর্বস্ব মানুষ ছিলেন না, তাঁদের দৃষ্টি ছিল সর্বব্যাপক, চিন্তা ছিল সর্বাত্মক। তাইতো আমরা দেখি যে, একজন যাত্রামোহন কি একজন বৈকুণ্ঠ সেন বা একজন অম্বিকাচরণ অথবা একজন অশ্বিনীকুমারের

জন্য চট্টগ্রাম, বহরমপুর, ফরিদপুর এবং বরিশালের সর্বাত্মক উন্নতি, সর্বাত্মক জাগরণ ঘটেছিল।

এইসব মানুষের কথা—যাঁরা দেশকে অগ্রগতির পথে, রাজনৈতিক মুক্তির পথে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন—আজ, জাতির এই দারুণ অবক্ষয়ের দিনে, বিশেষভাবেই স্মরণ করা উচিত। যাত্রামোহনের কথাই বলি। বাংলাদেশের এক-একটা জেলার এক-একটা পরগণা এক-একজন বিশিষ্ট নেতাকে উপহার দিয়েছে। ঢাকার বিক্রমপুর পরগণা এর যেমন একটি দৃষ্টান্ত, তেমনি চট্টগ্রামের পটীয়া পরগণা এর অপর একটি দৃষ্টান্ত। যাত্রামোহন ছিলেন এই পটীয়া পরগণার সন্তান। পটীয়া একটি ক্ষুদ্র শহর। চট্টগ্রাম-দোহাজারী রেলপথের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো স্টেশন পটীয়া। আমরা যখনকার কথা বলছি তখন এখানে পাঁচটা মুন্সেফী কোর্ট ও তুটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। এই পরগণার মধ্যে সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু গ্রামটির নাম বরমা।

যাত্রামোহনের পিতৃপুরুষ এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁর জন্মও এইখানে। তখনকার সময়ে চট্টগ্রামের মধ্যে এমন বর্ধিষ্ণু ও অভিজাত গ্রাম খুব কমই ছিল। বহু উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, জমিদার ও তালুকদারদের বসবাস ছিল এই গ্রামে। ছোট্ট গ্রাম—তথাপি এখানে তখন একটি হাইস্কুল, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি ডাকঘর ছিল। আর ছিল একটি ইউনিয়ন বোর্ড। যাঁরা চট্টগ্রামে এসে পটীয়া পরগণায় গিয়ে কখনো বরমা গ্রামটি সন্দর্শন করেছেন তাঁরাই এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। চট্টগ্রামের মধ্যে নৈসর্গিক দৃশ্যে সুন্দর এমন গ্রাম খুব বেশি নেই। এই গ্রামটির দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তের বিস্তীর্ণ চরভূমির তুই দিক বেষ্টন করে প্রবাহিত হয়েছে শঙ্খনদ। পদ্মার মতোই শঙ্খনদের ভাঙন এর তুই তীরের অধিবাসীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে থাকে, আর বর্ষাকালে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এর বিশাল বক্ষ। কিন্তু সেই

বন্যা-প্লাবনে শঙ্খনদের চরভূমি ও তীরভূমি সুফলা ও শস্য-শ্যামলা হয়ে থাকে। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে যোজনব্যাপী প্রান্তর। শঙ্খনদের একটি ক্ষুদ্র শাখা—যার নাম যৎ—গ্রামের ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে প্রবাহিত হয়ে এখানকার অন্তর্বাণিজ্যে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে।

এই যৎনদের তীরেই অবস্থিত ছিল যাত্রামোহনদের পৈতৃক বসত-বাড়ি। এই বসতবাড়ি আয়তনে ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্র। যাত্রামোহন এইখানেই জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই গ্রামটির বহুবিধ উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং চট্টগ্রাম শহরে প্রাসাদোপম বাড়ি নির্মাণ করালেও, যাত্রামোহনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাঁর জন্ম-স্থানটি সম্পর্কে। তাঁর কর্মবহুল জীবনে তিনি প্রায়ই বরমায় তাঁদের পৈতৃক ভিটায় এসে অবসর যাপন করতেন। সাতাশ বছর বয়সে ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীরের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা বিনোদিনী দেবীর সঙ্গে যাত্রামোহন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। ডাক্তার খাস্তগীর চট্টগ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি কলকাতাতেই চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসক হলেও, তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন। তখনকার দিনে ডাক্তার খাস্তগীর শহরের একজন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ছিলেন। অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, আর. জি. কর মেডিকেল স্কুলটির প্রতিষ্ঠায় ডাক্তার খাস্তগীরের সহায়তা বড়ো কম ছিল না। খাস্তগীর-পরিবারটিও চট্টগ্রামের একটি বিশিষ্ট পরিবার। অন্নদাচরণের পুত্রকন্যারাও কৃতবিদ্য ছিলেন এবং তাঁর প্রথমা কন্যা কুমুদিনী চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। পিতৃকুল যেমন, যতীন্দ্রমোহনের মাতৃকুলও তেমনি সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতনামা ছিল। দশজনের মধ্যে যে মানুষ ভবিষ্যতে একজন হয়ে ফুটে উঠবে তার চরিত্রগঠনে তার নিজস্ব বংশগৌরব- পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ দুই-ই—বিশেষভাবেই সহায়তা করে থাকে। যতীন্দ্রমোহনের জীবন ছিল এরই একটা উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

আইন ব্যবসায়ে তাঁর পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রামোহন স্বগ্রামে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকেন। এর একটা বিশেষ কারণ ছিল। তাঁর মনের উদারতা এমনি ছিল যে, তিনি নিজের গ্রাম ভিন্ন আশেপাশের গ্রামগুলির অধিবাসীদেরও সহৃদয়তার চোখে দেখতেন। যখন শহর থেকে বাড়ি ফিরতেন তখন পথে যার সঙ্গে দেখা হতো তার সঙ্গেই তিনি মধুর সম্ভাষণ করতেন, কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতেন ও আপনজনের মতো ব্যবহার করতেন। কি চাষা, কি মজুর সকলের সঙ্গেই তিনি হৃদ্যতার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। এজন্য তারাও তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ করত। পুত্র যতীন্দ্রমোহন তাঁর পিতার চরিত্রের এই গুণটি ষোলআনা লাভ করেছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই যাত্রামোহন ব্যবসায়ে শুধু যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তা নয়, সেইসঙ্গে তাঁর প্রচুর অর্থাগমও হতে থাকে। লক্ষ্মীর কৃপা তাঁর উপর যেন অকৃপণভাবেই বর্ষিত হতে থাকে। মৃত্যুকালে তিনি কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। এক চট্টগ্রাম শহরেই তাঁর কত ভূসম্পত্তি ও বাড়ি ছিল। গ্রামের যে ক্ষুদ্র বাড়িতে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ও যেখানে যতীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কালক্রমে পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে যাত্রামোহন তাঁদের পৈতৃক ভিটার কাছেই বিশাল জমিতে আর একটি নতুন বাড়ি তৈরি করেছিলেন। উত্তরকালে যতীন্দ্রমোহন ঐ বাড়ি তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দান করেছিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের জন্মভিটা অযত্নে ও অবহেলায় কবেই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। বাঙালীর স্মৃতিপূজা যদি অন্তরের বিষয় হতো তাহলে বাংলার বহু বরেণ্য সন্তানের জন্মভিটা সযত্নে রক্ষিত হতো।

চট্টগ্রামের সমস্ত জনহিতকর অনুষ্ঠানে যাত্রামোহনের শুধু আন্তরিক সহযোগ ছিল না, অর্থানুকূল্যও ছিল যথেষ্ট এবং এই কারণেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। শহরে 'যাত্রামোহন টাউন হলটি' তারই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। চট্টগ্রাম সমিতির ভবনটিও

তাঁরই প্রদত্ত জমির উপর নির্মিত হয়; গৃহ-নির্মাণের জন্যও অর্থদান করেছিলেন। তিনিই ছিলেন এই সমিতির প্রাণস্বরূপ। তাঁর সময়ে এই সমিতিকে কেন্দ্র করেই চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর দানের পরিমাণ বড়ো সামান্য ছিল না। তাঁর পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার জন্য যাত্রামোহন নিজের খরচে স্বগ্রামে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে পুত্র যতীন্দ্রমোহনের চেষ্টায় ও অর্থানুকুল্যে এই স্কুলটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয় ও এর পরিচালনার দায়িত্ব একটি ট্রাস্ট কমিটির উপর অর্পিত হয়। যাত্রামোহনের প্রতিষ্ঠিত 'বরমা দাতব্য ঔষধালয়' আজো সেখানে তাঁর স্মৃতি বহন করছে। তেমনি শহরে 'যাত্রামোহন সেন ইনস্টিটিউট' এই দানবীরের স্মৃতিকে সযত্নে ধারণ করে রেখেছে।

দরিদ্রের সন্তান যাত্রামোহন নিজের প্রতিভাবলে লক্ষ্মীর কৃপালাভ করে উত্তরকালে জমিদারের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং একজন আদর্শ জমিদাররূপে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। প্রজাবৎসল জমিদাররূপে যাত্রামোহন সেনের নাম আজো ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে জাগরূক আছে। পুত্র যতীন্দ্রমোহন কলকাতায় বসবাস ও প্র্যাকটিস করতেন বলে তাঁর পিতার এই জমিদারির যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান করতে পারতেন না। সেজন্য উত্তর-কালে বহুবিধ বিশৃঙ্খলার ফলে জমিদারি নষ্ট হয়ে যায়। জমিদার যাত্রামোহন যারপরনাই স্বদেশভক্ত ছিলেন। এই গুণেই তিনি সেদিন সকলের পূজ্য হয়েছিলেন। যাঁরাই দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতেন, যাত্রামোহন তাঁদের অকাতরে অর্থসাহায্য করতেন, যেমন করতেন একসময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁর স্বদেশপ্রেমের একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ্য।

বাংলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বঙ্গ-ভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন কেবলমাত্র রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই আন্দোলনের সর্বপ্রধান

নায়ক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, স্বদেশী আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের বহু স্থানে স্বদেশী শিল্পোদ্যোগে প্রেরণা জুগিয়েছে। চট্টগ্রামের বেঙ্গল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীটি ছিল এরই একটি নিদর্শন। স্থানীয় কয়েকজন মুসলমান ব্যবসায়ীর চেষ্টায় ১৯০৭ সালে এটি স্থাপিত হয়। এখানে তখন ইংরেজ স্টীমার কোম্পানীরই একচেটিয়া প্রভুত্ব ছিল। সেই কোম্পানীর নাম ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী। স্বদেশী ও বিদেশী কোম্পানী দুটির মধ্যে শুরু হয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ক্ষতি স্বীকার করে স্বদেশী কোম্পানীর পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা যখন একপ্রকার অসম্ভব হয়ে উঠল তখন বেঙ্গল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর একজন ধনী মুসলমান পরিচালক যাত্রামোহনের শরণাপন্ন হন।

বিদেশী কোম্পানীর অন্যায় প্রতিযোগিতার ফলে এই প্রয়োজনীয় স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাবে, এটা যাত্রামোহনের কাছে অসহনীয় বোধ হলো। উক্ত পরিচালক তাঁকে বললেন যে, যাত্রামোহনবাবু যদি জামিন হন তাহলে ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ পাওয়া যেতে পারে। তিনি সম্মত হলেন এবং তাঁর জামিনেই কোম্পানীকে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই স্বদেশী কোম্পানীটি উঠে যাওয়ায় এই বিরাট ঋণভার যাত্রামোহনের স্কন্ধেই নিপতিত হয়। জীবন-সায়াহ্নে এই বিরাট ঋণের বোঝা তাঁর পক্ষে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হলেও যাত্রামোহন বহু কষ্টে সেই ঋণ পরিশোধ করে দেশবাসীর সামনে তাঁর স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এজন্য তাঁকে একরকম সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল এবং সেই বয়সে নতুন উদ্যোগে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হতে হয়েছিল।

যতীন্দ্রমোহনের পিতার কথা বললাম। এইবার তাঁর জননী বিনোদিনী দেবীর সম্পর্কে কিছু বলব। বলেছি, তাঁর স্বামীর জীবনে

সৌভাগ্যের সূচনা করেই বিনোদিনী দেবী এই পরিবারে একদিন বধূরূপে প্রবেশ করেছিলেন। পিতা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হলেও, বিনোদিনী দেবী মনে-প্রাণে ও আচার-আচরণে হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন এবং দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতেন। এমন কি, তাঁর স্বামী যখন শেষ বয়সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, বিনোদিনী দেবী তখনো তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসে অটল অচল ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও, সর্বধর্মে উদারতা যাত্রামোহনের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। পুত্র যতীন্দ্রমোহন তাঁর পিতার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে অনেকখানি লাভ করেছিলেন।

বিনোদিনী দেবীর ইচ্ছায় বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব হতো এবং দুর্গাপূজার সময় বিশেষ আড়ম্বর হতো। এই পূজার জন্য যাত্রামোহন মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করতেন। অতিথি-অভ্যাগতে তাঁদের বাড়ি তখন ভরে যেত। দেবী প্রতিমার বিসর্জনেও খুব ঘটা হতো। অত্যন্ত সরল প্রকৃতির রমণী ছিলেন বিনোদিনী দেবী। তাঁর হৃদয়ের মাতৃস্নেহ এমনি উদার ছিল যে, তিনি নিজের সন্তান ও পরের সন্তানে ভেদ করতে জানতেন না। শিক্ষার অভাব যেটুকু ছিল তা তাঁর অন্তরের সরলতা গুণে পূরণ হয়েছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বাঙালী হিন্দু-পরিবারের মেয়েরা খুব বেশি শিক্ষিতা ছিলেন না—শিক্ষালাভের সুযোগও তেমন ছিল না। না থাকুক, তথাপি এ-কথা সত্য যে, তখনকার দিনেও পুরমহিলারা সংসারধর্ম সাধনে ও পুত্র-কন্যার প্রতিপালনে যে রকম নিপুণতা প্রদর্শন করতেন বর্তমানকালের উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা তা কল্পনাই করতে পারবেন না।

যাত্রামোহন তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করতেন। বিনম্র স্বভাব, মিষ্টভাষিণী, স্বামী ও পুত্র-কন্যার পরিচর্যায় নিষ্ঠাবতী বিনোদিনী দেবী সেন-পরিবারের সকলেরই প্রিয়পাত্রী ছিলেন। গৃহকর্ত্রীরূপে তিনি তাঁর স্বামীর বিরাট সংসারে সম্রাজ্ঞীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিতা ছিলেন। স্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে সকলকে তিনি আপন

করে নিতে পারতেন বলেই না সকলেই তাঁর শাসন মেনে চলত। যাত্রামোহনবাবুর লক্ষ্মীস্বরূপিণী এই সহধর্মিণী তাঁর সিঁথির সিঁদুর মাথায় নিয়ে মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর তৃতীয় সন্তান যতীন্দ্রমোহন তখন একুশ বছরের যুবক, আর অন্যান্য পুত্র-কন্যাগণ অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক ছিল। মায়ের মিষ্ট স্বভাবের অধিকারী পুত্র যতীন্দ্রমোহন হ'তে পেরেছিলেন।

॥ দুই ॥

—কিরে বিনু, এত সকালে কি মনে করে?

— সই, কাল রাতে আবার সেই স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম বিশাল সাগরে একটা ফুটন্ত নীলপদ্ম, আর সেই পদ্মের ওপর খেলা করছে নীলরঙের একটা ছোট্ট শিশু। ঢলঢলে তার মুখ, টানা চোখ আর উঁচু কপাল।

—সত্যি!

—হ্যাঁ, সবই সত্যি। এই নিয়ে তো তিনবার এই স্বপ্ন দেখলাম আমি।

—তোর কর্তাকে এই স্বপ্নের কথা বলেছিস?

—না, বলি নি।

—ক' মাস হলো তো?

—এই তো সবে তিন মাস। কই এর আগে মানে আর কারুর বেলায় তো এমন কোনো স্বপ্ন আমি দেখি নি।

আমার মনে হয় বিনু এবার তোর কোলে একটা সুলক্ষণ-যুক্ত ছেলে আসছে। তুই কর্তাকে একবার এই স্বপ্নের কথাটা বলিস।

—বলে কি লাভ, সই? ওঁরা কি এসব বিশ্বাস করেন?

—না করুন। একটা জ্যোতিষীকে দিয়ে উনি হয়ত গোনাতে পারেন।

— আচ্ছা বলব তাহলে। তুই বলছিস ছেলে, মেয়ে নয়?

—হ্যাঁ রে বিনু। আমার মন বলছে এবার তোর কোল আলো করে, তোদের সংসার আলো করে আসছে এক পুত্ররত্ন।

১৮৮৪ সাল। গ্রীষ্মের এক সকালে দুই সখীতে এইরকম আলাপ হচ্ছিল। বিনু অর্থাৎ যাত্রামোহনের স্ত্রী বিনোদিনী এসেছেন তাঁর বান্ধবী দিগম্বরীর কাছে। দিগম্বরী দেবী ছিলেন যাত্রামোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গঙ্গাচরণ গাঙ্গুলীর স্ত্রী। গঙ্গাচরণবাবু ছিলেন কাস্টমস্-এর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার এবং তাঁরও আয় ছিল প্রচুর। গঙ্গাচরণের দ্বিতীয় পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের নিত্যসহচর। গাঙ্গুলী-গিন্নীর সঙ্গে সেন-গিন্নীর খুবই বন্ধুত্ব ছিল। গ্রামের বাড়িতে এঁরা পাশাপাশি বাস করতেন। যতীন্দ্রমোহনের আগে যাত্রামোহনের দুটি সন্তান জন্মেছিল—পুত্র মনোমোহন ও কন্যা কুসুমকুমারী। যতীন্দ্রমোহনের পরে তাঁর আরো ছয়টি পুত্র ও ছয়টি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে আটটির অকালমৃত্যু ঘটে। ফণীন্দ্র, নীরেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, বীরেন্দ্র, শৈলেন্দ্র ও রণেন্দ্রমোহন হলেন যতীন্দ্রমোহনের ছয় কনিষ্ঠ সহোদর।

একদিন সন্ধ্যায় আদালত থেকে ফিরে যাত্রামোহন জলযোগের পর তাঁর আরামকেদারায় বসে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময়ে পত্নী এসে তাঁর কাছে এই বিচিত্র স্বপ্নের কথা বললেন। যাত্রামোহন স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে পত্নীকে পরিহাস করে বললেন, সমুদ্রে নীলপদ্মের ওপর নীলরঙের শিশু, তাহলে কি কেষ্টঠাকুর আসছেন তোমার গর্ভে ?

—তেমন ভাগ্য করেছিলেন পৃথিবীতে একজনই—দেবকী। ঠাট্টা করো না। তুমি একজন জ্যোতিষীকে একবার ডেকে পাঠাও, আর তাঁকে আমার এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথাটা একবার জানাও। তিনি কি বলেন একবার শুনি।

—তুমি কি স্বপ্ন বিশ্বাস করো ?

—একটিবার দেখলে হয়ত করতাম না—আমি যে পর-পর তিন রাত এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।

—হ্যাঁ, এটা আশ্চর্যের কথা বটে।

—স্বপ্ন দেখবার পরের দিনটা অস্থিরভাবে কেটেছে আমার।

—অবশ্য আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, যখন ক্ষণজন্মা কোনো ছেলে মাতৃগর্ভে আসে তখন মায়ের পক্ষে এমন বিচিত্র স্বপ্ন দেখা অসম্ভব বা আজগুবি নয়। বুদ্ধদেবের জন্মের আগে মায়া দেবী কী বিচিত্র স্বপ্নই না দেখেছিলেন।

—তাহলে একজন পণ্ডিতকে খবর দাও তুমি।

যাত্রামোহন পত্নীর কথায় সম্মত হলেন।

চট্টগ্রামে তখন বগলা পণ্ডিত নামে একজন শাস্ত্রজ্ঞ জ্যোতিষী বাস করতেন। যাত্রামোহন তাঁকে চিনতেন ও তাঁর গণনায় আস্থাবান ছিলেন। কারণ তাঁর নিজের জীবনেই তিনি এর পরিচয় পেয়েছেন। খবর দিতেই একদিন সকালে বগলা পণ্ডিত এলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাঁকে সমাদর করে বসালেন। বিনোদিনী দেবীর মুখে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনবার পর জ্যোতিষী বললেন, আপনাদের সংসারে এবার একজন ক্ষণজন্মা পুত্রই আসছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র আমাকে তার জন্ম-তারিখ এবং জন্মক্ষণটি সঠিকভাবে জানিয়ে দেবেন। আমি নিজে তার জন্ম-পত্রিকা তৈরি করে দেখব এই বিচিত্র স্বপ্নের সার্থকতা কোথায়, কারণ সচরাচর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এমন স্বপ্ন বড়ো একটা কেউ দেখেছেন বলে আমি শুনি নি। তবে একটা কথা আছে।

—কী? স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একসঙ্গে প্রশ্ন করেন ব্যাকুলিত চিত্তে।

—কোনো গর্ভবতী নারীর পক্ষে এই জাতীয় স্বপ্ন দেখা শুভ ও অশুভ দুই-ই হতে পারে। এ-ক্ষেত্রে কবচ ধারণের বিধান আছে শাস্ত্রে। মা, আপনি কি কবচে বিশ্বাস করেন?

—খুব করি।

—আমি তাহলে একটা কবচ তৈরি করে ও শোধন করে পাঠিয়ে

দেব আপনাকে। আপনি আগামী মঙ্গলবার দিন সকালবেলায় স্নান করে শুদ্ধ আচারে আপনার বাম হাতে ধারণ করবেন। কর্তামশাই নিজের হাতে এটি আপনার হাতে বেঁধে দেবেন লাল সুতো দিয়ে। তারপর সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে কবচ-ধোয়া জল পান করবেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে এই কবচটি নবজাতকের কপালে স্পর্শ করিয়ে খুলে ফেলবেন।

—কিন্তু পণ্ডিতমশাই, আপনি বলছেন পুত্র হবে?

—পুত্র? পুত্ররত্ন লাভ করবেন এবার আপনারা।

দিগম্বরী দেবী বা বগলা পণ্ডিতের কথা মিথ্যা হয় নি।

যাত্রামোহন-বিনোদিনীর তৃতীয় সন্তানটি পুত্ররত্নই ছিলেন। এমন পুত্ররত্ন লাভ খুব কম পিতামাতার ভাগ্যেই ঘটে থাকে। যথাসময়ে দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে পরে তাঁদের গ্রামের বাড়িতে ১৮৮৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি রাত্রিবেলায় যতীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। মধুমাস ফাল্গুনের কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি। রাত্রির প্রথম প্রহরেই বিনোদিনী দেবীর কোল আলো করে ভূমিষ্ঠ হলেন তাঁদের তৃতীয় সন্তান যতীন্দ্রমোহন। সেন-বাড়িতে শাঁখের আওয়াজ শুনে কাছাকাছি প্রত্যেকটি পরিবার থেকে পুরনারীবৃন্দ ও বিনোদিনী দেবীর বান্ধবী দিগম্বরী দেবী এসে উপস্থিত হলেন সূতিকাগারে। যাত্রামোহনের ভবন তখন পুর-মহিলাদের অবিরাম উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই শুভ সংবাদ চকিতের মধ্যে সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে গেল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যতীন্দ্রমোহনের জন্মের বৎসরেই প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

'I was born in the year the Congress was born.' —উত্তরকালে যতীন্দ্রমোহন তাঁর বন্ধুদের কাছে প্রায়ই এই কথা বলে গর্ববোধ করতেন। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আজীবন ও অচ্ছেদ্য, আর এরই সেবায় সার্থক হয়েছিল তাঁর সমগ্র জীবন।

যতীন্দ্রমোহনের জন্মকালে যাত্রামোহনের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। আইন ব্যবসায়ে তখন তাঁর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এবং অর্থাগমও প্রচুর। সেইজন্য তিনি খুব জাঁকজমকের সঙ্গেই তাঁর এই পুত্রের জন্মোৎসব পালন করেছিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই যতীন্দ্রমোহন তাঁর স্নেহময়ী জননীর চোখের মণি হয়ে উঠেছিলেন এবং একটি মুহূর্তের জন্যও তিনি শিশুকে চোখের আড়াল করতেন না। এই পুত্রটির জন্মকালে বিনোদিনী দেবীর স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। সেজন্য শিশু মাতৃস্তন্যপানে বঞ্চিত ছিল। সেই অভাব পূরণ করেছিলেন তাঁরই বান্ধবী দিগম্বরী দেবী। তিনিই শৈশবে যতীন্দ্রমোহনকে তাঁর স্তন্যদান করে শিশুর জীবন রক্ষা করেছিলেন। তিনিও যতীন্দ্রমোহনকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।

কালক্রমে সকলের আনন্দবর্ধন করে দিব্যকান্তি শিশু কলায় কলায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। পিতামাতার অঙ্গসৌষ্ঠব নিয়েই যতীন্দ্রমোহন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। উত্তরকালে তাঁর সুপুষ্ট, দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমরা শালপ্রাংশু মহাভুজ যে যতীন্দ্রমোহনকে প্রত্যক্ষ করেছি, সেই বলিষ্ঠ অবয়বী মানুষটি আজীবন নানাবিধ শারীরিক ক্রীড়া ও ব্যায়ামচর্চা করতেন বলেই না তিনি অমন সুন্দর দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। এই মহানগরীর মাঠে ক্রিকেট খেলারত দেশপ্রিয়কে কখনো প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ যাঁদের হয়েছে তাঁরাই এর সাক্ষ্য দেবেন।

যে কোনো কারণেই হোক, যাত্রামোহন তাঁর এই তৃতীয় সন্তানটির জন্য নিজেকে শুধু ভাগ্যবান নয়, গর্বিতও বোধ করতেন। শিশুর কমনীয় কান্তির জন্য প্রতিবেশিগণের কাছে তার আদর-যত্নের যেন সীমা-পরিসীমা ছিল না। সেদিন সারা করমা গ্রামেরই নয়নমণি হয়ে উঠেছিল এই শিশুটি যেমন তিনি উত্তরকালে হয়ে উঠেছিলেন সমগ্র দেশের প্রিয় নেতা—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। কথিত আছে যে,

নিজের বাড়ি অপেক্ষা মায়ের বান্ধবী দিগম্বরী দেবীর বাড়িতেই শিশুর আদর-যত্ন যেন একটু বেশি মাত্রায় ছিল। এঁকে যতীন্দ্রমোহন ডাকতেন 'দুধু-মা' বলে। নিজের গর্ভধারিণী মায়ের মতোই তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। বরমা গ্রামে গাঙ্গুলী ও সেন পরিবার দুটির মধ্যে যে হৃদ্যতা আগে থেকে বিদ্যমান ছিল, যতীন্দ্রমোহনের জন্মের পর থেকে তা যেন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে—তিনিই ছিলেন এর হেতুস্বরূপ। যাত্রামোহন তাই অনেক সময়ে তাঁর বন্ধু গঙ্গাচরণকে পরিহাস করে বলতেন, ভায়া, বদ্যি-বামুনকে এক ঘাটে জল খাওয়ালে আমার যতীন।

—সুতরাং এমন ছেলে ক্ষণজন্মা না হয়েই পারে না, কি বলো? বন্ধুর মুখে এই কথা শুনে যাত্রামোহন কি তাঁর এই তৃতীয় সন্তানটির জন্য তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করেছিলেন কখনো? হয়ত করেছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গের কাছে আমরা শুনেছি যে, যতীন্দ্র-মোহনকে শিক্ষায়-দীক্ষায় এবং স্বভাবে একটি আদর্শচরিত্রের পুত্র হিসাবে গড়ে তুলবার জন্য তাঁর চেষ্টা ও যত্নের কোনো ত্রুটি ছিল না। নিজে তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন এবং তাঁর সময়ে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় যাওয়ার জন্য রেলপথ নির্মিত হয় নি। সেই কারণে যাত্রামোহনের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নি। তাঁর নিজের জীবনের সেই অচরিতার্থ সাধ যাত্রামোহন তাঁর পুত্র-কন্যাদের জীবনে চরিতার্থ করেছিলেন। প্রত্যেককেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার জন্য অর্থব্যয়ে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। তাঁর তিনটি পুত্রকে—যতীন্দ্রমোহন, নীরেন্দ্রমোহন ও রণেন্দ্রমোহন—তিনি বিলাতে পাঠিয়েছিলেন উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য। তাঁর এই তিনটি ছেলের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন হয়েছিলেন ব্যারিস্টার, নীরেন্দ্র ডাক্তার ও কনিষ্ঠ রণেন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

গ্রামের স্কুলে দু'বছর শিক্ষালাভের পর যতীন্দ্রমোহন তাঁর মায়ের সঙ্গে চট্টগ্রামে এলেন। এখানে তাঁকে প্রথমে সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুলে এবং পরে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তখন থেকেই বালক যতীন্দ্রের স্বভাবে কিছু কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে থাকে। প্রথম পরিবর্তন, তিনি কারো শাসন মেনে চলতে চাইতেন না ; দ্বিতীয় পরিবর্তন, পড়াশুনার চেয়ে খেলাধূলায় আসক্তি। তখন থেকেই বালকের মনে স্পোর্টসম্যান হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা যেন প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে উত্তরকালে যতীন্দ্রমোহন সত্যিই একজন সুদক্ষ স্পোর্টসম্যান হয়ে উঠেছিলেন। সমবয়সী ছেলের দল সংগ্রহ করে ফুটবল টীম ও ক্রিকেট টীম তিনি সেই বয়সেই গড়ে তুলেছিলেন, যদিও এই দুটি খেলার নিয়মকানুন তাঁর তখন কিছুই জানা ছিল না। খেলাধূলার সঙ্গে ব্যায়ামচর্চার প্রতি আকর্ষণটাও তখন থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। পিতৃবন্ধু গঙ্গাচরণবাবুর বড়ো ছেলে সতীশচন্দ্র তখন চট্টগ্রামে একটি ছোটখাটো ব্যায়ামাগার স্থাপন করেছেন। সেখানে প্রধানত কুস্তি খেলা শেখানো হতো। চট্টগ্রামে ছেলেদের মধ্যে শরীরচর্চার সূচনা এই সতীশচন্দ্রই করেছিলেন ও এজন্য যুবক ও কিশোরদের উপর তাঁর প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। যতীন্দ্রমোহনের চেয়ে তিনি বয়সে বড়ো ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি তাঁকে সতীশদা বলে ডাকতেন। উত্তরকালে তাঁর এই সতীশদাই বার্মা অয়েল কোম্পানী ও আসাম-বেঙ্গল রেলের ধর্মঘটের সময়ে যতীন্দ্রমোহনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। সে-কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব।

খেলাধূলার প্রতি আকর্ষণ ও অধ্যয়নে অমনোযোগ দেখে যাত্রামোহন পুত্রের জন্য দুটি গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ছেলে যে শাসন মানতে চায় না, এটাই ছিল তাঁর কাছে বিশেষ চিন্তার বিষয়। 'Spare the rod and spoil the child.'—এই সনাতন

নীতিতে তাঁর আস্থা থাকলেও পত্নীর ভয়ে তিনি পুত্রকে বাধ্যবাধকতার মধ্যে খুব বেশি আনতে পারতেন না। সময় সময় তিনি যদি-বা একটু কঠোর হয়ে উঠতেন, তখনই বিনোদিনী দেবী স্বামীকে বলতেন, তুমি কিছু ভেবো না, আর একটু বড়ো হলেই যতীন আর অত অবাধ্য থাকবে না। এর উত্তরে যাত্রামোহন বলতেন, না, এখন থেকেই ছেলেদের শাসন করা দরকার। দশ বছর বয়সের পর থেকেই ছেলেদের শাসন করার কথা চাণক্য বলে গিয়েছেন। পুত্রস্নেহে অন্ধ মায়ের প্রাণ কিন্তু এইসব কথা আদৌ মানতে চাইত না। তাই তো তিনি তাঁর স্বামীকে বলতেন, শাসন না করলে ছেলেরা খারাপ হয়ে যায়, এ আমি মানি না। এই বয়সে সব ছেলেই ঐ রকম থাকে, একটু বয়স বাড়লে নিজে থেকেই তারা শুধরে যায়। কিন্তু এখন থেকে রাশ টেনে রাখলে ফল কি ভালো হয়? স্ত্রীর এই যুক্তি স্বামী কিভাবে খণ্ডন করেছিলেন তা আমরা জানি না, তবে পুত্রের উপর তিনি তখন থেকে একটু কড়া নজর রাখতে লাগলেন। মায়ের কাছে পুত্র অবশ্য সমানভাবেই প্রশ্রয় পেতেন।

গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন, একজন নয় দু'জন। সকালে একজন, বিকালবেলায় আর একজন। কিন্তু তাতেও পুত্রের পাঠে অমনোযোগিতা দূর হওয়ার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। কি সকালে কি বিকালে টিউটর এসে অপেক্ষা করছেন পড়ার ঘরে ছাত্রের জন্য, কিন্তু কোথায় যতীন্দ্রমোহন? খেলাধূলায় তাঁর বিরাম নেই—কি সকালে, কি বিকালবেলায়। কিন্তু যাত্রামোহন যখনি গম্ভীরকণ্ঠে 'যতীন' বলে হাঁক দিতেন, পুত্র অমনি শান্ত-শিষ্ট সুবোধ বালকের মতো পাঠকক্ষে প্রবেশ করতেন। শাসন-অসহিষ্ণু হলেও যতীন্দ্রমোহন কখনো তাঁর পিতামাতার অবাধ্য ছিলেন না। আসল কথা হলো এই যে, তাঁর মধ্যে ছিল একটা অদম্য স্বাধীন-প্রকৃতি। এই ভাব নিয়েই তাঁর জন্ম আর এই স্বভাবই তাঁর ব্যক্তিত্বকে করে তুলেছিল বলিষ্ঠ, চরিত্রকে আকর্ষণীয়। উত্তরকালে যখন তিনি নেতৃত্বের পদে

অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন যতীন্দ্রমোহনের মধ্যে এই স্বাধীন প্রকৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি। তাঁর এই স্বাধীনচিত্ততার জন্য বাংলার রাজনীতিতে তাঁকে একসময়ে দলীয় এবং উপদলীয় বহুপ্রকার কলহ ও সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং তার ফলে তাঁর সরল মন যে কি পরিমাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, সে-কাহিনী যথাস্থানে উল্লিখিত হবে।

॥ তিন ॥

কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ। হেয়ার স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যতীন্দ্রমোহন কলকাতায় এসে প্রবিষ্ট হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। যাত্রামোহনের ইচ্ছা ছিল যে, এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করার পর পুত্রকে তিনি ইংল্যাণ্ডে পাঠাবেন ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য। কিন্তু স্বামীর এই ইচ্ছায় বাদ সাধলেন স্ত্রী বিনোদিনী। এনট্রান্স পাশ করলেই বা, যতীনের বয়সই বা কী যে, তাকে তুমি এখনি সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে পাঠাবে? পুত্র-অন্ত প্রাণ বিনোদিনী দেবীর এই প্রবল আপত্তির জন্য তখনকার মতো যতীন্দ্রের বিলাত যাওয়া স্থগিত থাকে।

তরুণ যতীন্দ্রমোহন এখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র।

এখানে যে দু'বছর তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন তার ফলে তাঁর জীবনের বনিয়াদ বহুল পরিমাণে সুদৃঢ় হয়েছিল। উত্তরকালে তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে এই কথা বলে বিশেষ গর্ববোধ করতেন। তিনি যখন এই কলেজে ভর্তি হন তখন ডক্টর পি. কে. রায় ছিলেন এখানকার অধ্যক্ষ। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনিই প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্বনামধন্য পার্সিভাল সাহেব ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক। এই পার্সিভাল সাহেবের দুটি উপদেশ কলেজের নবাগত ছাত্রদের মনে বিশেষভাবে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। সেই দুটি উপদেশ ছিল এই: প্রথম—'Your manners must not be at fault.' দ্বিতীয়—'Mind you, my young boys, in attempting to grasp

the shadow, you may lose the substance.' বলা বাহুল্য, নবাগত ছাত্রদের কাছে ইংরেজ অধ্যাপকের এই দুটি অমূল্য উপদেশ খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল, বিশেষ করে যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গস্থানীয় সহপাঠীর জীবনে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজ সম্পর্কে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কথাটি খুব প্রচলিত ছিল: 'Who is anybody in the public life, he must have been somebody of the Presidency College.' এটি খুব খাঁটি সত্য কথা।

কথাটির তাৎপর্য আজকের দিনে—শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থার দরুন বর্তমানের শোচনীয় ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে—বিশেষভাবেই অনু-ধাবনের বিষয়। বাংলাদেশে রেনেসাঁসের প্রথম পর্বের নায়কবৃন্দ সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। তারপর সেই হিন্দু কলেজ যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয় তখন থেকে বাংলার নবজাগরণকে যাঁরা সার্থকতার পথে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে যাঁরাই একসময়ে গৌরবের আসন অধিকার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই এই কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বাংলার একাধিক কৃতী সন্তানকে আমরা এখান থেকেই পেয়েছি এবং এই কলেজে শিক্ষালাভ করে উত্তরকালে তাঁদের অনেকেই সমাজের বহু ক্ষেত্রে গৌরবজনক স্থান লাভ করেছিলেন। শিক্ষার আদর্শটাই ছিল তখন অন্যরকম আর ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটাও ছিল ছাত্রদের চরিত্র-গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক।

প্রেসিডেন্সী কলেজে যতীন্দ্রমোহনের সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ (স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি), যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, গিরিশচন্দ্র সেন, মণিমোহন সেন, অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে এঁদের অনেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন

করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উত্তরকালে রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যতীন্দ্রমোহন ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের পতাকাতলে একত্রে কাজ করেছিলেন। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 'আমাদের সময়টাই ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের বিশেষ-গৌরবময় যুগ—সর্বাত্মক উন্নতির যুগ। স্বর্ণযুগ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে পত্রিকা প্রকাশ, ছাত্রদের জ্ঞানানুশীলনের জন্য বিতর্ক-সভা, ছাত্রদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে কলেজ ইউনিয়ন এবং সর্বোপরি ছাত্রদের শারীরিক উন্নতিবিধানের জন্য নানাবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা ও তাতে উৎসাহ এবং আনুকূল্য প্রদান—এ-সবেরই সূচনা আমাদের সময়ে হয়েছিল। এর প্রায় প্রত্যেকটার সঙ্গে ছাত্র হিসাবে যতীন্দ্রমোহন সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বিশেষ করে কলেজের খেলাধূলার সঙ্গে; তিনিই ছিলেন কলেজ স্পোর্টস-এর নেতা। যতীন্দ্র একজন বড়োদরের স্পোর্টসম্যান ছিলেন। এইজন্য মহাত্মাজী অনেক সময়ে রহস্য করে বলতেন, 'Here is J. M. Sen-gupta, our great sportsman-leader. He is the invincible batsman in our battle for freedom.' কলেজে থাকতেই যতীন ক্রিকেট খেলায় খুব নাম কিনেছিলেন। তেমনি নাম কিনেছিলেন ডিবেটিং-এ। বস্তুত খেলাধূলা ও ডিবেটিং এই দুটি বিষয়েই তিনি শুধু অগ্রণী ছিলেন না, পরম উৎসাহীও ছিলেন। বিতর্ক-সভার বেশিরভাগ অনুষ্ঠান ইডেন হোস্টেলে হতো। আমি ঐ হোস্টেলেই থাকতাম। হোস্টেলের নিজস্ব একটি ডিবেটিং ক্লাবও ছিল। যতীন্দ্র ছাত্রাবাসের বিতর্ক-সভায় ও কলেজের বিতর্ক-সভায় অংশগ্রহণ করতেন। তখনি তাঁর বাগ্মিতার পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। উত্তরকালে যিনি কংগ্রেসের বহু মঞ্চ থেকে বহু বক্তৃতা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার সূচনা, মনে হয়, তখনি যতীন্দ্রের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তাঁর ইংরেজী উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ, উচ্চারণভঙ্গীও ছিল খাঁটি ইংরেজের মতো।'

কলেজের বাইরে ছাত্রাবস্থায় যতীন্দ্রমোহন আর একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে জানা যায়। সেটি হলো ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি সেদিন কলকাতার কলেজের ছাত্রদের জীবনে এক কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'বিদ্যায়তনের ভিতরের সহিত বাহিরের মিলন এইখানেই, শাস্ত্রীয় বিদ্যার সহিত কলাবিদ্যার মিলন, অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের, নূতন ছাত্রের সহিত পুরাতন ছাত্রের মিলনের এই ক্ষেত্র।' ইনস্টিটিউটের প্রসঙ্গে উত্তরকালে যতীন্দ্রমোহন বলতেন, 'আমাদের কলেজ-জীবনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট একটা মস্তবড়ো factor ছিল।'

বিগত শতাব্দীর শেষপাদে এই ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল প্রধানত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে। বঙ্কিমচন্দ্র এর সাহিত্যশাখার প্রথম সভাপতি ছিলেন। তখনকার দিনে বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উদ্যোগী হয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন, বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই তার সুফল দেখা গিয়েছিল। অন্তত প্রেসিডেন্সী কলেজে এই সময়কার ছাত্র যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকের মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ব্যবহারে মধুর শিষ্টতা, আচরণে মার্জিত রুচি, বুদ্ধিতে বাস্তববোধ আর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলাবোধ। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নিবিড় ছিল, তাঁরা নিশ্চয়ই এই সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁর চরিত্রে ও চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে এই গুণগুলি কী সুন্দরভাবেই না প্রতিফলিত হতো।

১৯০৪। আগস্ট মাস।

যতীন্দ্রমোহনের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর।

ঐ বছরে তিনি ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য। সঙ্গে গেলেন তাঁর এক দূরাত্মীয়—সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ইনিই

পরবর্তীকালে চিকিৎসক-সমাজে ডাঃ এস. সি. সেনগুপ্ত, এম. ডি., এফ. আর. সি. এস.—এই নামে সুপরিচিত হয়েছিলেন। ইনিই ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের গৃহ-চিকিৎসক। সতীশচন্দ্র পুত্রের সঙ্গী হওয়াতে বিনোদিনী দেবী এবার বিশেষ আপত্তি করলেন না। আপত্তি করলেন না সত্য, কিন্তু তাঁর প্রিয়তম পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মাতৃ-হৃদয়ের অপরিমেয় বেদনা, বোধ করি যতীন্দ্রমোহনের মতো আর কেউ সেদিন অনুভব করতে পারে নি যেদিন তিনি বিদায় নিয়ে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেছিলেন। ইহজীবনে মাতা-পুত্রে সেই শেষ সাক্ষাৎ। কারণ তিনি ইংল্যাণ্ডে থাকবার সময়েই বিনোদিনী দেবী অকালে পরলোক গমন করেন। যথাসময়ে পিতামাতার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিয়ে যুবক যতীন্দ্রমোহন ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলেন।

সেকালে অনেকেই তাঁদের ছেলেদের বিলাতে পাঠাতেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য। কারণ ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভারত সরকারের একটি উচ্চ পদলাভ অবধারিত ছিল। চাকরির সঙ্গে সম্মান, অর্থ ও প্রতিপত্তি। এই সিভিল সার্ভিসকেই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী যুবকের ইন্দ্রত্বলাভ বলে অভিহিত করেছিলেন। যাত্রামোহন নিজে আইনজীবী ছিলেন, তাই আইন ব্যবসায়ে একবার পসার লাভ হলে কী পরিমাণ যে অর্থাগম হতে পারে তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করেই তিনি তাকে সিভিলিয়ান হতে দেন নি, ব্যারিস্টার হওয়ার কথাই চিন্তা করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহনেরও মনে কোনোদিন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্মায় নি। তিনি তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য ব্যারিস্টার হতে চেয়েছিলেন।

যাত্রামোহনের একজন ইংরেজ বন্ধু ছিলেন। তাঁর নাম এণ্ডারসন সাহেব। যতীন্দ্রমোহন যখন ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন তখন যাত্রামোহন একটি পরিচয়পত্র লিখে দিয়ে পুত্রকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। লণ্ডনে পৌঁছে একদিন যতীন্দ্রমোহন মিস্টার এণ্ডারসনের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সাহেব খুব চমৎকৃত হলেন। তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে এসেছেন শুনে এণ্ডারসন যতীন্দ্রমোহনকে বললেন, 'Why don't you sit for the I. C. S. examination ? If you succeed, you will at once enter into the covetable Service under the Government of India.

—But the wishes of my father are otherwise, Sir.

—I will write to him and secure his consent.

—Thank you Mr. Anderson for the advice you have given to me. To enter into the Service after passing the I. C. S. examination is not the ambition of my life.

—But think of the future prospects once you get into the Service.

—It is not at all alluring to me, for it will put me in chains eventually which I detest from the bottom of my heart.'

এইরকম দৃপ্ত উত্তর শুনবার পর এণ্ডারসন সাহেব আই. সি. এস. পড়ার জন্য তাঁর বন্ধু-পুত্রকে আর পীড়াপীড়ি করেন নি। এই ঘটনাটি থেকেই আমরা যতীন্দ্রমোহনের স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় পাই। শৃঙ্খল সুবর্ণনির্মিত হলেও শৃঙ্খল, এই বোধটা দেখা যাচ্ছে সেই বয়সেই তাঁর মধ্যে সুদৃঢ় হয়েছিল। আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি যে, সুভাষচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর চাকরিতে যথারীতি বহাল হয়েছিলেন, কিন্তু যোগদানের পূর্বে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন প্রথম থেকেই দৃঢ়চিত্ততার সঙ্গে উক্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান

করেছিলেন। উত্তরকালে যিনি জননায়কের পদে অধিষ্ঠিত হবেন ও দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবেন সেই যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে এটা স্বাভাবিক ছিল। দেশপ্রিয়ের দেশপ্রেম যে কতখানি নিখাদ ছিল, এই ঘটনাটিই তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে।

এখানে আরো একটি ঘটনার কথা উল্লেখ্য। যতীন্দ্রমোহন যখন বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে যান তখন সেই বছরেই স্বনামধন্য গুরুসদয় দত্ত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য ও-দেশে গিয়েছিলেন এবং সেইখানেই উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। এই লেখক একবার গুরুসদয় দত্তের মুখে শুনেছিলেন যে, যতীন্দ্রমোহনকে ব্যারিস্টারির বদলে সিভিল সার্ভিস পড়বার জন্য অনুরূপ অনুরোধ তৎকালীন লণ্ডনপ্রবাসী আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী করেছিলেন, কারণ তাঁদের মনে এই ধারণাটা বলবৎ ছিল যে, বাঙালীর ছেলে যত বেশি সংখ্যায় সার্ভিসে প্রবিষ্ট হতে পারে, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল-জনক। কিন্তু, দত্তসাহেব বলেছেন, যতীন তাঁর সিদ্ধান্তে অচল-অটল ছিলেন, কিছুতেই তাঁকে এই বিষয়ে কেউ রাজী করাতে পারেন নি। তাঁকে সব সময়ে একটা কথাই বলতে শুনেছি--'To enter into this Heaven-born Service is to enter into an abject slavery under an alien government which I am the last person to do'

এই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। চট্টগ্রামের বুকভরা নিধি। বাংলার বুকভরা ধন। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা ও নির্ভীক সেনাপতি যতীন্দ্রমোহন। সিভিল সার্ভিসের সোনার খাঁচায় প্রবেশ করার চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে কোনোদিনই উদয় হয় নি। বাঙালীর সৌভাগ্য, দেশবন্ধুর অকালমৃত্যুর পরে দেশপ্রিয়ের মতো এমন একজন স্বাধীনতার পূজারী নেতাকে তারা পেয়েছিল। কিন্তু সে-কথা যাক, আমরা এখন আমাদের কাহিনীতে ফিরে যাই।

ইংল্যাণ্ডে এসে যতীন্দ্রমোহন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ডাউনিং কলেজে প্রবিষ্ট হলেন। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষায়তনগুলির আদর্শ স্বতন্ত্র, ধরন-ধারণ পৃথক। এখানে মনের উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে ছাত্রদের শারীরিক উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। এখানকার স্কুল-কলেজগুলিতে তাই ছাত্রদের মানসিক শিক্ষার প্রতি যেমন যত্ন ও গুরুত্ব দেওয়া হয়, তেমনি তাদের নিয়মিত শরীরচর্চার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এখানকার শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ্‌গণ complete education-এর বিশেষ পক্ষপাতী এবং তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, যে ছাত্র খেলাধূলা বা ব্যায়ামচর্চায় উদাসীন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সাফল্যের মূল্য তত কম। অন্যদিকে যে ছাত্র ক্রীড়ায় পারদর্শী অথবা শরীরচর্চায় বিশেষভাবে মনোযোগী, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র অপেক্ষা তার মূল্য ও মর্যাদা খুবই বেশি। বলা বাহুল্য, ডাউনিং কলেজে প্রবিষ্ট হওয়ার পর এখানকার পরিবেশ যতীন্দ্রমোহনকে স্বভাবতই আকৃষ্ট করল। আশৈশব খেলাধূলায় তাঁর অনুরাগ—সেই অনুরাগ ডাউনিং কলেজের অনুকূল পরিবেশে যেন শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। তার উপর এখানে ছিল না গৃহশিক্ষকের শাসন।

অল্পদিনের মধ্যেই ভারত থেকে নবাগত ছাত্র যতীন্দ্রমোহন শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রিয়দর্শন, সুগঠিত অবয়ব, মিষ্টভাষী ও সদালাপী এই ভারতীয় ছাত্রটি সহজেই কলেজের ছাত্রদের নেতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। যে নেতৃত্ব তিনি ইতিপূর্বে হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের মাঠে দেখিয়েছিলেন, ডাউনিং কলেজের মাঠেও তিনি সেই প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ছাত্রসমাজের নেতা হয়ে উঠেছিলেন। এটা তাঁর পক্ষে বড়ো কম গৌরবের বিষয় ছিল না। ক্রিকেট, টেনিস, হকি ও রোয়িং (দাঁড়টানা)—প্রত্যেকটিতে তিনি সমান পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। 'The

sportsman student from India.' কেম্ব্রিজে যতীন্দ্রমোহন সম্পর্কে এই খ্যাতি রটে গিয়েছিল সেদিন।

শুধু কি খেলাধুলা? কলেজের সাংস্কৃতিক জীবনেও যতীন্দ্রমোহন তাঁর স্থান করে নিতে পেরেছিলেন অল্প সময়ের মধ্যেই। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এখানে 'Cambridge Indian Majlis' এবং 'East and West Association'—এই নামে দুটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। যতীন্দ্রমোহন এই দুটিরই সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সমকালীন বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি এই সমিতি দুটির বিভিন্ন অধিবেশনে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিতেন, ছাত্র-শ্রোতাগণ সে-সব বক্তৃতা উপভোগ করতেন ও তাঁর বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। কলেজের ডিবেটিং সোসাইটিতেও তিনি অংশগ্রহণ করে সকলকে চমৎকৃত করতেন। যে প্রতিভার স্ফুরণ প্রেসিডেন্সী কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে দেখা গিয়েছিল কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে তাঁর মধ্যে সেই প্রতিভার যেন পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা গিয়েছিল।

'মজলিসে' মাঝে মাঝে বাইরের লোককে নিমন্ত্রণ করে আনা হতো এবং এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন ভারত থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তি। একবার শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে কেম্ব্রিজের ছাত্ররা তাঁদের মজলিসে কিছু বলবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ছাত্রদের সাদর নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে শাস্ত্রীজি 'ঔপনিবেশিক শাসন' (Colonial Rule) সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর তিনি উপস্থিত ছাত্রদের সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করার জন্য আহ্বান করেন। অমন গুরুগম্ভীর বিষয় সম্পর্কে কে-ই বা কী প্রশ্ন করবেন? ছাত্ররা পরস্পরের প্রতি যখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন, তখন তাঁদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালেন যতীন্দ্রমোহন। তিনি একটি প্রশ্ন করলেন: ভারতে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের কোন আইনসঙ্গত ভিত্তি আছে কি? ('Has the British Government any legal basis for

their colonial rule in India ?') প্রশ্নটি শুনে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী খুব চমৎকৃত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ভবিষ্যতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যিনি একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবেন, সেই অমিতবীর্য দেশপ্রেমিক যতীন্দ্রমোহনের পক্ষেই তাঁর ছাত্রজীবনে এইরকম একটি প্রশ্ন করা স্বাভাবিক ছিল।

কেম্বিজে অধ্যয়নকালে যতীন্দ্রমোহন কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সিভিলিয়ান গুরুসদয় দত্ত একজন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল এবং ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর সে-বন্ধুত্ব অটুট ছিল। দত্তসাহেব অবশ্য যতীন্দ্রমোহনের পূর্বেই ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে তাঁর পত্নী সরোজনলিনী দেবীর স্মৃতি রক্ষার জন্য গুরুসদয় দত্ত যে নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কিছুকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও প্রতিষ্ঠানটি যাতে স্থায়িত্ব লাভ করে সেজন্য কিছু অর্থসাহায্যও প্রদান করেছিলেন। সিভিলিয়ান হলেও লুপ্তপ্রায় ভারতীয় গণনৃত্যের (Folk dance) পুনরুজ্জীবনে গুরুসদয় দত্তের প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধিৎসা তাঁকে সংস্কৃতিবান্ বাঙালীর কাছে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল। যতীন্দ্রমোহনকে আমরা অনেক সময়ে বলতে শুনেছি যে, সিভিলিয়ান হলেও গুরুসদয়বাবু মনে-প্রাণে একজন খাঁটি স্বদেশী মানুষ ছিলেন। যেমন ছিলেন প্রথম যুগের সিভিলিয়ান স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর এই স্বদেশপ্রাণতার জন্যই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারী চাকরিতে গুরুসদয় দত্তের খুব বেশি উন্নতিলাভ ঘটেনি। কিন্তু সেজন্য তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। সরোজনলিনী নারীশিক্ষা মন্দির থেকে প্রকাশিত এবং অধুনালুপ্ত 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার সম্পাদনা ব্যাপারে এই লেখক কিছুকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই সময়ে তিনি গুরুসদয় দত্তের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। লেখকের ধারণা G. S. Dutt, I. C. S. যত বড়ো না ছিলেন তার চেয়েও অনেক বড়ো ছিলেন বাবু গুরুসদয় দত্ত—যিনি গ্রাম-বাংলার লোক-

শিল্পের পুনরুজ্জীবনে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ও স্বোপার্জিত অর্থ এজন্য অকাতরে ব্যয় করেছিলেন। বিলেত-ফেরৎ বাঙালী সমাজে এমন খাঁটি বাঙালী লেখক খুব কমই দেখেছেন। এইসব মানুষ আজ নেই, এঁদের স্মৃতিও আমাদের মানসপটে ধূসর ও ম্লান হয়ে এসেছে বললেই হয়।

যতীন্দ্রমোহনের কিছুকাল পরে জওহরলাল নেহরু কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করতে আসেন। উত্তরকালে এই দুই দেশনেতার মধ্যে কী ঘনিষ্ঠ সম্প্রীতির ভাব গড়ে উঠেছিল তার উল্লেখ আছে নেহরুর আত্ম-জীবনী ও তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে। কেম্ব্রিজের অনেক প্রাক্তন ছাত্রের কাছে তিনি যতীন্দ্রমোহনের সুখ্যাতির কথা অনেক শুনেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন লণ্ডনে থাকতেই জওহরলালের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তখন কে জানত যে, ভারতের এই দুই তরুণ ছাত্র একদিন কংগ্রেসের পতাকা তলে মিলিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবেন?

॥ চার ॥

প্রবাসে তাঁর ছাত্রজীবনে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা যতীন্দ্রমোহনের স্নেহময়ী মায়ের আকস্মিক ও অকালমৃত্যু। যেদিন (১৯০৬, জুলাই) এই দুঃসংবাদ বহন করে তাঁর কাছে তারবার্তা এলো সেদিন মাতৃ-বিয়োগ বেদনায় তাঁর হৃদয় ভরে উঠেছিল। অতীতের স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তাঁর সমস্ত দেহ-মন। মনে পড়ল বিনোদিনী দেবীর অশ্রুপ্লাবিত আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তিনি একদিন প্রবাসযাত্রা করেছিলেন ; মনে পড়ল প্রাণ-প্রিয় পুত্রকে বিদায় দিতে মায়ের সেদিন কত না কষ্ট হয়েছিল। মাতৃভক্ত যতীন্দ্রমোহন প্রতি ডাকেই মায়ের কাছে চিঠি পাঠাতেন, মায়ের সংবাদ নিতেন এবং প্রত্যেক চিঠিতেই তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিতেন যে, তাঁর অধ্যয়ন শেষ হয়ে গেলে তিনি আবার তাঁর মায়ের কোলে ফিরে আসবেন। কিন্তু আজ মায়ের এই আকস্মিক মৃত্যুতে সে আশা চিরদিনের মতো নির্মূল হয়ে গেল। আমরা অনুমান করতে পারি যে, বিনোদিনী দেবীর মৃত্যুসংবাদ যতীন্দ্রমোহনের হৃদয়ে যেন বজ্রের তুল্য আঘাত হেনেছিল সেদিন। অশ্রুধারায় ভেসে গিয়েছিল তাঁর বুক। বার বার যেন যতীন্দ্রমোহনের স্মৃতিপটে মায়ের সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখে পুত্রকে বিদায় দেবার দৃশ্যটি ভেসে উঠতে থাকে।

কিন্তু পিতার কথা স্মরণ করে যতীন্দ্রমোহন আরো অস্থির হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অবিলম্বে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি এসে দেখলেন যে, যাত্রামোহন যেন শোকে একেবারে

ভেঙ্গে পড়েছেন। ভেঙ্গে পড়বারই কথা। কারণ তাঁর পিতার মুখেই তিনি শুনেছিলেন যে, যাত্রামোহনের জীবনে ও সংসারে বিনোদিনী দেবী ছিলেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী। সেই জীবনসঙ্গিনী ও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে হারিয়ে পিতা যে কী পরিমাণ শোকাহত হয়েছেন, তা যতীন্দ্রমোহন আপন অন্তর দিয়েই অনুভব করলেন। কিন্তু তার চেয়েও বেদনাদায়ক দৃশ্য ছিল তাঁর ছোট ছোট ভাইবোনগুলির সকরুণ মুখ, আর সেই মুখের শূন্যদৃষ্টি। সর্বকনিষ্ঠ সহোদরটি—রণেন্দ্রমোহন—তখন মাত্র ছয়-সাত মাসের শিশু। তাই যে বেদনা বুকে নিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরেছিলেন, কিছুকাল বাদে সেই বেদনা নিয়েই যতীন্দ্রমোহন আবার ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন।

১৯০৭ সালে যতীন্দ্রমোহন প্রাথমিক ল ট্রাইপস্ (Law Tripos) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। পরের বছর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। তারপর ১৯০৯ সালে এল-এল. বি. উপাধি লাভ করেন এবং গ্রে'জ ইন (Gray's Inn) নামক আইন সমিতি থেকে ব্যারিস্টারির সনদ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বছর। এইবার বলব যতীন্দ্রমোহনের প্রবাসজীবনের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক কাহিনী—তাঁর পরিণয়ের কাহিনী।

কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে ওখানকার একটি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ-পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। মিস্টার ও মিসেস গ্রে'র সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের পরিচয়ের ফলেই তাঁদের একমাত্র সন্তান মিস্ নেলী গ্রে তাঁর জীবনে প্রবেশ করেন জীবনসঙ্গিনী হিসাবে। মিসেস গ্রে ছিলেন ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিপরায়ণা মহিলা। তিনি মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতে চায়ের টেবিলে তাঁদের আপ্যায়িত করতেন। তাঁর হৃদয়ের অনাবিল মাতৃস্নেহ ভারতীয় ছাত্রদের খুবই মুগ্ধ করেছিল সেদিন, বিশেষ করে একজনকে। তিনি যতীন্দ্রমোহন। এই চায়ের টেবিলেই কুমারী নেলী গ্রে'র সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। প্রিয়দর্শন যতীন্দ্রমোহনের স্বভাবের মধ্যে এমন

একটা আকর্ষণীয় বস্তু ছিল যা দেখে কুমারী নেলী যারপরনাই মুগ্ধ হলেন ও তাঁর কুমারী হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি ও ভালোবাসা এই ভারতীয় যুবকের প্রতি উজাড় করে দিলেন। তাঁদের প্রাথমিক পরিচয়টা তাই নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হতে খুব বেশি বিলম্ব হয় নি। অল্পদিনের মধ্যেই দু'জন দু'জনের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। তাঁদের কন্যা যে এই ভারতীয় ছাত্রের প্রতি অনুরাগিণী হয়েছেন, তাঁর পিতামাতা অল্পদিনের মধ্যেই সেটা বুঝতে পারলেন। সেইসঙ্গে তাঁরা এটাও বুঝলেন যে, যতীন্দ্রমোহনও তাঁদের কন্যার প্রতি অনুরক্ত। পাত্র হিসাবে তিনি সর্বাংশে উপযুক্ত।

কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিয়ে হওয়ার একটা দারুণ প্রতিবন্ধক দেখা দিল। নেলী তাঁদের একমাত্র কন্যা। তাঁর বিয়ে দিয়ে তাঁকে ভারতে পাঠাতে গ্রে-দম্পতির আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অতএব কন্যাকে তাঁদের বোঝাতেই হলো যে, যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তাঁর পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কুমারী নেলীর দুই চোখে তখন অনুরাগের অঞ্জন গাঢ় হয়ে উঠেছে—তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ তিনি তখন সঁপে দিয়েছেন এই ভারতীয় যুবককে। কৃতবিদ্য ব্যারিস্টারের পত্নী হবেন তিনি, এই আশায় কুমারীর সমস্ত অন্তঃকরণ যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ওদিকে যতীন্দ্রমোহনও একটি পত্রে অকপটে সমস্ত বিষয়টি তাঁর পিতাকে জানিয়ে এই বিবাহে যাত্রামোহনের অনুমোদন ও অনুমতি প্রার্থনা করলেন। উত্তরে যাত্রামোহন পুত্রকে লিখলেন : 'তুমি সবেমাত্র ব্যারিস্টারি সনদ পেয়েছ ; প্র্যাকটিস এখনো শুরু করো নি, আয়েরও কোনো ব্যবস্থা করতে পারো নি। এমন অবস্থায় একজন ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করলে তুমি যেমন বিব্রত হবে, তিনিও তেমনি অসুবিধা ভোগ করবেন। তুমি যদি একান্তই তাঁকে বিয়ে করতে অভিলাষী হয়ে থাক, তবে দেশে ফিরে এসে আগে উপার্জনের পন্থা দেখে নাও এবং তৎপরে কিছু অর্থসংস্থান হলে তাঁকে তুমি তোমার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারো। তাতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না।

যাত্রামোহন মিসেস গ্রে-কেও একটি পত্র লিখেছিলেন বলে জানা যায়। সেই পত্রে তিনি তাঁর আপত্তির দুটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। প্রথম—পুত্র এখন উপার্জনশীল নয়; দ্বিতীয়—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দুই তরুণ-তরুণীর মধ্যে এই বিবাহ কতদূর সুখের হবে সেই বিষয়ে তাঁর সন্দেহ আছে। হিন্দু-পরিবারে একটি হিন্দু পুত্রবধূ আনতে পারলে তিনি সুখী হতেন, তাঁর পুত্রও সুখী হতো। হিন্দু-পরিবারের নিয়ম-কানুন তাঁর কন্যা কতদূর মেনে চলতে পারবেন সে বিষয়েও তাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং প্রস্তাবিত এই বিবাহ কতদূর সার্থক ও সুখকর হবে সে বিষয়ে চিন্তা করারও আছে।

শেষ পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহন তাঁর ভাবী-পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, তিনি এখন স্বদেশে ফিরে গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করবেন। তারপর অর্থের সঙ্গতি হলে হয় তিনি কেম্ব্রিজে এসে বিবাহকার্য সমাধা করবেন, নতুবা মিস নেলী গ্রে কলকাতায় আসবেন এবং তখন দু'জনের বিয়ে সম্পন্ন হবে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে যতীন্দ্রমোহন মিস গ্রে-কে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন; অনুরূপ প্রতিশ্রুতি মিস গ্রে-ও তাঁকে দিয়েছিলেন।

মিস গ্রে'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন যতীন্দ্রমোহন। কিন্তু পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত এসে তাঁর মন সহসা অস্থির হয়ে উঠল। সমস্ত পথটা তিনি বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে কাটিয়েছেন। এই চিন্তা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তাঁর আশঙ্কা হলো মিস নেলীকে জীবনসঙ্গিনী না করে যদি তিনি দেশে ফিরে আসেন তাহলে ভবিষ্যতে তাঁদের মধ্যে এই বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হবে। মিসেস গ্রে'র মনোভাব এই ব্যাপারে যে সম্পূর্ণ অনুকূল নয়, সেটাও যতীন্দ্রমোহন যে অনুমান করতে পারেন নি তা নয়। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, যদি এই ইংরেজ কুমারীর পাণিগ্রহণ করতে হয়, তবে সেই কাজটা এখনি করাই সঙ্গত। তাঁকে বিয়ে করেই তিনি দেশে ফিরবেন।

পোর্ট সৈয়দ থেকেই তিনি সোজা কেম্ব্রিজে ফিরে এলেন। এসেই গ্রে-দম্পতির বাড়িতে গিয়ে মিস নেলীকে বললেন, 'Nellie, I must marry you now or never'. কথাটা তিনি মিসেস গ্রে-কেও জানালেন। কুমারী গ্রে পুলকিত হলেন, কিন্তু আশঙ্কিত হলেন মিসেস গ্রে। তখন তিনি তাঁর মেয়েকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, যদি তাঁদের নিষেধ সত্ত্বেও সে এই ভারতীয় যুবককে স্বামিত্বে বরণ করে তাহলে তাকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। নেলী তাঁর পিতামাতার একমাত্র সন্তান, ধনীর দুলালী। একদিকে পৈতৃক সম্পত্তি, অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন—এই দুটির মধ্যে কুমারী গ্রে দ্বিতীয়টিকেই নির্দ্বিধায় বেছে নিলেন। এর দ্বারা সেই ইংরেজ কুমারী নিঃসন্দেহে তাঁর যথার্থ প্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। যুবক যতীন্দ্রমোহনও তাঁর প্রেমের সত্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন অমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো মাঝপথ থেকে ফিরে এসে। আমরা কল্পনা করতে পারি, মিস গ্রে-কে তিনি যখন বোঝালেন যে, তাঁদের বিয়েটা যদি এখনি সম্পন্ন না হয় তাহলে ভবিষ্যতে এই বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কোনই আশা নেই, তখন নেলীর কুমারী-মন বিচলিত না হয়ে পারে নি। তারপর সব শেষে যতীন্দ্রমোহন তাঁর হাত দুটি ধরে বললেন—'And this is why I have come back from Port Saiyad. Our marriage must be solemnised now or never.'

বার বার সেই একই কথা—Now or never—এখন না হলে এ বিয়ে আর কোনোদিনই হতে পারবে না। যতীন্দ্রমোহনের এই অকপট ভালোবাসা কুমারী গ্রে'র মনকে যারপরনাই বিচলিত করল। ছোট্ট একটি কথায় সম্মতি জানিয়ে তিনি তাঁর ভাবী স্বামীকে বললেন—'Yes, we must get ourselves married before you sail for India'. এই কথা শুনে যতীন্দ্রমোহনের বুক থেকে যেন ভারী পাথরের একটি বোঝা নেমে গেল। মিস নেলী গ্রে সম্মত হলেন। এজন্য তাঁকে যদি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়

তাতেও তিনি পিছপা হবেন না—এই ভারতীয় যুবককেই তিনি স্বামিত্বে বরণ করবেন। কন্যার দৃঢ়তায় মিসেস গ্রে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনিও সম্মতি দিলেন। সম্মতি দিলেন সত্য, কিন্তু বললেন যে, প্রকাশ্যভাবে এ বিয়ে সম্পন্ন হতে পারবে না সামাজিক কারণে। নানা বাধা-বিঘ্ন ঘটতে পারে। তখন দু'জনে— যতীন্দ্রমোহন ও কুমারী গ্রে—একসঙ্গে কেম্ব্রিজ থেকে অন্যত্র চলে গিয়ে গোপনে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আবার ফিরে আসেন। মিসেস গ্রে তখন কন্যা-জামাতাকে আশীর্বাদ করলেন ও বিয়ের যৌতুক হিসাবে মিসেস গ্রে তাঁর মেয়েকে অনেক কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র প্রদান করেছিলেন। এই উপলক্ষে বাড়িতে তিনি একটি ভোজসভারও আয়োজন করেছিলেন। সেই ভোজসভায় তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সামাজিকভাবে বিয়েটা অনুমোদিত হলো দেখে যতীন্দ্রমোহন স্বভাবতই আনন্দবোধ করলেন এবং নব-পরিণীতা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। মিসেস গ্রে সজল নয়নে তাঁদের একমাত্র কন্যাকে বিদায় জানালেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। প্রদীপ্ত যৌবনের সতেজ মূর্তি যতীন্দ্রমোহনকে দীর্ঘকাল বাদে সন্দর্শন করে তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই যেমন পুলকিত হলেন, বন্ধুবান্ধবগণও হলেন তেমনি আনন্দিত। এ আনন্দের দুটি কারণ ছিল। প্রথম, তিনি ফিরেছেন কৃতবিদ্য হয়ে; দ্বিতীয়, একটি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পরিবারের কন্যার পাণিগ্রহণ করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরেছেন। বলা বাহুল্য, কেম্ব্রিজ থেকেই যতীন্দ্রমোহন একটি পত্রে তাঁর পিতাকে এই বিয়ের সংবাদ জানিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের চরিত্রে কপটতা বলে কিছু ছিল না। এক সহজ, সরল ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। কি কর্মজীবনে, কি পারিবারিক জীবনে এবং কি রাজনৈতিক জীবনে এই মানুষটি কখনো কপটতার আশ্রয় গ্রহণ

করেন নি। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই উত্তরকালে তাঁকে সর্বজনপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল।

যতীন্দ্রমোহন সস্ত্রীক স্বদেশে ফিরবার কিছুকাল পরে যাত্রামোহন মিসেস গ্রে-কে যে পত্রখানি লিখেছিলেন তার মর্মার্থ এই ছিল : 'শ্রীমতী নেলীকে পুত্রবধূরূপে লাভ করে আমি যারপরনাই আনন্দ লাভ করেছি। আমার আশঙ্কা ছিল যে, হয়ত হিন্দু-পরিবারের মধ্যে তিনি নিজেকে মানিয়ে চলতে পারবেন না। কিন্তু এখন দেখছি আমার সেই আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। আপনার কন্যা, আমি জানাতে গর্ব বোধ করছি, ইংরেজের মেয়ে হয়েও এই অল্পকালের মধ্যেই নিজেকে হিন্দুবধূর আদর্শে গড়ে তুলেছেন এবং আমাদের পরিবারের সকলেই তাঁর আচরণে ও ব্যবহারে সুখী হয়েছেন। আমি তাঁর চেয়ে ভালো পুত্রবধূ কখনো আশা করি নি।'

যতীন্দ্রমোহন যখন বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়ছিলেন, তখন তাঁর স্বদেশে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন ঘটেছিল। তখনকার ইংল্যাণ্ড-প্রবাসী অনেক ভারতীয় ছাত্র—বিশেষ করে বাংলাদেশের ছাত্রগণ—সংবাদপত্রে এই আন্দোলনের বিবরণ পাঠ করতেন। আমরা অনুমান করতে পারি যে, যুবক যতীন্দ্রমোহনও সেই আন্দোলনের সংবাদ পাঠ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ভবিষ্যতে গান্ধী-যুগের রাজনীতিতে যিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন তাঁর পক্ষে এটা স্বাভাবিক ছিল। ভারতবর্ষে গান্ধীর নেতৃত্বে যে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল, তার বেদী রচনা করেছিল উনিশ-শো পাঁচের সেই বঙ্গ-ভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন। এটা ঐতিহাসিক সত্য এখানে তাই অপ্রাসঙ্গিক হলেও সেই আন্দোলনের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা দরকার। কারণ ব্যক্তিবিশেষের জীবনকে কোনোদিনই সমকালীন ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

ইতিহাসের গতিপথেই তো এইসব জীবনের সার্থক বিকাশ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। জীবন ও ইতিহাস একসূত্রে বিধৃত। কারো জীবনের তাৎপর্য বুঝতে হলে সেই জীবনের চালচিত্রটা আমাদের দৃষ্টির সামনে রাখতেই হয়।

১৯০৫।

ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় বৎসর। লর্ড কার্জন তখন বড়লাট। যেমন ছিল তাঁর আমীরি মেজাজ, তেমনি উদ্ধত-প্রকৃতির রাজপুরুষ ছিলেন তিনি। কার্জনী শাসন-নীতি অবশ্য ভারতবাসীর পক্ষে, বিশেষ করে বাঙালীর পক্ষে, শাপে বর হয়েছিল। এক মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে লর্ড ন্যাথানিয়েল কার্জন তাঁর কার্যভার গ্রহণ করে এদেশে এসেছিলেন। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে কলকাতা গেজেটে বাংলাদেশকে—তখনকার বাংলাদেশ বলতে বুঝতে হবে একটি বিরাট ভূখণ্ড—বিহার, উড়িষ্যা ও সমগ্র বঙ্গ —শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা হবে এই অজুহাতে দ্বিধাবিভক্ত করবার প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। লর্ড কার্জন বিলাতে পার্লামেণ্টে অনুমোদনের জন্য এই প্রস্তাবটি পাঠিয়েছিলেন। আসল কথা কিন্তু তা ছিল না। এদেশে পদার্পণ করেই কার্জন বাঙালীর উগ্র দেশপ্রেমের পরিচয় পেয়ে তাকে সঙ্কুচিত করার মতলব নিয়ে বঙ্গ-ভঙ্গের পরিকল্পনাটি রচনা করেছিলেন।

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চারদিকে বিক্ষোভ দেখা দিল। বিক্ষোভ থেকে প্রতিবাদ। বাংলার নেতৃবৃন্দ হাজার-হাজার গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকপত্র পাঠালেন বিলাতে ভারত-সচিবের কাছে। এই স্মারকপত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও স্বাক্ষর করেছিলেন। আর এর মুসাবিদা রচনা করেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, যাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল সেই স্বদেশী আন্দোলন। আটমাস পরে বিলাত থেকে সংবাদ এলো—পার্লামেণ্ট কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। এই সময়ে কার্জন বলেছিলেন: 'The Partition of

Bengal is a settled fact.' এরই প্রত্যুত্তর শোনা গিয়েছিল টাউন হলের এক মহতী জনসভায় সুরেন্দ্রনাথের বজ্রকণ্ঠে : 'I will unsettle the settled fact.' এই সভা হয়েছিল ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট তারিখে। সুরেন্দ্রনাথ মুখে যা বলেছিলেন, কাজেও তিনি তাই করেছিলেন। বাঙালী যা সঙ্কল্প করেছিল তা চরিতার্থ হয়েছিল দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকালব্যাপী আন্দোলনের ফলে। যতীন্দ্রমোহন যখন ব্যারিস্টার হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন সেই আন্দোলন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল, আর মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি যখন কিছুদিনের জন্য এসেছিলেন তখন তিনি সেই আন্দোলনের প্রথম পর্যায় লক্ষ্য করে থাকবেন।

টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল। এই সভাতেই সর্বাত্মক জাগরণকে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। এই সভায় বাঙালী এই শপথ গ্রহণ করেছিল : 'যদি বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়, তাহলে বাঙালী বিলাতি বস্ত্র, বিলাতি দ্রব্য বর্জন করবে।' লক্ষকণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল এই শপথ! এই স্মরণীয় শপথের কাব্যরূপ রচনা করেছিলেন সেদিনের চারণ-কবি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে :

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

বাংলার ঘর, বাংলার হাট
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কালচক্রের বিবর্তনে এবং ইতিহাসের অমোঘ বিধানে এই ঘটনার সুদীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথের এই উদ্দীপনাময়ী সঙ্গীত নতুন বাংলাদেশের (১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পর যার নাম হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান) মুক্তিসংগ্রামে অভূতপূর্ব প্রেরণা জুগিয়েছিল। ওপার বাংলায় আজ আমরা যে নব সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করলাম প্রধানত রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের ভাষাই তাকে সার্থক করে তুলেছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলনই সূচনা করে দিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম—যার পরিণতি বর্তমানকালের আন্তর্জাতিক ইতিহাসের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যে মুক্তিসংগ্রাম ঘটল ১৯০৫ সালের সেই বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যেই কি তার বীজটা ছিল না? ইতিহাসের কার্য-কারণ প্রক্রিয়া দুর্জ্ঞেয় এবং তার গতিপথে যেসব বিচিত্র ঘটনা একটির পর একটি ঘটে যায় তার তাৎপর্য অনুধাবন করলেই আমরা বুঝতে পারি যে, অতীত ঘটনার মধ্যেই থাকে ভবিষ্যৎ ঘটনার সম্ভাবনা এবং তাই-ই একদিন আত্মপ্রকাশ করে বর্তমানের মধ্যে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে, ইতিহাসের দৃষ্টিতে আমরা সেই স্মরণীয় স্বদেশী আন্দোলনের শেষ অধ্যায় বলেই অভিহিত করতে পারি।

১৯০৫-এর ১লা সেপ্টেম্বর সিমলা শৈলশিখর থেকে গভর্নমেন্ট সরকারীভাবে ঘোষণা করলেন বঙ্গ-বিভাগ। এক বাংলা—পূর্ববাংলা আর পশ্চিমবাংলা হয়ে মানচিত্রে ফুটে উঠল; এক বাঙালী কার্জনের কলমের এক খোঁচায় দুইভাগে আলাদা হয়ে গেল। বঙ্গ-ভঙ্গ এখন আইনত বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান কিন্তু এই স্বৈরাচারী বিধান মেনে নিল না। এরই বিরুদ্ধে শুরু হলো তীব্র

এবং ব্যাপক আন্দোলন। পাঁচ বৎসরকালব্যাপী সেই আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।*

এই আন্দোলন মুখ্যত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল এবং এতে যাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আনন্দমোহন বসু, আনন্দ রায়, অম্বিকা মজুমদার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আর সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও কামিনীকুমার প্রমুখ বাংলার কবিদের কণ্ঠে দীপক রাগিণীতে রচিত হয়েছিল অপূর্ব মাতৃবন্দনা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাগরণের যে শঙ্খধ্বনি শোনা গিয়েছিল তার প্রতিধ্বনি উঠেছিল মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে, মাদ্রাজে—ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে। সেই পূর্ববঙ্গে ফুলারী শাসনের স্বৈরাচার, সেই বরিশালে রক্তপাত, সেই দু'কূলপ্লাবী প্রাণবন্যা, সেই লক্ষকোটি বাঙালীর কণ্ঠে মেঘমন্দ্রে উচ্চারিত নিষিদ্ধ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি,—সেই বিক্ষুব্ধ বাঙালীর চিত্তমথিত আবেগ ও উন্মাদনার ঝড়, সেই খরবেগে প্রবাহিত জাতীয় জীবনস্রোত—প্রবাসে তরুণ যতীন্দ্রমোহনের চেতনায় যে অনেকখানি উত্তাপ সঞ্চারিত করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

* লেখকের 'নিবেদিতা', 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ', 'দেশবন্ধু' ও 'যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ'—এই চারটি পুস্তকে স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

।। পাঁচ ।।

১৯১০।

যতীন্দ্রমোহন আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করলেন কলকাতা হাইকোর্টে।

নবাগত একজন ব্যারিস্টারের পক্ষে সহসা প্র্যাকটিস জমানো কঠিন। দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনটাই এর একটা বড়ো দৃষ্টান্ত ছিল। তাঁর জীবনে আমরা দেখেছি যে, ১৮৯৩ সালে যখন তিনি হাইকোর্টে যোগদান করেন তখন থেকে দীর্ঘ বারোটি বছর ধরে চিত্তরঞ্জনকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কারণ একজন জুনিয়রের পক্ষে অল্প দিনের মধ্যে পসার জমানো সত্যিই এক সুকঠিন ব্যাপার। তাই আমরা দেখতে পাই যে, পঁচিশ বছর বয়সে 'বারে' যোগদান করে যতীন্দ্রমোহনকে বেশ কিছুদিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। হাইকোর্টে তখন মধ্যাহ্ন দীপ্তি নিয়ে বিরাজ করছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ, যিনি সেই সময়ে কয়েকটি রাজনৈতিক মামলা, বিশেষ করে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলায় (এই মামলার প্রধান আসামী ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, পরবর্তীকালের বিশ্ববিশ্রুত ঋষি শ্রীঅরবিন্দ) আসামীপক্ষের কৌঁসুলি হিসাবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রতিভা থাকলেও আইন-ব্যবসায়ে সহসা সাফল্যলাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যতীন্দ্রমোহনের ভাগ্যেও ঘটে নি। যদিও তাঁর পিতা যাত্রামোহন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন, তথাপি একজন জুনিয়র হিসাবে যতীন্দ্রমোহনকে বেশ কিছুকাল

ব্রীফলেস ব্যারিস্টারের বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছিল। বছর তিনেক পরে রিপন ল কলেজে (রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা : রিপন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক বছর পরে এর আইন-ক্লাস খোলা হয়) যতীন্দ্রমোহন অধ্যাপনার চাকরি নিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কলেজে অধ্যাপকদের, বিশেষ করে নবাগত অধ্যাপকদের বেতন খুবই সামান্য ছিল। তাই দেখা গেল যে, চাকরি গ্রহণ করা সত্ত্বেও, যতীন্দ্রমোহনের অত্যন্ত অর্থাভাব ঘটতে লাগল।

এর কারণ ছিল। প্রথমত, সপরিবারে কলকাতায় বাস করা. দ্বিতীয়ত, ইতিমধ্যে তিনি তিনটি পুত্রসন্তানের জনক হয়েছেন (দ্বিতীয় পুত্রটি অবশ্য শৈশবেই মারা যায়): তৃতীয়ত, যাত্রামোহন তখন একদিকে ঋণভারে জর্জরিত, অন্যদিকে পত্নীর মৃত্যুর জন্য শোকসন্তপ্ত, তাই তাঁর পক্ষে যতীন্দ্রমোহনকে এই সময়ে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, তখনো বিলাতে তাঁর দুটি ছেলে পড়ছে। ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহনের জন্য ইতিহাস-বিধাতা কিন্তু আগে থেকেই ক্ষেত্র ঠিক করে রেখেছিলেন। যৌবনকালেই দেশ-জননীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেই যে তিনি নিজেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সঁপে দিয়েছিলেন তা ছিল পরিপূর্ণ সমর্পণ—ঐকান্তিক আত্মনিবেদন।

আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় যতীন্দ্রমোহনের গৌরবময় রাজনৈতিক জীবন। তারই সূচনা দেখা গেল ১৯১১ সালে ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে। যতীন্দ্রমোহন এই সম্মিলনীতে চট্টগ্রামের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর ভারতে এসে দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থার অবসান ঘোষণা করলেন। কার্জনের পরিকল্পনা শূন্যে মিলিয়ে গেল, এক বাংলা ভেঙে দু'টুকরো করা আর হলো না। রাজকীয় ঘোষণার ফলে সেই উদ্ভট ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। তবে ভারতের রাজধানীকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লী

নিয়ে যাওয়া হয়। দুঃখের বিষয়, বাংলার নেতারা সেদিন আর এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। প্রতিবাদ করেছিলেন একটি মাত্র মানুষ —তিনি বাংলার পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নবরূপে গঠন করে কলকাতাকে ভারতের Intellectual Capital করে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তাঁর জীবিতকালেই সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। কিন্তু সে-কথা থাক।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের শেষের বছরে ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল, এই জেলার অবিসম্বাদী জননায়ক ছিলেন অম্বিকাচরণ মজুমদার (ইনি একবার কংগ্রেসের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন)। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের মতোই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কথা, দুঃখের বিষয়, কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে খুব বেশি নেই। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর আত্মজীবনীতে ('এ নেশন ইন মেকিং') এঁর বিষয়ে যথেষ্ট উল্লেখ করেছেন। এই সম্মেলনীতেই যতীন্দ্রমোহনের রাজনীতিতে 'হাতে-খড়ি'। চট্টগ্রামের প্রতিনিধিরূপে তিনি এই সম্মেলনীতে যোগদান করেছিলেন এবং চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী প্রাদেশিক সম্মেলন চট্টগ্রামে আহ্বান করেছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হওয়ার পর চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলনের যে অধিবেশন বসেছিল সেটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল পরে বিচ্ছিন্ন বঙ্গের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত বাংলার প্রতিনিধি-রূপে চট্টগ্রামে এই প্রথম সমবেত হবেন—এজন্য সেদিন বাঙালী জাতির মধ্যে বিশেষ আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। যাত্রামোহনের চট্টগ্রাম—তিনিই তখন ছিলেন এখানকার বয়োবৃদ্ধ জননায়ক। দুঃখের বিষয়, এই যাত্রামোহনের কথা, কেন জানি না, সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে আদৌ উল্লেখ করেন নি।

ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল—ত্রিপুরার জননেতা রসুল সাহেব চট্টগ্রাম প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, আর

যাত্রামোহনবাবু হয়েছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম পর্বে ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালে যখন প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয় এবং যে অধিবেশন শেষ পর্যন্ত সরকারী স্বৈরাচারের জন্য পণ্ড হয়ে গিয়েছিল, তখন সেই অধিবেশনের সভাপতি এই রসুল সাহেবই নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই স্মরণীয় বরিশাল কনফারেন্সে বাংলার নেতৃবৃন্দ (এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত) যেমন উপস্থিত ছিলেন, তেমন চট্টগ্রাম কনফারেন্সেও বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মহারথিগণের অনেকেই সমবেত হলেন। বরিশাল কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত।

চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হবে—এই সংবাদ যখন প্রচারিত হলো তখন স্থানীয় ছাত্রসমাজ ও যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সে কী উৎসাহ-উদ্দীপনা। সেকালে প্রাদেশিক সম্মেলনগুলির বিশেষ গুরুত্ব ছিল এবং এখানে গৃহীত কোনো কোনো প্রস্তাব তখন সর্ব-ভারতীয় রাজনীতিতে আলোচিত হতো। অধিবেশন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সমাগত অতিথিবর্গের আদর-যত্নের যাতে কোনো ত্রুটি না নয়, যাত্রামোহনের নির্দেশে অভ্যর্থনা কমিটির সভ্যগণ সেই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হলেন। বাঙালি জাতির বরেণ্য নেতাদের যথাযথ অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তা প্রদর্শনের জন্য বিরাট প্রয়োজন চলতে লাগল। পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণের দায়িত্ব দিলেন যাত্রামোহন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে। এছাড়া সভামণ্ডপ নির্মাণ, ডেলিগেটদের বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রভৃতির দায়িত্বও নিয়েছিলেন যতীন্দ্রমোহন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, অধিবেশন বসবার একমাস আগে থেকেই সমগ্র চট্টগ্রাম শহর কর্মমুখর হয়ে উঠেছিল এবং অধিবাসীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল একটা অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। বঙ্গ-ভঙ্গ বাতিল হয়েছে, যেন বাঙালির একটা কতবড়ো রাজনৈতিক জয়লাভ ঘটেছে ছয়

বৎসর ধরে আন্দোলন করার পর। এটাই ছিল প্রাণচাঞ্চল্যের একমাত্র কারণ।

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে এই চট্টগ্রাম কনফারেন্সের কিছু বিবরণ এখানে উৎকলিত হলো: 'নির্বাচিত সভাপতি মিঃ এ. রসুল অধিবেশনের একদিন পূর্বে চট্টগ্রামে উপনীত হইলেন। যথোচিত-ভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করা হইল। তিনি যাত্রামোহনবাবুর বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। তৎপর দিন বাঙালি জাতির নেতা সুরেন্দ্রনাথ নেতৃবৃন্দের সহিত চট্টগ্রাম পেঁীছিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিরাট জনতা জমিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ সুসজ্জিত জুড়ী গাড়িতে উপবিষ্ট হইলেন। পুষ্পমাল্যে তাঁহার দেহ আবৃত হইয়া গেল। উত্তেজিত যুবক-সম্প্রদায় অশ্বদ্বয়কে মুক্ত করিয়া দিল। তৎপর বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিয়া তাহারা দেশনেতার গাড়ি টানিতে আরম্ভ করিল। বিরাট শোভাযাত্রা নগরের প্রধান প্রধান পথগুলি অতিক্রম করিয়া প্রতিনিধিগণের আবাস স্থলে উপনীত হইল। মহাসমারোহে অধিবেশন আরম্ভ হইল।'

বলাবাহুল্য, চট্টগ্রাম কনফারেন্স যুবক যতীন্দ্রমোহনের হৃদয়ে গভীর রেখাঙ্কন করে গিয়েছিল। আরো একজনের হৃদয়ে তা করে দিয়েছিল। তিনি তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা। উত্তরকালে তিনি তাঁর স্বামীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, বিলাসের আকর্ষণ বর্জন করে, স্বামীর আদর্শে ও প্রেরণায় কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে কারাবরণ পর্যন্ত করেছিলেন, সে কাহিনী আজ আমরা বিস্মৃত হয়েছি বললেই হয়। এমন কি যতীন্দ্রমোহনের অকালমৃত্যুর পরেও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয় নি। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা নিঃসন্দেহে তাঁর দেশপ্রেমিক স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী।

চট্টগ্রাম কনফারেন্সের পর যতীন্দ্রমোহন কলকাতায় ফিরে এসে আইন-ব্যবসায়ের কাজে যোগদান করলেন। দু'বছর পরে য়ুরোপে

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলো। স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ সরকারের চক্ষে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল এবং সেই কারণেই ভারত-রক্ষা আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনের বলে বহু বাঙালি যুবক রাজবন্দীরূপে নানাস্থানে অন্তরীণ হতে লাগলেন। প্রায় দু-তিনশো বাঙালি যুবককে ভারত-রক্ষা আইনে আটক করা হয়েছিল। এই সময়ে (১৯১৪) চট্টগ্রামের অন্তর্গত কুতুবদিয়া দ্বীপ একটি বৃহৎ বন্দী-নিবাসে পরিণত হয়েছিল। সতেরোজন রাজবন্দীকে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল সর্পসঙ্কুল কুতুবদিয়া গ্রামে। গ্রামটি বঙ্গোপসাগরের নিকট অবস্থিত। সমুদ্রোপকূলে শ্রেণীবদ্ধভাবে বন্দী-ভবন নির্মিত হয়েছিল। স্থানীয় পুলিশ থানার কর্মচারীদের উপর এই বন্দীদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, কিন্তু তাদের কোনোরূপ অভাব-অভিযোগ দূর করবার ক্ষমতা থানার কর্মচারীদের ছিল না।

নানা অসুবিধার মধ্যেই রাজবন্দিগণ এখানে বাস করছিলেন। সদরে পুলিশ কর্তার কাছে বার বার আবেদন-নিবেদন করেও যখন কোনো প্রতিকার তাঁরা পেলেন না এবং তাঁদের অভাব-অসুবিধা যখন অসহ্য হয়ে উঠল, তখন তারা দলবদ্ধ হয়ে চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করেন; উদ্দেশ্য—জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁদের অভাব-অভিযোগ সরাসরি জানাবেন। কিন্তু বন্দরে অবতরণ করবার আগেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অন্তরীণ-বিধি-লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়। এই হলো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কুতুবদিয়া রাজবন্দী মামলার পট-ভূমিকা। রাজবন্দীরা আহ্বান পাঠালেন চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্য। সে-আহ্বানে সাড়া দিলেন চিত্তরঞ্জন। এলেন তিনি চট্টগ্রামে; একা নয়, সঙ্গে নিয়ে এলেন যতীন্দ্রমোহনকে। এই মামলায় যতীন্দ্রমোহন তাঁর জুনিয়র ছিলেন। চিত্তরঞ্জন শুধু যে বিনা পারিশ্রমিকে রাজবন্দীদের পক্ষ সমর্থন করলেন তা নয়, তিনি নিজ অর্থব্যয়ে নানাভাবে তাঁদের সাহায্যও করলেন। এটা চাক্ষুষ করলেন যতীন্দ্রমোহন, বুঝলেন চিত্তরঞ্জনের মহত্ত্ব কোথায়।

কুতুবদিয়া মামলা উপলক্ষে এসে চিত্তরঞ্জন প্রায় একপক্ষ কাল চট্টগ্রামে অবস্থান করেছিলেন এবং যতীন্দ্রমোহনের সনির্বন্ধ অনুরোধে ঐ কয়দিন তিনি যাত্রামোহনের ভবনেই অবস্থান করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন চট্টগ্রামে এসেছেন, তাই স্থানীয় অধিবাসিগণ তার সুযোগ গ্রহণ করতে উৎসুক হলেন এবং তাঁরা তাঁর কাছে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা শুনবার জন্য ব্যগ্র হলেন। এর একটা কারণ ছিল। তখন দেশের মধ্যে সর্বত্র একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবস্থা বিদ্যমান ছিল: তাই তো চট্টগ্রামবাসী তাঁর কাছে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা জানবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। সেই ব্যগ্রতার পরিণতি ছিল চট্টগ্রামে একটি মহতী জনসভা। সভামঞ্চে তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। সেই সভায় চিত্তরঞ্জন ভাষণ তো দিলেনই, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো একটা কাজ তিনি করলেন। তরুণ যতীন্দ্রমোহনকে তিনি সকলের কাছে তুলে ধরেছিলেন সেদিন। তখনো পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রামে খুব বেশি সুপরিচিত ছিলেন না। চিত্তরঞ্জন স্বয়ং সেই জনসভায় যতীন্দ্রমোহনের গুণাবলী বর্ণনা করে তাঁর ভাবী প্রতিষ্ঠার সূচনা করে দিয়েছিলেন--নিজের হাতেই তিনি যেন সেদিন সেই তরুণের রাজনৈতিক অভিষেক ক্রিয়াটা সম্পন্ন করে এসেছিলেন চট্টগ্রামে। চিত্তরঞ্জনের এই মহত্ত্বের কথা যতীন্দ্রমোহন কোনোদিন বিস্মৃত হন নি।

যতীন্দ্রমোহনের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সহজাত ছিল বললেই হয়। তিনি যেন এই ভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও পৈতৃক উত্তরাধিকারসূত্রেও সেই ভাবটা অনেকখানি পেয়ে থাকবেন। আর সকলের উপর তাঁর কর্মজীবনের সূচনাতেই ছিল বঙ্গ-ভঙ্গজনিত আন্দোলনের উত্তপ্ত পরিবেশ। ব্যারিস্টার হয়ে তিনি যখন এদেশে ফিরলেন তখন তো চলেছে বঙ্গ-ভঙ্গ যুগ। সেই যুগ ও যুগজীবন দুই-ই তরুণ যতীন্দ্রমোহনকে প্রভাবিত করেছিল। জাগরণের স্রোত ও তার থেকে উৎপন্ন দেশব্যাপী একটা প্রখর রাজনৈতিক চেতনা—যতীন্দ্র-

মোহনের অন্তর্নিহিত দেশপ্রেমকে স্বভাবতই প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে সেই সময়ে। নইলে সেই বয়সেই রাজনীতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হবেন কেন? আইনজীবী দেশবন্ধু আর আইনজীবী দেশপ্রিয়ের মধ্যে এইখানে যেন একটা আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামের সেই জনসভায় চিত্তরঞ্জনের আশীর্বাদ ব্যর্থ হয় নি। তিনি যখন সেখানকার অধিবাসীদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, যতীন আপনাদের দেশেরই ছেলে, কিন্তু তাঁকে আপনারা চেনেন না। আপনাদের যিনি নেতা সেই যাত্রামোহনবাবুর সুযোগ্য সন্তান যতীন তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনারও সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। ভবিষ্যতে সেই-ই আপনাদের নেতা হবে—নেতা হবে সে একদিন সারা বাংলাদেশের। আমি দেখেছি তাঁর ললাটে যেন নেতৃত্বের জয়তিলক জ্বল্ জ্বল্ করছে। চিত্তরঞ্জনের এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নি। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই রাজনীতি ছাড়া যতীন্দ্রমোহনকে কল্পনা করা যায় না। এই রাজনীতি কিন্তু পোষাকী রাজনীতি ছিল না, এ ছিল তাঁর গুরুর মতোই একেবারে বেহিসাবী রাজনীতি—যে রাজনীতি মানুষকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে এবং তার জীবনের সুখ, সুখের চিন্তা সব কিছু একেবারে ভুলিয়ে দেয়। দেশবন্ধু যেমন একদিন ঘরছাড়া কোন বিবাগীর বাঁশী শুনে সর্বস্ব ত্যাগ করে স্বাধীনতা অর্জনের আশায় নেমেছিলেন পথের ধূলায়, আমরা দেখতে পাব, দেশপ্রিয়ও তেমনি তাই করেছিলেন। যতীন্দ্রনাথের কর্মজীবন অথবা রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করবার আগে, প্রসঙ্গত আমরা এখানে একটু ইতিহাসের কথা আলোচনা করব। কারণ ইতিহাসের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেখতে হয়, জীবনের সঙ্গে ইতিহাসকে। এ ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের জীবনরহস্য উদ্ঘাটনের অথবা তাঁর জীবনের মর্মকথা অনুধাবনের অন্য কোনো পন্থা নেই। কাহিনী, ঘটনা ও ইতিহাসের সমবায়েই ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃত জীবনচরিত রচনা হয়ে থাকে।

১৯১৭ সাল থেকেই বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে দেখা গিয়েছিল একটা নতুন দিক্ পরিবর্তন, শোনা গিয়েছিল একটা নতুন সুর। কংগ্রেসের জন্মের পর থেকে দীর্ঘ দুই দশককাল পর্যন্ত এর পুরোভাগে যেসব নেতৃবৃন্দ তাঁরা সকলেই ছিলেন মডারেট বা নরমপন্থী। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন মডারেটদের মধ্যে সর্বপ্রধান নেতা। এঁদের রাজনীতি ছিল আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি, যাকে অরবিন্দ ঘোষ, 'Politics of petition and prayer' বলে অভিহিত করেছিলেন। এই কথা তিনি বলেছিলেন কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধে যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় বিগত শতাব্দীর শেষ পাদে (১৮৯৩-৯৪)। তিনি তখন সবেমাত্র সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল পরে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বিলাত থেকে ভারতবর্ষে ফিরে বরোদা রাজ কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছেন। 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক কেশবরাও গণেশ দেশপাণ্ডে কেম্ব্রিজে অরবিন্দেরই সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধে তিনি এই প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন। প্রবন্ধ তো নয় যেন তূর্যধ্বনি। সবাই চমকে উঠেছিল সেগুলি পাঠ করে। অরবিন্দের বক্তব্য ছিল যে, কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির ফলে দেশে কোনোদিনই সত্যকার স্বাধীনতা আসবে না। তাঁর এই বিখ্যাত প্রবন্ধাবলীর নাম ছিল 'New Lamps for the Old' এবং অরবিন্দের এই প্রবন্ধ পাঠ করেই চিত্তরঞ্জন তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন মডারেটপন্থী ছিলেন না কোনোদিন, তিনিও কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি চিরকালই জাতীয়তাবাদী বা ন্যাশনালিস্ট দলের অনুবর্তী ছিলেন এবং এই দলের শ্যামসুন্দর উপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র প্রমুখ নেতাদের সঙ্গেই ছিল তাঁর বিশেষ সংযোগ। অরবিন্দও ন্যাশনালিস্ট দলের অন্যতম নেতা হয়েছিলেন যখন তিনি বরোদা রাজ কলেজের উচ্চবেতনের চাকরি ত্যাগ

করে সামান্য বেতনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের এই ত্যাগই তো তাঁর বন্ধু চিত্তরঞ্জনকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাংলার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে চিত্তরঞ্জন-অরবিন্দ একটি বিশেষ অধ্যায়, আর সেই অধ্যায়টির তাৎপর্য না জানতে পারলে বা না বুঝতে পারলে যতীন্দ্রমোহনের জীবনের মহিমা সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ অর্থবল ও জনবল লাভ করেছিলেন, সকলেই আশা করেছিলেন যে, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে শাসকজাতি যুদ্ধের শেষে ভারতবাসীর হাতে নিশ্চয়ই আরো অধিকতর পরিমাণে রাজনৈতিক অধিকার দেবেন। ভারতের এই প্রত্যাশা অযৌক্তিক ছিল না; এমন কি যুদ্ধের শেষভাগেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের অনেক গালভরা কথাই ভারতবাসীকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধান্তে যখন নতুন শাসন-সংস্কার (মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মস) প্রবর্তিত হলো তখন দেখা গেল যে, শাসকজাতি বিশেষ কিছুই দেন নি। এই পটভূমিকাতেই প্রতিষ্ঠিত হলো 'হোমরুল লীগ'। লোকমান্য তিলক ও য়্যানি বেসান্ত ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। এই নতুন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রথম থেকেই চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ইতিহাসের প্রয়োজনেই কংগ্রেস থেকে পৃথক এই নতুন রাজনৈতিক দলটির প্রয়োজন হয়েছিল।

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত হলো প্রাদেশিক সম্মেলন। সভাপতি—চিত্তরঞ্জন দাশ। এটি একটি স্মরণীয় সম্মেলন ছিল; স্মরণীয় এইজন্য যে, এখান থেকেই বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন আগামী দিনের দিগ্বিজয়ী নেতা দেশবন্ধু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম চার বৎসরকাল ভারতের রাজনীতিতে কোনো তরঙ্গ ছিল না, ছিল না কোনো প্রাণচাঞ্চল্য। ভবানীপুরে চিত্তরঞ্জনের

সভাপতিত্বে প্রাদেশিক সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়েছিল, বাংলার স্তিমিত রাজনৈতিক জীবনে তাই নিয়ে এসেছিল এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা। সেই উন্মাদনা তরুণ যতীন্দ্রমোহন নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার দ্বারা তিনি যে বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাবই যে রাজনীতিতে যতীন্দ্রমোহনের প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দেশের এক দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই ভবানীপুর সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল, আর প্রায় সেই সময়ে স্থাপিত হয়েছিল হোমরুল লীগ। এই সম্মেলনের সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন বাংলায় যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তার নাম ছিল 'বাংলার কথা'। সেই ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি তাঁর কাছে সেদিন স্বদেশমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল বললেই চলে। দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহনও। দেশগঠনের, জাতিগঠনের এমন একটি সুষ্ঠু ও সার্বিক পরিকল্পনা নিয়ে চিত্তরঞ্জন সেদিন সেই প্রাদেশিক সম্মেলনের মঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছিলেন যা সকলকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর 'বাংলার কথা' ভাষণটি থেকে এখানে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে দিলাম :

'আজ বাঙালির মহাসভায় আমি বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি। আমার বাংলাকে আমি আশৈশব প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।···আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলার সব দিক দিয়াই দেখিতে হইবে। বাংলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাঙালির একটা নিজস্ব সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে।···বাঙালিকে প্রকৃত বাঙালি হইতে হইবে।'

এর আগে অরবিন্দ ঘোষ বা রবীন্দ্রনাথের লেখায় ও কণ্ঠে এই কথা শোনা গিয়েছিল—কিন্তু এমন জমাট, এমন পরিষ্কার ও প্রাণ-স্পর্শী কথা বাঙালি সেই প্রথম শুনেছিল চিত্তরঞ্জনের 'বাংলার কথা' ভাষণটির মধ্যে। এক কথায়, 'বাংলার কথা' মামুলি বক্তৃতা ছিল না, এ ছিল চিত্তরঞ্জনের প্রাণের কথা, আর তাই দিয়েই তিনি সেদিন, জাতীয় জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে রচনা করেছিলেন বাংলা তথা ভারতের রাজনীতির এক নতুন সংহিতা। যুবক যতীন্দ্রমোহন যে সেই সংহিতা তাঁর হৃদয়-মন দিয়ে পাঠ করেছিলেন, তা বোধকরি না বললেও চলে। কারণ রাজনীতিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি এই ভাবেরই ভাবুক ছিলেন। দেশপ্রিয়কে তাই দেশবন্ধুর দ্বিতীয় মূর্তি বললেও অত্যুক্তি হবে না।

এইখানে একটি কথা স্মর্তব্য। স্বদেশীযুগে তাঁর ব্যারিস্টারি জীবনে দেশবন্ধু যে কয়টি বিখ্যাত রাজনৈতিক মোকদ্দমায় আসামী-পক্ষের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন (এই মোকদ্দমাগুলি তিনি বিনা পারিশ্রমিকেই করেন এবং আলিপুর বোমার মামলায় বন্ধু অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়ে তিনি তো রীতিমতো ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাঁর এই ত্যাগের কি কোনো তুলনা আছে?) তার প্রত্যেকটির সওয়ালে তিনি শুধু গভীর আইন জ্ঞানেরই পরিচয় রাখেন নি, সেইসঙ্গে তিনি দেশপ্রেমেরও একটা নতুন দর্শন বা Philosophy দিয়েছিলেন। আজ একথা বলবার দিন এসেছে যে, চিত্তরঞ্জন-প্রদত্ত সেই দর্শনকেই ভিত্তি করে গান্ধীযুগের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন তার ঐতিহাসিক সফলতা লাভ করেছিল। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের যে নতুন ভাষ্য রচনা করেছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ, ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের ছত্রে ছত্রে তারই প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। উত্তরকালে যতীন্দ্রমোহনকে আমরা তাই বহুবার বলতে শুনেছি : 'Deshbandhu gave us a new philosophy, a new creed in politics that has paved our path to

freedom.' এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, দেশপ্রিয় সর্বাংশেই দেশবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন।

বলেছি, যুদ্ধশেষে ইতিহাসের প্রয়োজনেই ভারতের রাজনীতিতে হোমরুল লীগের অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, অল্পদিনের মধ্যে হোমরুল আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল। এর ফলে গভর্ণমেন্ট য়্যানি বেসান্তকে সেদিন অন্তরীণাবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর গ্রেপ্তারে সেই সময়ে কলকাতায় যে প্রতিবাদ-সভা হয়েছিল তাতে চিত্তরঞ্জন এই স্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন: 'I do not think the God of Humanity was crucified only once. Tyranny and oppressors have crucified humanity again and again. Every outrage on humanity is a fresh nail driven through his sacred flesh.' চিত্তরঞ্জনের এই মন্তব্যটির গভীরতা অনুধাবন করে উত্তরকালে যতীন্দ্রমোহন বলতেন, দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিভা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করার মতো মানুষ এদেশে খুব কমই ছিলেন। কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই চেতনা সেদিন সুদুর্লভ ছিল, বিরল ছিল এই রাজনৈতিক বোধ। 'A political philosophy of Deshbandhu's status is rare in our long history of national struggle'—দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর এক জনসভায় প্রদত্ত দেশপ্রিয়ের এই উক্তিটি বিশেষভাবেই স্মর্তব্য।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের দ্বাত্রিংশ অধিবেশন বসল কলকাতায়। চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যতীন্দ্রমোহন এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। তখন ভারতসচিব মণ্টেগুর ঘোষণায় আসন্ন শাসন-সংস্কারের আভাস পাওয়া গিয়েছে। এই সময়েই চিত্তরঞ্জন রাজনীতিতে পুরোপুরিভাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং যতীন্দ্রমোহনকে আমরা তখন থেকেই তাঁর পার্শ্বে দেখতে পাই। তাঁরও রাজনৈতিক জীবন যে এই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল, তা

বলা চলে। তবে চিত্তরঞ্জনের কর্মস্থল ছিল কলকাতা, আর যতীন্দ্রমোহনের কর্মকেন্দ্র তখন ছিল চট্টগ্রাম।

পরবর্তীকালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল বাংলার নেতৃত্ব। তাঁর সেই মহিমান্বিত নেতৃত্বের কথা বলবার আগে সমসাময়িক ইতিহাসের কথা আরো একটু বলতে হবে।

১৯১৯। মে মাস।

মৈমনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন। এই অধিবেশনের সমধিক গুরুত্ব ছিল। সেই গুরুত্ব বুঝতে হলে তার আগের ইতিহাস একটু জানতে হয়। ১৯১৮ সালের ২২শে এপ্রিল প্রকাশিত হয় মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট। লর্ড চেমসফোর্ড তখন ভারতের বড়লাট। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইটহুড ত্যাগের সেই ঐতিহাসিক পত্রখানি এই চেমসফোর্ডকেই সম্বোধন করে লিখেছিলেন। ভারতের সমকালীন রাজনীতিতে এই রিপোর্টের গুরুত্ব খুব বেশি, কারণ প্রস্তাবিত নতুন শাসন-সংস্কার কতটুকু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভারতবাসীকে দেওয়া হবে তারই ইঙ্গিত ছিল এই রিপোর্টের মধ্যে। রিপোর্ট পাঠ করে কংগ্রেসের নেতারা দেখলেন যে, ভারতশাসনের যথার্থ সমস্যা সম্পর্কে শাসকজাতি বিশেষ কিছু চিন্তা করেন নি—এতকাল ধরে রাজত্ব করার পর অনেকেই আশা করেছিলেন যে, এবারকার শাসন-সংস্কারে সারবান বস্তু কিছু থাকবে। নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলল না এর মধ্যে। বরং দেখা গেল যে, শাসনভার ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করার পথে যেসব বাধা রয়েছে রিপোর্টে ভারতসচিব ও বড়লাট দুজনে তাই-ই আলোচনা করেছেন। শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন হওয়া দরকার—এই স্বীকৃতি অবশ্য ছিল এবং স্বায়ত্তশাসন দেওয়া চলতে পারে না, সে-কথাটাও রিপোর্ট প্রণেতাগণ বলেন নি। রিপোর্টের একস্থলে উল্লিখিত হয়েছিল: "Cautious

advance towards the progressive realisation of Responsible Government.” এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভারতবাসীর হাতে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে এটা শাসকজাতি প্রকারান্তরে মেনেই নিয়েছিলেন। মডারেট নেতারা যে এই রিপোর্টে খুশি হয়েছিলেন তার একটা কারণ এই ছিল যে, তাঁরা এর মধ্যে তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রথম ধাপটা যেন দেখতে পেয়েছিলেন, এবং সেই কারণেই ১৯১৯ সালের নতুন ভারতসংস্কার আইন তাঁরা গ্রহণ করবার জন্য তাঁদের হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু চরমপন্থী নেতাদের কাছে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। হোমরুল লীগের নেত্রী য়্যানি বেসান্ত তো স্পষ্টই বললেন: ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই পরিকল্পনা যেমন অগৌরবের, ভারতবাসীর কাছে ইহা তেমনি গ্রহণের অযোগ্য।' তিলক আরো স্পষ্ট করে বললেন: 'এই পরিকল্পনা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।' আর চিত্তরঞ্জন বললেন: 'নামে স্বায়ত্তশাসন, অথচ কাযত কিছুই নয়—এমন জিনিস আমরা চাই না। এই সংস্কারে আমাদের প্রয়োজন নেই।' মডারেট-প্রধান সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'যতটুকুই পাই ততটুকুই গ্রহণ করব।' এই সময়ে চিত্তরঞ্জন যখন প্রস্তাবিত নতুন শাসন-সংস্কারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনমত গড়ে তোলার জন্য সমগ্র উত্তর ও পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করে জেলায় জেলায় বক্তৃতা করেন সেই সময়ে চট্টগ্রামের বিশ্বম্ভর থিয়েটার হলে আয়োজিত এক সভায় সুরেন্দ্রনাথকে একজন ডিগবাজী-খাওয়া রাজনীতিবিশারদ বলে অভিহিত করেছিলেন।

তবে জাতির পক্ষে এটা এক হিসাবে শাপে-বর হয়েছিল বলতে হবে। একদা লর্ড কার্জনের খামখেয়ালির ফলে বাংলাদেশ যেমন জেগে উঠেছিল, জ্বলে উঠেছিল, ভারতের রাজনীতিতে এই সময়ে ঠিক তেমন অবস্থাই ঘটল। এই রিপোর্ট ও নতুন শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মডারেটরা গেলেন অস্তাচলে আর ভারতের রাজনৈতিক

গগনে প্রভাতসূর্যের মতো অভ্যুদিত হলেন গান্ধী-চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নবীন নেতৃবৃন্দ। একেই বলে ইতিহাসের ভাঙাগড়া। এই রিফর্মের দরুনই গান্ধী-দেশবন্ধু প্রমুখ নেতারা ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিলেন। তখনো পর্যন্ত কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোনো বিষয়ের জরুরী আলোচনার জন্য কখনো বিশেষ অধিবেশন বসে নি—বৎসরান্তিক অধিবেশনই হয়ে এসেছে এতকাল। সেই ধারার এইবার পরিবর্তন হলো। চিত্তরঞ্জন প্রস্তাব করলেন কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনের জন্য। তাঁর প্রস্তাবে গান্ধী সম্মত হলেন এবং বোম্বাইতে এই বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে। কথিত আছে, চিত্তরঞ্জন একাই এই অধিবেশনের অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করেছিলেন।

২৯শে আগস্ট বোম্বাইতে কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম। মডারেটরা এই অধিবেশন বর্জন করেন। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টই ছিল এই অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। বস্তুত, এই সময় থেকেই কংগ্রেসের রাজনীতিতে ও ভারতের জাতীয় জীবনে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হিসাবে চিত্তরঞ্জন স্বীকৃতিলাভ করেন এবং তখন থেকেই যতীন্দ্রমোহন মনে-প্রাণে তাঁরই অনুগামী হয়ে উঠতে থাকেন। এখানে উল্লেখ্য যে, যখন বোম্বাইতে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হলো যে, প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার গ্রহণ করা ভারতবাসীর পক্ষে অপমানজনক, তখন সেই একই সময়ে বোম্বাইতে মডারেটদের নতুন দল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়েছিল: 'ইহা সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের একটি বড়ো রকমের দান। আমরা ইহা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।' যাইহোক, কংগ্রেসের পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বলে সাব্যস্ত হলো।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট যে সময়ে প্রকাশিত হয়, প্রায় ঠিক সেই সময়েই প্রকাশিত হয় রৌলট কমিটির প্রতিবেদন। যুদ্ধ শেষ

হয়ে যাওয়ার পর ভারতে, বিশেষ করে বাংলা ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তদন্ত করার জন্য ভারত সরকার এই কমিটি গঠন করেছিলেন ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। লণ্ডন হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার সিডনি রৌলট ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। তিনি ব্যতীত আরো পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই পাঁচজনের দুজন ছিলেন ভারতীয়, যথা, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি কে. শাস্ত্রী ও স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র (সুরেন্দ্রনাথের আমলে ইনিও একজন মন্ত্রী হয়েছিলেন)। রৌলট রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ছয়মাস পরে ১৯১৮ সালের ১৯শে জুলাই আর এর মাত্র দশদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট। ছায়া এবং রৌদ্রে যতখানি তফাৎ এই দুটি রিপোর্টের মধ্যে ঠিক ততখানিই পার্থক্য দেখে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর মনে দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই রৌলট কমিটির রিপোর্টকে উপলক্ষ্য করেই সেদিন ভারতের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে ঘটেছিল মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব।

বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এই কুখ্যাত রৌলট কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন তা উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করেছিল। এই রিপোর্টের নিন্দা করে সেদিন যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল তার সমর্থনে বক্তৃতা করতে করতে উঠে গান্ধী বলেছিলেন: 'This Report is unjust, subversive of all the principles of liberty and justice and destruction of the elementary rights of the individual.' বিক্ষুব্ধ ভারত যেন তার নতুন নেতার মুখ দিয়ে ঘোষণা করল তার অন্তরের প্রতিবাদ।

কিন্তু প্রতিবাদ সত্ত্বেও রৌলট বিল আইনে পরিণত হলো।

সঙ্গে সঙ্গে ...মিষ্ঠ হলো ভারতের মাটিতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, যার প্রথম সূচনা করেছিলেন সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অরবিন্দ

ঘোষ। প্রকৃত পক্ষে আমাদের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে এটাই ছিল অরবিন্দের অন্যতম দান। গান্ধীর হাতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ লাভ করেছিল নতুন ব্যঞ্জনা আর পূর্ণতর পরিণতি—এটাই ছিল তাঁর বিশেষ দান। রৌলট আইন পাশ হয় ১৯১৯ সালের ২১শে মার্চ তারিখে। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সহসা যেন বিস্ফোরকের ভাব ধারণ করল। আকাশে দেখা দিল ঝড়ের মেঘ। সেই মেঘের অন্তরাল থেকে সেদিন মুহুর্মুহু যে বজ্র আর বিদ্যুৎসম্পাত লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার আনুপূর্বিক বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই।

৬ই এপ্রিল রবিবার রৌলট আইনের প্রতিবাদে গান্ধী সারা ভারতবর্ষে ঘোষণা করলেন সত্যাগ্রহ দিবস। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সারা ভারতবর্ষই সেদিন গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল এবং সর্বত্রই শান্তিপূর্ণভাবে গান্ধীর নির্দেশ অনুসারে হরতাল প্রতিপালিত হয়েছিল। এতটা যে হবে, সেটা সরকারের কল্পনার বহির্ভূত ছিল। রাজধানী দিল্লীতে সত্যাগ্রহের চূড়ান্ত সফলতা পরিদর্শন করে চেমস্‌ফোর্ড স্বয়ং বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু আচম্বিতে ঘটনার স্রোত অন্যদিকে মোড় নেয়। দিল্লীতে শোভাযাত্রাকারী জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং বহুলোক হতাহত হয়। কলকাতা, অমৃতসর, বোম্বাই ও আমেদাবাদেও বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রাকারীদের ওপর গুলী চলে। আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে, সেখানকার দুজন জনপ্রিয় নেতার —ডাঃ কিচলু ও ডাঃ সত্যপাল—গ্রেপ্তারের ফলে। এরই পরিণতি ছিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নববর্ষের বৈশাখে (১৩ই এপ্রিল ১৯১৯) অনুষ্ঠিত হয় নৃশংস হত্যাকাণ্ড, যার নায়ক ছিলেন জেনারেল ডায়ার। এই পরিবেশে গান্ধী তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন।

এই পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হয় মৈমনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার অধিবেশন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন স্বভাবতই উত্তপ্ত ছিল,

আর বাঙালি ছিল উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন যাত্রামোহন। তখন তিনি বৃদ্ধ এবং তখন তাঁর দুইটি পুত্র-কন্যার মৃত্যুর ফলে তাঁর জীবনে ঘটেছে শোকের গভীর ছায়াপাত। তথাপি জাতির আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়ে পারলেন না। এই কনফারেন্সে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা সকলেরই হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। পিতার সেই অভিভাষণ সতেজ দৃপ্তকণ্ঠে পাঠ করেছিলেন পুত্র যতীন্দ্রমোহন। সেদিনও তিনি বাংলার বহু নেতার কাছে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই ১৯১৯ সালের শেষভাগেই কলকাতায় যাত্রামোহনবাবু লোকান্তরিত হন।

পিতার মৃত্যুর পর একটি গুরুতর কর্তব্যের বোঝা যতীন্দ্রমোহনকে বহন করতে হয়। জমিদারী দেখা, বৃহৎ পরিবার-পরিচালন, কনিষ্ঠ ভাই-বোনদের মানুষ করা, নিজের আইন-ব্যবসায় প্রভৃতি এতগুলি কাজের দায়িত্ব একসঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তখন ভারতবর্ষের উপর দিয়ে যেন কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে চলেছে—পাঞ্জাবে জ্বলে উঠেছে অশান্তির আগুন। সেই পরিবেশেই ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাব-কেশরী লালা লজপত রায় (ইনি তখন অনেক বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রচার-কার্য চালিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছেন) এই অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে যতীন্দ্রমোহন অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই কংগ্রেসেই গান্ধী তাঁর অহিংস-অসহযোগের কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং চিত্তরঞ্জন সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। যতীন্দ্রমোহনও তাঁর নেতা ও রাজনৈতিক গুরুর ছন্দানুবর্তী হয়ে অসহযোগ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন।

॥ ছয় ॥

—যতীন, নাগপুরে আমি কিন্তু মহাত্মাজিকে oppose করব।

—তাহলে তো বাংলা থেকে আমাদের অনেক ডেলিগেট নিয়ে যেতে হয়।

—তা তো হবেই। সাতকড়িকে বলেছি, অন্তত শ' পাঁচেক তো নিয়ে যেতেই হবে।

—তার তো খরচ অনেক।

—খরচ আমি দেব। আমি স্পেশাল কংগ্রেসে মহাত্মাজিকে কত বোঝালাম যে, দেশ এখনো তৈরি হয় নি ; দেশের লোক নন-কো-অপারেশন প্রোগ্রাম কতখানি গ্রহণ করবে সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

—সন্দেহ আমাদেরও আছে, তবে গান্ধীজি বলছেন এইটাই নাকি উপযুক্ত সময়। এই সময়ে কিছু না করলে নতুন রিফর্ম চালু হয়ে গেলে তখন আর কিছু করা যাবে না।

—কিন্তু যে mass আন্দোলনের কথা মহাত্মাজি চিন্তা করছেন, আমি ভেবে দেখেছি তার জন্য দেশ এখনো ঠিকমতো প্রস্তুত হয় নি। সেজন্য অন্তত আরো পাঁচটা বছর সময় দরকার।

--কলকাতার প্রস্তাব নাগপুরেই তো চূড়ান্ত রূপ নেবে। অন্যসব প্রদেশের ডেলিগেটরা কি আপনাকে সমর্থন করবেন ?

—সেইজন্যেই তো আমরা বাংলাদেশ থেকে দলে ভারী হয়ে নাগপুরে যাব ঠিক করেছি। আন্দোলনের পক্ষে সময়টা যে খুবই

অনুকূল তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পুনরুক্তি না ঘটে শেষ পর্যন্ত। আমি বিপিনবাবুকে বলেছি, তিনিও আমাকে সমর্থন করবেন। শ্যামসুন্দরবাবু অবশ্য এর মধ্যেই একজন পুরোদস্তুর নন-কোঅপারেটর হয়ে উঠেছেন।

—হ্যা, স্পেশাল কংগ্রেসের সময় 'সার্ভেন্ট' কাগজ বের করে তিনি খুব জোরের সঙ্গেই অহিংস-অসহযোগ নীতি প্রচারের কাজে লেগে গেছেন।

—তাই তো ভাবছি যতীন, ভবিষ্যতের জন্য নাগপুর আমাদের কোন্ পথ দেখাবে ?

চিত্তরঞ্জনের রসা রোডের বাড়িতে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন সন্ধ্যায় গুরু-শিষ্যের মধ্যে এই রকম আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনাটি ছিল খুবই গুরুতর। সামনেই নাগপুরে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন। অসহযোগের সমর্থক এবং অসহযোগের বিরোধী—দুই পক্ষই প্রস্তুত হয়ে সমবেত হয়েছিলেন কংগ্রেসের সেই ঐতিহাসিক নাগপুর অধিবেশনে। মুখে বিরোধিতা করবেন বললেও, চিত্তরঞ্জনের মন যেন তখন অসহযোগের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল এ, এটাই ছিল ভক্তের কথা। নাগপুরে এসে গান্ধীর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎকারের পর সকলকে বিস্মিত করে চিত্তরঞ্জন এক রাত্রের মধ্যেই অসহযোগী চিত্তরঞ্জনে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। কারণ শেষ পর্যন্ত তিনিও বুঝলেন যে, দেশ সর্বাংশে প্রস্তুত না হলেও, আন্দোলন শুরু করবার পক্ষে এটাই প্রকৃত সুবর্ণসুযোগ। পাঞ্জাবের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় যেন সেই সুযোগকেই আজ জাতির সামনে এনে দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কংগ্রেসের এই দুই নেতাকে—গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনকে—একমতে নিয়ে আসার ব্যাপারে সেদিন যে মানুষটি আপ্রাণ চেষ্টা করে সফলকাম হয়েছিলেন তিনি হলেন মৌলানা মহম্মদ আলি। প্রকাশ্য অধিবেশনের মাত্র আগের দিন রাত্রে উভয় নেতার মধ্যে এক দীর্ঘ আলোচনার পর বিরোধের মিটমাট হয়ে যায় এবং

চিত্তরঞ্জন নিজেই অসহযোগের মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করে তার স্বপক্ষে একটি যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেছিলেন।

নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ-প্রস্তাবের সমর্থনে চিত্তরঞ্জন যে বক্তৃতাটি করেছিলেন তার একস্থানে তিনি বলেছিলেন: 'I call upon you in the name of all that is holy to carry this resolution with no single dissention vote. Declare to the world that you realise your God-given right to be free—rights exist but they have got to be realised.' ভাবপ্রবণ মানুষ হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবন্ধু যে একজন যুক্তিবাদী ছিলেন এখানে আমরা যেন তাই দেখতে পেলাম।

ভারতের রাজনীতিতে শুরু হলো নতুন যুগ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়।

'এক বছরের মধ্যেই স্বরাজলাভ হবে'—নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীর মুখে এই কথা শুনবার পর সারা ভারতবর্ষে সেদিন যে প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল, তা ছিল যেমন অভূতপূর্ব, তেমনি অকল্পিত। পরিবর্তন দেখা দিল জনচিত্তে। পরিবর্তন দেখা দিল জননেতাদের মনে। যাঁরা ছিলেন এতদিন ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন, তাঁরাই এখন সবস্ব ত্যাগ করে দেশের কাজে নামলেন। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা গান্ধীকে যে দেখল সে-ই মুগ্ধ হলো। হ্যাঁ, এই তো গরীব দেশের যথার্থ নেতা—এই কটিবাস-পরিহিত মানুষটিকে ভারতবাসী জানালো স্বাগতম্—তাদের কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল—মহাত্মা গান্ধী কি জয়! ইতিহাসে যাকে বলে 'এসেছে সে একদিন'—সেই প্রত্যাশিত এক-দিনকে আমরা যেন প্রত্যক্ষ করলাম ১৯২১ সালে, যখন আরম্ভ হয় দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন।

অসহযোগ আন্দোলনের কার্যসূচীর মধ্যে এইগুলি ছিল, যথা—
১. সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকরি ত্যাগ করা; ২. সরকারী দরবার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান না করা; ৩. সরকারের সাহায্য-

প্রাপ্ত স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনা; ৪. আদালত বর্জন করা অর্থাৎ আইন-ব্যবসায় থেকে বিরত থাকা ও ৫. আইনসভার নির্বাচন বর্জন করা। প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল—আদালত, আইনসভা ও স্কুল-কলেজ বর্জন। এই নেতিমূলক কর্মসূচী ব্যতীত ইতিমূলক অর্থাৎ positive কর্মসূচীও কিছু ছিল। তার মধ্যে চরকা কাটা, খদ্দর প্রচার করা ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ করাই ছিল প্রধান। গ্রামে গ্রামে স্বরাজের বার্তা বহন করে নিয়ে যাবার জন্য ছাত্রদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হলো। এইভাবে সেদিন অল্প সময়ের মধ্যে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের সফলতা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়েছিল। কারণ এখানে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন সর্বত্যাগী ও লোককান্ত নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁরই উদাত্ত আহ্বানে বাংলার বিপ্লবীরা পর্যন্ত সেদিন এই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথের যুগ শেষ হলো। আরম্ভ হলো গান্ধী-দেশবন্ধুর যুগ।

সুরেন্দ্রনাথের যুগের নেতারা ছিলেন ইংরেজিভাবাপন্ন, বিলাতি-আদর্শে পরিচালিত, অভিজাত-সম্প্রদায়ে গঠিত. জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সর্বসাধারণের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। অন্যদিকে নতুন যুগের নেতারা সকলেই ছিলেন সর্বত্যাগী, স্বদেশী আদর্শে উদ্বুদ্ধ আর জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের ছিল ঐকান্তিক সহযোগ। কংগ্রেসের অসহযোগ মন্ত্র সেদিন দেশবাসিগণের মধ্যে যে কী নতুন ভাবের তরঙ্গ তুলেছিল, তা আজ এই সুদূরকালের ব্যবধানে আমরা কল্পনা করতে পারব না। সেদিন এই আন্দোলনে দেশবন্ধুর পাশে যতীন্দ্রমোহন একা এসে দাঁড়ান নি, তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাও স্বামীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে মনে-প্রাণে যোগদান করে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে।

সেই বয়সে যৌবনের সতেজ শক্তি নিয়ে দেশবন্ধু আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। নাগপুর থেকে প্রত্যাবর্তন করে কিছু-কাল কলকাতায় কাটিয়ে তারপর দেশবন্ধু ছুটলেন জেলায় জেলায় স্বরাজের বার্তা বহন করে। দেশবন্ধুর জয়ধ্বনিতে বাংলাদেশের আকাশ বাতাস তখন মুখরিত হয়ে উঠেছে। সুভাষচন্দ্রের কথায় 'সেদিন বাংলাদেশে তিনিই ছিলেন সেবা-যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক।' চিত্তরঞ্জন এপ্রিল মাসের গোড়াতেই উত্তরবঙ্গ সফরে বের হলেন। একে একে বগুড়া, মালদহ, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে সফর শেষ করে দেশবন্ধু উপনীত হলেন চট্টগ্রামে। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য যতীন্দ্রমোহন কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম এলেন। দেশবন্ধুর বক্তৃতার ফলে চট্টগ্রামে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মনে কী তুমুল প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তার বিশদ বর্ণনা আছে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায়। তিনি তখন স্থানীয় সরকারী কলেজের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন এবং দেশবন্ধুর আহ্বানে চট্টগ্রামে তিনিই সর্বপ্রথম অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও অধ্যাপনায় ইস্তফা দিয়ে দেশের কাজে যোগদান করেন। কলেজ পরিত্যাগ করে তিনি চট্টগ্রামে সারস্বত বিদ্যালয় নামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

যতীন, তুমি এখন কিছুদিন এখানে থেকেই কাজ কর। চট্টগ্রাম ত্যাগের পূর্বে একদিন দেশবন্ধু যতীন্দ্রমোহনকে এই কথা বললেন।

তাহলে তো প্র্যাকটিস ছাড়তে হয়।

—হ্যাঁ। আপাতত তিন মাসের জন্য তুমি প্র্যাকটিস ছেড়ে দাও।

– বেশ, তাই করব। প্রতিশ্রুতি দিলেন যতীন্দ্রমোহন।

দেশবন্ধুর নির্দেশে তিন মাসের জন্য প্র্যাকটিস বন্ধ করে যতীন্দ্র-মোহন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তখন তিনি ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এক-আধ বছর নয়, দেশবন্ধুর মতোই পুরো

দশটি বছর কঠোর সংগ্রামের পর যতীন্দ্রমোহন এই সময়ে হাইকোর্টে বেশ পসার লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর আয়ের পরিমাণও তখন যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডে তিনি এক হাজার টাকা দান করেছিলেন। ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুতে কংগ্রেসের একটি উন্নত স্তম্ভ যেন ভেঙে পড়ল। মহারাষ্ট্র-কেশরী লোকমান্যের কণ্ঠেই ভারতবাসী সর্বপ্রথম শুনেছিল—'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার।' রাজরোষ, নির্যাতন, নির্বাসন—দেশের জন্য অনেক কিছুই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। গান্ধীর আগে ভারতের জনসাধারণের উপর তিলকের তুল্য প্রভাব আর কোনো নেতাই বিস্তার করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর তিলকের স্মৃতি রক্ষার জন্য 'তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ড' নামে সর্বভারতীয় যে স্মারকনিধি স্থাপিত হয়, তাতে বাংলাদেশ থেকে দশ লক্ষ টাকা অর্থ সংগ্রহ করে দেওয়া হয়েছিল। দেশবন্ধু স্বয়ং এই তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে অপ্রিয় হলেও একটি ঘটনার উল্লেখ করব। দেশবন্ধুর সময়েই বাংলাদেশে একদল স্বার্থান্বেষী লোক দেশপ্রেমের মুখোশ ধারণ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। এঁদেরই কয়েক-জনের উপর এখানকার তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল এবং তাঁরাই এই ফাণ্ডের মোটা টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। এই বিষয়টি যখন দেশবন্ধুর গোচরে আনা হয় তখন তিনি এতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন যে, যতীন্দ্রমোহনকে ক্ষুব্ধচিত্তে এই কথা বলেছিলেন—'ব্যারিস্টারি করার সময়ে অনেক চোর দেখেছি যতীন, কিন্তু কংগ্রেসে এসে দেখলাম এখানকার চোরের মতো চোর আর কোথাও নেই।'

অতঃপর যতীন্দ্রমোহন দেশবন্ধুর কথা অনুসারে তিন মাসের জন্য প্র্যাকটিস বন্ধ করে গঠনমূলক কাজে ব্রতী হলেন। তিনি তিন মাসের জন্য প্র্যাকটিস বন্ধ করেছিলেন বটে, কিন্তু কার্যত প্রায় দুই বৎসরকাল ব্যবসায়ে যোগদান করতে পারেন নি। গঠনমূলক কাজে যোগদান

করবার আগে তিনি নিজেই একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে নিলেন। কংগ্রেস-নির্দিষ্ট ও কংগ্রেসের অভিপ্রেত মূল কার্যসূচীর কাঠামোর মধ্যেই তিনি তাঁর গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা রচনা করলেন। ঠিক করলেন যে, সমাজের নীচুতলার লোকদের সকলের আগে সঙ্ঘবদ্ধ করা দরকার। রাজনৈতিক সংগ্রামকে কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না—এই সত্যটা সেদিন যতীন্দ্রমোহন বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং এইখানেই তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

নীচের তলার লোক বলতে তিনি বুঝতেন মেথর, মুচি, চাষী, কুলি, খানসামা, বাবুর্চি, মজুর, চাকর, গাড়োয়ান, মাঝি-মাল্লা, দারোয়ান, পিয়ন, আরদালি প্রভৃতি এবং তাঁর মনে হয়েছিল যে, এদের যদি ঠিকমতো সঙ্ঘবদ্ধ করা যায় তাহলে তারা একদিকে যেমন তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে সচেতন হবে, অন্যদিকে তেমনি তাদের তাগিদার করে রাজনৈতিক সংগ্রামে জয়লাভ ঘটবে। আমরা যতদূর জানি একমাত্র যতীন্দ্রমোহনের চিন্তা ব্যতীত তখনকার দিনে আর কোনো অসহযোগী নেতার মনে ঠিক এই ধরনের চিন্তার উদয় হয় নি। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল চাষী-মজুরদের সভা। চট্টগ্রামে এ জিনিস ছিল অকল্পিত ও অশ্রুতপূর্ব। জমিদার যাত্রামোহনের পুত্র ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহনের মতো উচ্চতলার ব্যক্তি চাষী-মজুরদের ডেকেছেন শুনে তাদের মধ্যে সে কী উত্তেজনা! তারা দলে দলে এসে সভায় সমবেত হতে থাকে। তাঁর বক্তৃতা শুনে তারা অনুপ্রাণিত হয় এবং সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। ঠিক এইভাবেই গাড়োয়ান দারোয়ান মাঝি-মাল্লা প্রভৃতিদের নিয়ে সভা হয় এবং সেইসব সভায় তাঁর বক্তৃতা শুনে সবাই মেতে উঠতে থাকে। এ মাতন কিন্তু সাময়িক উচ্ছ্বাসের মাতন ছিল না, হুজুগের মাতন ছিল না—তারা সত্যি সত্যিই এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেদিন। যতীন্দ্রমোহনের চেষ্টায় এরা সকলেই রীতিমতো সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

দেখতে দেখতে চট্টগ্রামে গড়ে উঠল মেথর-সমিতি, মজুর-সমিতি প্রভৃতি একাধিক শ্রমিক ইউনিয়ন। যুগপৎ এতগুলি বিভিন্ন সমিতির আবির্ভাবে সেদিন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। আর তখন থেকেই সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় যতীন্দ্রমোহনের উপর।

এই বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ মানুষদের যতীন্দ্রমোহন যে দেশের কাজে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তার প্রধান কারণ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐন্দ্রজালিক শক্তি আর সকলের প্রতি মধুর ব্যবহার। যাত্রামোহন-বাবুর মতো ধনী জমিদারের পুত্র হয়ে এবং নিজেও একজন বড়ো ব্যারিস্টার হয়ে যতীন্দ্রমোহন যে সমাজের নীচের তলার এই মানুষ-গুলির সঙ্গে একাত্মায়তা বোধ করতে পেরেছিলেন এটাই তো তাঁর চরিত্রের মহানুভবতার পরিচায়ক। এইখানে তিনি ছিলেন একেবারে দেশবন্ধুর সগোত্র। ইন্দ্রের মতো যাঁর ঐশ্বর্য ছিল, সেই চিত্তরঞ্জনকেও আমরা দেখেছি ছোটোজাতের মানুষদের সঙ্গে ঠিক এইরকম একাত্মীয়তা বোধ করতে। কয়েদী মথুরই ছিল এর একটা বড়ো দৃষ্টান্ত। নেতৃত্বের এই চরিত্র সেদিনও যেমন, আজো তেমনি খুব সুলভ নয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন চট্টগ্রামে বার্মা অয়েল কোম্পানীর একটা শাখা ছিল। এটি একটি বিখ্যাত বিলাতি কোম্পানী। চট্টগ্রামে বার্মা অয়েলের এজেন্ট তখন ছিল বুলক ব্রাদার্স নামে একটি বিলাতি প্রতিষ্ঠান। একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান বলে বার্মা অয়েল কোম্পানী বছরে বছরে প্রচুর মুনাফা লুঠত, কিন্তু কোম্পানীর লাভের তুলনায় শ্রমিকরা অল্পই বেতন পেত। বছরের পর বছর ধরে তারা মালিকদের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন জানিয়ে এসেছে, কিন্তু তাতে উল্লেখ-যোগ্য ফল হয় নি। হয়ত কোম্পানী কোনো বছর দয়া করে যৎ-সামান্য দিয়েছে, কোনো বছরে হয়ত একেবারেই কিছু দেয় নি।

যতীন্দ্রমোহন যখন নীচের তলার মেহনতী মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে ব্রতী ছিলেন, তখন একদিন চট্টগ্রামে বার্মা অয়েল কোম্পানীর শ্রমিকরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের অবস্থা তাঁকে জানাল। কোম্পানীর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অভিযোগের অন্ত নেই। তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাইল। যতীন্দ্রমোহন সম্মত হলেন।

এরই পরিণতি ছিল 'বার্মা অয়েল লেবার ইউনিয়ন।' যেদিন এক সভায় এই ইউনিয়নটি গঠিত হয়, সেদিন ঐ সভায় কোম্পানীর একজন পদস্থ বাঙালী কর্মচারী সঙ্ঘবদ্ধতার উপকরিতা সম্পর্কে শ্রমিকদের সামনে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। বার্মা অয়েল কোম্পানীর চট্টগ্রাম শাখার ম্যানেজার ছিলেন তখন একজন শ্বেতাঙ্গ ; নাম—মিঃ মার্টিন। লেবার ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে, আর সেই সভায় কোম্পানীরই একজন পদস্থ কর্মচারী বক্তৃতা করেছেন—মিঃ মার্টিনের কাছে এই সংবাদ যেমন অপ্রিয় তেমনি অসহ্য ছিল। সুতরাং সাহেব সেই কর্মচারীটির উপর রীতিমতো ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন : You ought to be dismissed from the service.

—But what is my offence, Sir ?

—You delivered a lecture at that meeting which was organised by Mr. Sen-gupta and for an employee of the Company this is a grave offence. You ought to apologise for your conduct.

—But I have commited no offence. I have spoken nothing against the interest of the Company. So why should I apologise ?

সেই বিদ্রোহী কর্মচারীকে মিঃ মার্টিন তৎক্ষণাৎ কর্মচ্যুত করেন এবং তাঁর প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে তাঁকে অফিস ত্যাগ করতে আদেশ করেন। মুহূর্তমধ্যে এই সংবাদ কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষুব্ধ উত্তেজিত শ্রমিকরা সেইদিনই

সন্ধ্যায় তাদের ইউনিয়নের এক জরুরী সভায় মিলিত হয় ও উদ্ধত ম্যানেজারের আচরণের প্রতিবাদে সকলেই একবাক্যে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরের দিন (১৭ই এপ্রিল, ১৯২১) কেউ আর কাজে যোগদান করল না। বার্মা অয়েল লেবার ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। সমস্ত ব্যাপারটি যখন তাঁর গোচরীভূত হয় এবং যখন শ্রমিক-ধর্মঘট আরম্ভ হয়, তখন এই ধর্মঘটের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও নেতৃত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামে সেই প্রথম শ্রমিক-ধর্মঘট। তাই সেদিন অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমজীবীদেরও দৃষ্টি এই ধর্মঘটের উপর নিবদ্ধ হয়েছিল।

এই ধর্মঘটের ফলে অয়েল কোম্পানীর কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। জাহাজে মাল তুলবার বা মাল নামাবার লোক রইল না। কুলি, মজুর, গাড়োয়ান, দারোয়ান প্রভৃতি কেউই কাজে হাজির হলো না। একটা দারুণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হলো। উত্তেজনার মুখে পাছে শ্রমিকরা অবাঞ্ছিত কোনো কাজ করে বসে সেজন্য যতীন্দ্রমোহন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে সর্বত্র পরিভ্রমণ করতে লাগলেন ও শ্রমিকদের শান্ত ও নিরুপদ্রব থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন। বললেন, তোমরা যদি কোনো হাঙ্গামা করো, তাহলে পুলিশ সুযোগ পাবে ও তোমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ধর্মঘটীরা তাদের সভাপতির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

কিন্তু এর চেয়েও একটা বড়ো সমস্যা ছিল। শ্রমিক ধর্মঘটিগণ যাতে অর্থাভাবে কষ্ট না পায়, সেদিকে যতীন্দ্রমোহনের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাদের রিলিফের জন্য স্থাপিত হলো বার্মা অয়েল লেবার রিলিফ ফাণ্ড নামে একটি ধনভাণ্ডার। এই রিলিফ ফাণ্ডে অর্থ সাহায্যের জন্য সেদিন ইউনিয়নের সভাপতিরূপে যতীন্দ্রমোহন জনসাধারণের কাছে যে আবেদন করেছিলেন তাতে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর টাকা চাঁদা উঠেছিল।

চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস কমিটিও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তাঁরাও এই ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন ও যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাঁর পিতৃবন্ধু গঙ্গাচরণবাবুর পুত্র সতীশচন্দ্র এই ধর্মঘটের সময় যতীন্দ্রমোহনকে সহায়তা করেছিলেন; ধর্মঘট পরিচালনার জন্য অনেকখানি দায়িত্ব তিনি তাঁর সতীশদা'র উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

এই স্মরণীয় ধর্মঘট চলবার সময়কার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। বার্মা অয়েল কোম্পানীর একটি জাহাজ পণ্য ও আরোহী নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হলো। কিন্তু আগের মতো নৌকা বা সাম্পান করে কোনো মাঝি এলো না, মাল বা যাত্রী নিতে। জাহাজের কাপ্তেন তো ব্যাপার দেখে বিস্মিত। জাহাজের আশেপাশে না দেখা যাচ্ছে একটি নৌকা, না একজন মাঝি। শুধু দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' ও 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি, আর 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' ধ্বনি। তীরে সারি সারি শ্রমিকরা দাড়িয়ে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করছে। তখন বন্দরে আগত সেই জাহাজটির খালাসীরা এই দৃশ্য দেখে উত্তেজিত হলো এবং যেইমাত্র তাদের কাছে ধর্মঘটের সংবাদ পৌঁছল অমনি তারা কাপ্তেনের নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করে জাহাজ থেকে খরস্রোতা কর্ণফুলীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে লাগল। চট্টগ্রাম বন্দরের কাজকর্ম সেদিন এইভাবেই অচল হয়ে গিয়েছিল। বন্দরে আগত কোনো জাহাজের মাল খালাস হওয়া বা যাত্রীদের তীরে অবতরণ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

ধর্মঘটের পর দুটি সপ্তাহ কেটে গেল।

কেটে গেল বিনা হাঙ্গামায় ও বিনা উপদ্রবে।

কিন্তু তা হলে কি হয়? আমলাতন্ত্রের টনক নড়ল। ধর্মঘটীদের উৎসাহ বা উদ্যম হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না এবং ধর্মঘটের আশু মীমাংসারও কোনো আভাস পাওয়া গেল না। এমন অবস্থায় আমলাতন্ত্র তাঁদের যা করণীয় তাই করলেন। তাঁরা

যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর এগারজন সহকর্মীর উপর ১৪৪ ধারা জারি করলেন। সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হলো। যতীন্দ্রমোহন বুঝলেন যে, ধর্মঘট ও ধর্মঘটীদের মনোবল ভাঙবার জন্যই এই ব্যবস্থা। কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সেইদিনই (৩রা মে, ১৯২১) যাত্রামোহন হলে যতীন্দ্রমোহন এক বিরাট সভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় শুধু তিনি নন, অন্য যাঁদের উপর ১৪৪ ধারা জারি হয়েছিল তাঁরা সকলেই বক্তৃতা করেন এবং পরের দিন চট্টগ্রামে হরতাল প্রতিপালিত হয়।

শেষ পর্যন্ত বার্মা অয়েল কোম্পানীর ম্যানেজারকে নতি স্বীকার করতে হয় ও ধর্মঘট মীমাংসার জন্য তিনি যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। মীমাংসা-বৈঠক বসেছিল স্থানীয় পৌর-ভবনে ; যতীন্দ্রমোহন তখন এখানকার পৌর-প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের প্রথম নেতৃত্ব সেদিন এইভাবেই সফল হয়েছিল। তিনি এখানকার অধিবাসিগণের হৃদয়ে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রামের 'মুকুটহীন রাজা' এই দুর্লভ সম্মানের গৌরবলাভ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর।

॥ সাত ॥

চট্টগ্রামের এই শ্রমিক ধর্মঘটের মাধ্যমে সেদিন যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বের যে জয়শঙ্খ বেজে উঠেছিল তা সারা ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। বস্তুত এই ১৯২১ সালটি তাঁর জীবনে ও চট্টগ্রামের জীবনে যেমন, ভারতবাসীর জীবনেও তেমনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছরেই আমরা ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী, দেশবন্ধু, মতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতাদের অভ্যুদয় যেমন প্রত্যক্ষ করলাম, তেমনি প্রত্যক্ষ করলাম আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি নতুন অধ্যায় যা ইতিহাসে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন নামে অভিহিত হয়েছে। এক কথায়, সমগ্র দেশই তখন যেন উপনীত হয়েছিল একটা যুগসন্ধি-ক্ষণে। সেই যুগ আর সেই যুগের নায়কবৃন্দের কথা আমরা বর্তমানে বিস্মৃত হয়েছি বললেই হয়। তাই তো জাতির মানসজীবনে আজ এই সর্বাত্মক অবক্ষয়ের অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ত্যাগে, কর্মে, দেশপ্রেমে ও চরিত্রগৌরবে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের নেতৃবৃন্দ যে কতখানি মহান্ ছিলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ হয়ে আছে এবং মহাকালের রূঢ় হস্তাবলেপে সে-ইতিহাস কোনোদিনই মুছে যাবে না। সেই গৌরবময় অতীতকে বর্তমানে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার প্রশ্ন ওঠে না এবং তার প্রয়োজনও নেই। কারণ বিপিনচন্দ্র পালের কথায়, 'No past could be revived just as it was in the past.' কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান বংশধরদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে হলে সেই অতীত থেকেই

আহরণ করতে হবে প্রাণরস। ১৯২১ সাল আজ অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে সত্য, কিন্তু তার ইতিহাসটা তো জীবন্ত হয়েই রয়েছে, আর জীবন্ত হয়ে রয়েছেন সেই ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলি। এঁদের জীবন থেকেই তো আমরা সংগ্রহ করব নবজীবনের পাথেয়, জীবনের আহিতাগ্নি। এই প্রক্রিয়াতেই ঘটে থাকে জীবন থেকে জীবনের উজ্জীবন।

বলেছি, যতীন্দ্রমোহনের জীবনে ১৯২১ সালটি নানা কারণেই স্মরণীয় হয়ে আছে। বার্মা অয়েল লেবার ইউনিয়নের ধর্মঘট মীমাংসার সময় চট্টগ্রামের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটও উপস্থিত ছিলেন এবং যতীন্দ্রমোহন তাঁর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন যে, ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ার পর কোম্পানী একটি কর্মচারীকেও চাকরী থেকে বরখাস্ত করতে পারবে না। সুখের বিষয়, ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে কোম্পানী সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল এবং একটি ধর্মঘটীকেও ছাঁটাই করা হয় নি। এটাও যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বের একটি বিশেষ পরিচায়ক, সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় কথা, এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। অসহযোগ আন্দোলনের যুগটা ছিল হিন্দু-মুসলমান মিলনের যুগ। যুগের এই আদর্শ চট্টগ্রামের এই ধর্মঘটের মধ্যে সুন্দরভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। মুসলমান ধর্মঘটীরা হিন্দু নেতা যতীন্দ্রমোহনের কথায় পরিচালিত হয়ে দুই সপ্তাহকাল সব রকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিল। সেদিন আমরা চট্টগ্রামে হিন্দু ধর্মঘটীদের কণ্ঠে যেমন শুনেছিলাম 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি, তেমনি মুসলমান ধর্মঘটীদের কণ্ঠে শুনেছিলাম 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। গান্ধী বা দেশবন্ধু যেমন ছিলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক, চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহনও তেমনি তাঁর নেতৃত্বের সেই উষাকালে হয়ে উঠেছিলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক।

ধর্মঘটের এই অসামান্য সাফল্য একদিকে যতীন্দ্রমোহনের

ললাটে যেমন নেতৃত্বের জয়তিলক এঁকে দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি তাঁকে সেই সময়ে ইংরেজদের চক্ষুশূল করে তুলেছিল। কলকাতার ইংরেজদের মুখপত্র 'দি স্টেটস্‌ম্যান' তাঁর প্রতি এতদূর বিদ্বিষ্ট হয়েছিল যে, অত্যন্ত অশালীন ভাষায় যতীন্দ্রমোহনের কাজের সমালোচনা করা হয়েছিল এই কুখ্যাত পত্রিকাটির স্তম্ভে। এর সম্পাদক তাঁকে 'The *enfant terrible* of Chittagong' বলে বিদ্রূপ পর্যন্ত করেছিল। এই পত্রিকাই দেশবন্ধু সম্পর্কেও কম অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে নি সেই সময়ে; তাঁকে এর সম্পাদক 'The evil genius of Indian politics' বলে সমালোচনা করেছিল। গান্ধী-যুগের রাজনীতিতে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় পরিচালিত এই সংবাদপত্রটির ভূমিকা সর্বতোভাবেই নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু দেশীয় সংবাদপত্রগুলি, বিশেষ করে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'দি সার্ভেণ্ট' পত্রিকা যতীন্দ্রমোহনের জয়গান সোচ্চারেই করেছিল। এই 'সার্ভেণ্ট' কাগজ তখন নতুন হলেও, প্রচারে ও প্রভাবে শীর্ষস্থানীয় ছিল, কারণ বাংলা-দেশে গান্ধীর অসহযোগের আদর্শ এই কাগজেই সর্বপ্রথম সমর্থিত ও প্রচারিত হয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের সহযোগিতা আর শ্যামসুন্দরের 'সার্ভেণ্ট' কাগজের সমর্থন—এরই ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন সবচেয়ে বেশি সফলতা লাভ করেছিল।

এই 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকায় সেদিন যতীন্দ্রমোহন সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল শ্যামসুন্দরের লেখনী থেকে। সেই বিখ্যাত সম্পাদকীয়টির নাম ছিল 'The Sweepers' King', বা ঝাড়ুদারদের রাজা। অনেকেরই জানা নেই যে, স্বদেশী-যুগে ইংরেজী 'বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকার সম্পাদকীয় গোষ্ঠীর অন্যতম শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর অগ্নিগর্ভ লেখনী থেকে দিনের পর দিন এই ধরনের কত লেখাই না নির্গত হয়ে স্বদেশীর ভাববন্যাকে দু'কূলপ্লাবী করে দিয়েছিল। 'সার্ভেণ্টে' প্রকাশিত এবং শ্যামসুন্দরের অনন্নুকরণীয়

ইংরেজিতে লিখিত যতীন্দ্রমোহন সম্পর্কিত সেই বিখ্যাত সম্পাদকীয়টির বাংলা অনুবাদ আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম।

ঝাড়ুদারদের রাজা

'যতীন্দ্রমোহন প্রকৃতই একজন সাহসী, কর্তব্যনিষ্ঠ ও সৎ প্রকৃতির মানুষ। তিনি কোনো কাজই যেমন-তেমনভাবে সম্পন্ন করেন না। যে কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করেন, তা সুসম্পন্ন না করে নিবৃত্ত হন না। নেতৃত্বের সকল গুণই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। নীরব অনাড়ম্বর ও দৃঢ়চেতা মানুষ তিনি। অন্যায়ের নিকট নতি-স্বীকার না করবার কঠোর সংকল্পই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি মহাত্মা গান্ধীর যোগ্য শিষ্য। অসাধারণ তাঁর সংগঠন শক্তি। তাঁর উপস্থিতির প্রভাব এমনই যে, তার ফলে কখনো উচ্ছৃঙ্খলতার আতিশয্য ঘটতে পারে না। উত্তেজিত জনতাকে তিনি যেভাবে পরিচালিত করেন, তা দেখে মনে হয়, জন-নেতৃত্ব তাঁর সহজাত। বয়সে তরুণ হলেও, জনগণের মনস্তত্ত্ব পাঠে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা আছে। চট্টগ্রামে পুলিশের কর্তার আদেশ অমান্য করে যতীন্দ্রমোহন আদৌ আইন-অমান্যকারিতার পরিচয় দেন নি। বরং যিনি অন্যায়ের প্রতিশোধ দিতে ইচ্ছা করেন না, তিনি আইনের অর্থ যেভাবে গ্রহণ করেন, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তও তা সেভাবে গ্রহণ করেন। তিনি যে পুলিশ সুপারের আদেশ লঙ্ঘন করেছিলেন, এর দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্য জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান এবং এরই বলে তিনি সব রকম অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিলেন ; আক্রমণকারী কে, তা জানবার জন্য তিনি ব্যগ্র হন না।

'শাসনে অনভ্যস্ত জনসাধারণের হৃদয়ের উপর যতীন্দ্রমোহন যে প্রভুত্ব লাভ করেছেন, তাদের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমই তার একমাত্র কারণ। সাধারণ লোক তাদের প্রকৃত বন্ধুকে চিনে নিতে কখনো ভুল করে না। এই কারণেই তো যেসব মানুষ মহাত্মাজীকে কখনো সাক্ষাৎ করে নি অথবা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে চিনতে পারে নি তারাও তাঁর নামে মুগ্ধ হয়ে যায়। যতীন্দ্রমোহন যাদের পক্ষ নিয়েছিলেন তাদের প্রতি নিশ্চয়ই তাঁর ভালবাসা ছিল। নতুবা তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতিকালে তারা যেভাবে সে প্রেমের প্রতিদান দিয়েছে, সেভাবে কখনো প্রতিদান দিত না। যিনি স্বল্প-পরিচয়ে জন-হৃদয়ে এমন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, তিনি তাদের স্বার্থকে কখনো নিজের স্বার্থ

অপেক্ষা ভিন্ন মনে করেন নি। যেসব লোক দুরভিলাষ-প্রণোদিত হয়ে গণ-আন্দোলনের দ্বারা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে তিনি তাদের সগোত্র নন। জনসেবা করতে হলে যে প্রকার সাহস ও বীরত্বের দরকার তাঁর মধ্যে তা বিদ্যমান। যতীন্দ্রমোহন তাঁর স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।'

রাজনীতিতে নবাগত এক তরুণ নেতা এর চেয়ে বেশি প্রশংসা আর কী প্রত্যাশা করতে পারেন? প্রকৃতপক্ষে প্রবীণ অসহযোগী নেতা শ্যামসুন্দরের এই রচনাটিই সেদিন যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন উদারতা সচরাচর দেখা যায় না। এই সম্পাদকীয়টির ছত্রে ছত্রে তরুণ নেতার যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর সাধুতা, মহত্ত্ব, নির্ভীকতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও স্বার্থলেশহীনতার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন ছিল না, যতীন্দ্র-মোহনকে যাঁরা দেখেছেন বা যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই এর সাক্ষ্য দেবেন। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলবার আছে। 'সার্ভেন্ট' কাগজে তাঁর সম্পর্কে এই আন্তরিক জয়গানের সঙ্গে আমরা যদি স্টেটসম্যান পত্রিকার ঐ মন্তব্যটি —'The infant terrible of Chittagong'—স্মরণ করি তাহলে দেখতে পাব যে, সেদিন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভেই যতীন্দ্রমোহন যেন শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায় তথা সরকারের চক্ষে বিশেষ ভীতির কারণস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এই মন্তব্যটিও ছিল তাঁর নেতৃত্বের একটি পরোক্ষ স্বীকৃতি।

সারা দেশে তখন চলেছে অসহযোগ আন্দোলন।

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলা তখন টলমল করছে। সেই আন্দোলনের উদ্বেলিত প্রবাহ যেন সহস্রধারায় নগর জনপদ ও পল্লীগ্রামের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। স্বদেশী আন্দোলনের পর দেশ মূর্চ্ছাহত হয়ে দীর্ঘকাল কাটিয়েছে; বাঙালির স্তিমিত প্রাণে নতুন আশার জোয়ার

এনে দিয়েছিল এই আন্দোলন। আসামের চা-বাগানে পর্যন্ত সেই আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছিল। আসামের চা-বাগান চিরকালই নিষিদ্ধ অঞ্চল। কুলিরা এখানে ক্রীতদাসের মতো জীবনযাপন করত। শতবর্ষ পূর্বে আসামের চা-বাগানে কুলিদের জীবন কী দুর্বিসহ ছিল, কত রকম অত্যাচার আর লাঞ্ছনা তাদের মুখ বুঁজে সহ্য করতে হতো আর কুলি-রমণীদের উপর বাগানের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কী জঘন্য নিগ্রহ করতেন, বাইরের লোকদের তা জানবার উপায় ছিল না। কারণ বাইরের লোকের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। কুলিদের বেতনও ছিল যৎসামান্য, দেনায় তাদের মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে থাকত। তাই চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও বাগান থেকে কুলিদের ফিরে আসা অসম্ভব ছিল।*

এই ভয়াবহ নিষিদ্ধ অঞ্চলে ক্রীতদাসের তুল্য জীবনযাপনে অভ্যস্ত অসহায় মানুষগুলির মধ্যে কংগ্রেসের কর্মীরা যখন অসহযোগের বার্তা পৌঁছে দিল, তখন তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল এক নতুন জীবনের স্পন্দন। যারা এতকাল নির্যাতিত লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে, বঞ্চিত হয়েছে মনুষ্যত্বের অধিকারে, ঋণভারে দুর্বহ ছিল যাদের অভিশপ্ত-জীবন, আসামের চা-বাগানেব সেই কুলিদের মধ্যে অসহযোগী কর্মীরা যখন মুক্তি-মন্ত্র প্রচার করল, তখন কুলি-সমাজে দেখা দিয়েছিল এক নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্য। এরই পরিণতি ছিল ইতিহাস-বিখ্যাত চা-বাগানের কুলি-ধর্মঘট এবং এই ধর্মঘটে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন। শুধু আসামে নয়, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলেও বহু চা-বাগান আছে; সেখানেও হাজার হাজার কুলি কাজ করত। আসামের চা-বাগানের কুলিদের মতো এইসব বাগানের কুলিরাও অভিশপ্ত জীবনভার বহন করতে বাধ্য হতো। অসহযোগের বার্তা

* চা-বাগানের কুলি-জীবনের মর্মন্তুদ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের *Slavery in British Dominion* নামক বইটিতে; এটি অতি সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত হয়েছে।

এসব অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পটভূমিকাতেই ঘটেছিল চাঁদপুরে চা-বাগানের বিখ্যাত কুলি-ধর্মঘট।

ভারতের দিকে দিকে তখন জনজাগরণ। অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা খরবেগে ছুটে চলেছে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। নতুন চেতনমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে চা-বাগানের কুলিরা—তারা আর এমন হেয়, ঘৃণ্য ক্রীতদাসের জীবনযাপন করবে না। তারা দেশে ফিরে যাবে, দেশে ফিরে গিয়ে যা হয় করবে, না খেয়ে মরবে তাও ভালো, তবু তারা বাগানের শ্বেতাঙ্গ মালিকদের ক্রীতদাস হয়ে আর থাকবে না। এই শপথ নিয়ে একদিন সহসা করিমগঞ্জ ও শ্রীহট্ট থেকে কুলিরা দলে দলে পায়ে হেঁটে চাঁদপুর স্টেশনে এসে হাজির হলো। সেখান থেকে তারা দেশে ফিরে যাবে—এই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তখন চা-বাগানের ইংরেজ মালিকরা আসাম-বেঙ্গল রেল কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করল তাঁরা যেন কিছুতেই কুলিদের টিকিট না দেন। অন্যদিকে দালালরা এসে কুলিদের অনুনয়-বিনয় করতে থাকে ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু অসহযোগ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ কুলিরা তাদের সংকল্পে অটল রইল। চাঁদপুর রেল স্টেশনের উন্মুক্ত স্থানেই তারা অবস্থান করতে লাগল।

দেশবন্ধু তখন উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন। এমন সময়ে তিনি কুমিল্লার খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ও জননেতা অখিলচন্দ্র দত্তের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেলেন: 'করিমগঞ্জ-শ্রীহট্টের চা-বাগানের কুলিরা ধর্মঘট করেছে ও হাজার-হাজার কুলি চাঁদপুর স্টেশনে অপেক্ষা করছে। তাদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে না বলে তারা দেশে ফিরে যেতে পারছে না। অবস্থা বিস্ফোরকের তুল্য হয়ে উঠেছে। আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন।' এর আগে করিমগঞ্জ কংগ্রেস-কমিটি ও অখিলচন্দ্র দত্ত চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহনকে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সেই 'তার' পেয়ে তিনি করিমগঞ্জে উপস্থিত হলেন। কুলিদের মুখ থেকে শুনলেন তাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী। তিনি তৎক্ষণাৎ আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের এজেণ্ট ও ট্রাফিক ম্যানেজারের কাছে জরুরী 'তার' প্রেরণ

করলেন। এর ফলে করিমগঞ্জের স্টেশনমাস্টার কুলিদের টিকিট বিক্রয় করতে আদিষ্ট হন ও তারা চাঁদপুরে এসে জমায়েত হয়। কিন্তু চাঁদপুর থেকে তাদের আর টিকিট দেওয়া হয় নি। রেলপথ, জলপথ সবই কুলিদের পক্ষে বন্ধ হয়ে গেছে; সর্বত্র পুলিশের কঠোর পাহারা। অনাবৃত স্টেশন-প্রাঙ্গণে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কুলিরা দিনের পর দিন অবস্থান করতে লাগল।

দেশবন্ধুকে যতীন্দ্রমোহনও একটা তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন কুলিদের অবস্থা সম্পর্কে। ১৯২১ সালে মে মাসের শেষভাগে চাঁদপুরে কুলি-ধর্মঘটের সংবাদ তখন চারদিকেই ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশবন্ধু এলেন সেখানে, কলকাতা থেকে ছুটে এলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ। এলেন যতীন্দ্রমোহন। চাঁদপুরের দেশ-বিখ্যাত নেতা হরদয়াল নাগ তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। চাঁদপুরে একটি রাত্রির ঘটনা এখানে বিশেষ-ভাবেই উল্লেখ্য। চাঁদপুব রেলস্টেশনের উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করছে হাজার হাজার কুলি তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতিকে নিয়ে। গভীর রাত্রে সহসা স্টেশনের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। কুলিরা রাত্রে সবাই নিদ্রিত; মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে তার শিশুসন্তান; স্বামীর পাশে ঘুমিয়ে আছে তার স্ত্রী। চারদিক নিস্তব্ধ। এমন সময় একদল গুর্খা সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে নিদ্রিত কুলি নর-নারীদের উপর। তাদের আর্তনাদে ভরে উঠল নৈশ-গগন। সে দৃশ্য অবর্ণনীয়। এই মর্মন্তুদ ঘটনার সংবাদ পেয়েই দেশবন্ধু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ চাঁদপুরে ছুটে এসেছিলেন। চাঁদপুরেব ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২১-এর ১৯শে মে রাত্রিবেলায়। যতীন্দ্রমোহন এসেই কুলিদের জন্য কিছু রিলিফের ব্যবস্থা করেন।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের সীমানা ছিল চট্টগ্রাম থেকে আসামের তিনসুকিয়া, আর তিনসুনিয়া থেকে এদিকে গৌহাটি পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব-ভারতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ, এবং এটি একটি বিলাতি কোম্পানী ছিল। এর কর্মচারী সংখ্যাও বড়ো কম ছিল না। কিন্তু

তাদের মধ্যে দেশীয় কর্মচারীদের বেতন ছিল সামান্যই। বেতন যেমন সামান্য ছিল, তেমনি তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থাও ছিল অসন্তোষজনক। এইসব কারণে এই রেলপথের দেশীয় কর্মচারীদের মধ্যে ক্রমেই গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হতে থাকে।

এই অসন্তোষেরই পরিণতি ছিল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই রেলপথের ভারতীয় কর্মচারীদের ধর্মঘট। অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাকালে এদের অভাব-অভিযোগের প্রতি যতীন্দ্রমোহনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং প্রধানত তাঁরই প্রচেষ্টায় গঠিত হয় 'আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ইউনিয়ন' নামে দেশীয় কর্মচারীদের একটি সমিতি। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন এর সভাপতি। কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা ও তার প্রতিকারের জন্য বিধিসঙ্গতভাবে দাবী করা, এই উদ্দেশ্য নিয়েই বিশুদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতেই সমিতিটি স্থাপিত হয়েছিল। নবগঠিত এই শ্রমিক-সমিতি এর সূচনা কাল থেকে যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছিল। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সংঘর্ষের কোনো প্রশ্ন তখনো পর্যন্ত দেখা দেয় নি।

কিন্তু সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল চাঁদপুরের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। কুলিদের উপর যে জঘন্য অত্যাচার হয়েছিল, সেই সংবাদ যখন চট্টগ্রাম থেকে তিনসুকিয়া ও তিনসুকিয়া থেকে গৌহাটি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তখন আসাম-বেঙ্গল রেলের দেশীয় কর্মচারীবৃন্দ কুলিদের প্রতি সহানুভূতি জানাবার উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। তাদের নিজেদের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে চাঁদপুরের ঘটনা যখন মিলিত হলো তখনি ঘটল এই অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণ। ১৯২১ সালের ২৪শে মে থেকে রেলের চাকা অচল হয়ে গেল—আসাম-বেঙ্গল রেলপথের সর্বত্রই ধর্মঘট ঘোষিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বার্মা অয়েল লেবার ইউনিয়নের কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময় উক্ত ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে যতীন্দ্রমোহন নিজে যেমন তার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এই ক্ষেত্রেও তিনি ঠিক তাই-ই করলেন।

রেল-কর্মচারীদের ধর্মঘটের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এক্ষেত্রেও তিনি অনন্যসাধারণ নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এই ধর্মঘটকে উপলক্ষ্য করেই সেদিন সারা ভারতবর্ষে তাঁর নেতৃত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

নানা দিক দিয়ে এই রেল-ধর্মঘট উল্লেখ্য ছিল। বিলাতি কোম্পানী বার্মা অয়েল যেমন যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে শক্তির পরিচয় পেয়েছিল, তেমনি বিলাতি আসাম-বেঙ্গল রেল কোম্পানীও এইবার তাঁর সেই শক্তির দাপট অনুভব করেছিল। দ্বিতীয়ত, এই ধর্মঘট বিনা আয়োজন ও বিনা প্রচারে সংঘঠিত হয়েছিল—কোনো সাংগঠনিক প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই সহসা বিদ্যুৎগতিতে এই ধর্মঘট কর্তৃপক্ষকে বিস্মিত ও হতচকিত করে দিয়েছিল সেদিন। ভারতে রেল-ধর্মঘটের ইতিহাসে আসাম-বেঙ্গল রেলপথের এই ধর্মঘট স্মরণীয় হয়ে আছে এই কারণে যে, এদেশে এটাই ছিল সেদিন Lightning Strike বা বিদ্যুৎ-গতিতে সংঘটিত ধর্মঘট।

চট্টগ্রামের পাহাড়তলী।

এইখানেই এ. বি. রেলওয়ের সদর-দপ্তর। এইখানেই রেল-কর্মচারী সমিতিরও সদর-দপ্তর ছিল। সেই সদর-দপ্তর থেকে ঘোষিত হয়েছিল এই ধর্মঘট। অন্য ধর্মঘটীদের প্রতি নির্যাতনের সহানুভূতিতে ভারতবর্ষে সেই প্রথম ধর্মঘট। আবার জাতীয়তার প্রেরণায় অনু-প্রাণিত হয়ে অমন বৃহৎ ও ব্যাপক ধর্মঘটও ভারতবর্ষে সেই প্রথম। এই ধর্মঘট যখন ঘোষিত হয়, যতীন্দ্রমোহন তখন চাঁদপুরে ; সেইখানে তিনি হরদয়াল নাগের সঙ্গে কুলি-ধর্মঘটের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে লোক গিয়েছিল তাঁকে নিয়ে আসার জন্য। যাত্রীবাহী ট্রেনগুলির চলাচল তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে ; তাঁকে আসতে হলো একটি মালগাড়িতে চড়ে। এই রেল-ধর্মঘট যখন আরম্ভ হয় তখন এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কুলিদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন। এই দুর্ব্যবহার, সমিতির মতে, রেল-কর্তৃপক্ষ

করেছিলেন। কারণ কোম্পানী কুলিদের টিকিট বিক্রী করা বন্ধ করে দিয়েছিল আর যারা টিকিট পেয়েছিল তাদের জাহাজে উঠতে দেয় নি। এই কারণেই রেল-কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। তাদের বিবেচনায় সরকারের সঙ্গে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা করার ফলেই চাঁদপুর স্টেশনে ঐ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। অতএব এর তীব্র প্রতিবাদ করার জন্যই সেদিন এই রেলপথে আচমকা ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল।

প্রতিবাদ জানাবার জন্য যার সূচনা, পরবর্তী স্তরে সেই ধর্মঘট অন্য রূপ ধারণ করেছিল। এইবার শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দাবী সোচ্চার হয়ে উঠল—নানাবিধ অভাব-অভিযোগ পূরণের দাবী। একটি সম্পূর্ণ রেলপথে ধর্মঘট তখনকার দিনে একরকম অকল্পিত ছিল বললেই হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন চট্টগ্রামের রেল-শ্রমিকদের এই ধর্মঘটকে যেদিন পরোক্ষভাবে খুবই সহায়তা করেছিল। তার উপর স্থানীয় কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্রমোহন যখন সমিতির সভাপতিরূপে এই সংগঠন ও ধর্মঘট পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব নিজের মাথায় নিলেন তখন স্বভাবতই জনসাধারণের চক্ষে এটা একটা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। বাংলা তথা সমগ্র ভারতের দৃষ্টি তখন আসাম-বেঙ্গল রেল-কর্মচারী সমিতি ও তাদের ঘোষিত এই ধর্মঘটের উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল আরো একজনের উপর। তিনি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

রেলের সাধারণ কর্মচারীদের হৃদয়েও মানবতা বোধ জেগেছে এবং তারাও যে অসহায় ও নিপীড়িত কুলিদের প্রতি নির্যাতনের প্রতিবাদ-স্বরূপ এমন ব্যাপক ধর্মঘটের আয়োজন করতে পারে এই জিনিসটাই সেদিন যতীন্দ্রমোহনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শের নৈতিক প্রভাব ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেশের মেহনতী মানুষের মনেও সাড়া জাগিয়েছে, এনে দিয়েছে তাদের প্রাণে এক নতুন উত্তেজনা, নতুন চেতনা, বার্মা অয়েল

লেবার ইউনিয়নের ধর্মঘট, চাঁদপুরে চা-বাগানের কুলিদের ধর্মঘট ও আসাম-বেঙ্গল রেলের কর্মচারীদের ধর্মঘট—স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত এই তিনটি ধর্মঘটে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন। শুধু প্রত্যক্ষ করা নয়, এই তিনটি ধর্মঘটের মধ্যে দু'টির সঙ্গে তিনি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং শেষেরটি পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁকে ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্ব-শক্তির একটা বিশেষ পরিচায়ক ছিল এই স্মরণীয় রেল-ধর্মঘট। যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্ব-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পেতে হলে এই ধর্মঘটের আনুপূর্বিক ইতিহাসটা জানতে হয়। সাফল্যমণ্ডিত এই দুটি ধর্মঘটের ফলেই তো সেদিন বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে প্রদীপ্ত ভাবে ফুটে উঠেছিল এই চট্টগ্রাম। ধন্য চট্টল—এই রব সেদিন দেশের সর্বত্র শোনা গিয়েছিল। কর্ণফুলীর তরঙ্গে তরঙ্গে সেদিন ঘোষিত হয়েছিল চট্টগ্রামের মহিমা, আর যতীন্দ্রমোহনের জয়ধ্বনি।

'রেল-কর্মচারীদের এই মানবতা আর তাদের দেশপ্রেমের প্রেরণাকে আমি আমার অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি। তাদের সাহায্যের জন্য আমি যথাসর্বস্ব পণ করলাম। যদি এই আরব্ধ ধর্মঘটের নেতৃত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ দোষের হয়, যদি একে সফল করে তোলার জন্য আমার প্রচেষ্টা সরকারের চক্ষে নিন্দনীয় হয় বা দেশবৈরিতা বলে গণ্য হয়, আমি তাতে বিন্দুমাত্র পশ্চাদপদ হব না।'

চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রামে ফিরে এসে ধর্মঘটের নেতৃত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে তেজোদৃপ্ত এই উক্তি করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন। উনিশশো একুশের চব্বিশে মে সমগ্র আসাম-বেঙ্গল রেলপথে ধর্মঘট ঘোষিত হলো। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বিনা প্রস্তুতিতে ও আকস্মিকভাবেই সংঘটিত হয়েছিল এই স্মরণীয় ধর্মঘট। ধর্মঘট শুধু রেল-কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ক্রমে ইহা স্টীমার কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ইণ্ডিয়া জেনারেল রিভার স্টীম নেভিগেশন (I.G.R.S.N.)

কোম্পানীর স্টীমারগুলি চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও গোয়ালন্দের মধ্যে যাওয়া-আসা করত। রেলের সঙ্গে স্টীমার-সার্ভিসের সংযোগ ছিল। অর্থাৎ ইহা রেল-সার্ভিসেরই পরিপূবক ছিল। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের মতো এই স্টীম নেভিগেশন সংগঠনটিও ছিল একটি বিলাতি কোম্পানী। এখানেও ধর্মঘট এই প্রথম। স্টীমারের খালাসী, সারেঙ প্রভৃতি সবাই এই ধর্মঘটে যোগদান করল। রেলপথ ও জলপথে সম্মিলিত এই ধর্মঘটের ফলে সমগ্র আসাম ও পূর্ববঙ্গের যাতায়াত-ব্যবস্থা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

চাঁদপুরে চা-বাগানের কুলিদের ধমঘট।

পাহাড়তলীতে রেল-কমচারীদেব ধমঘট।

গোয়ালন্দের স্টীমার-কর্মচারীদের ধমঘট।

দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনেব পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় যুগপৎ সংঘটিত এই তিনটি ধর্মঘটেব সেদিন যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। কারণ দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, হরদয়াল নাগ, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এই ধর্মঘট তিনটিব পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহনেব আহ্বানে হতভাগ্য কুলিদেব অবস্থা চাক্ষুষ করতে দেশবন্ধু স্বয়ং যখন চাঁদপুরে এলেন তখন রেলপথ ও জলপথ দুই-ই অচল হয়ে গিয়েছে। সেই অবস্থায় তিনি নৌকাযোগে উত্তাল মেঘনা অতিক্রম করে চাঁদপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী, দেশজননী বাসন্তী দেবী। প্রত্যক্ষভাবে এই তিনটি ধর্মঘটের পিছনে কংগ্রেসের বিশেষ সমর্থন ছিল। চাঁদপুরে কুলিদের ধমঘটে তো বিশেষভাবেই ছিল। কারণ চাঁদপুর কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে সেই সময়ে এদেব বিশেষভাবেই সাহায্যদান করা হয়েছিল, এবং কংগ্রেসের প্রদত্ত অর্থেই এরা স্বদেশে ফিরে যেতে পেরেছিল।

প্রায় পঁচিশ হাজার রেল-শ্রমিক ও কর্মচারী ধর্মঘটে যোগদান করেছিল। চট্টগ্রাম থেকে তিনসুকিয়া আর ওদিকে গৌহাটি পর্যন্ত বিস্তৃত এই রেলপথে এত বড়ো ও এমন সংঘবদ্ধ ধর্মঘট শুধু রেল-

কর্তৃপক্ষকে নয়, সরকারকেও রীতিমতো বিচলিত করেছিল সেদিন। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অভ্যুদয়ে জাতির জীবনে তখন জাতীয়তার যে ভাবধারা প্রবাহিত হচ্ছিল তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন আমরা যেন লক্ষ্য করেছিলাম এই রেল-ধর্মঘটের মধ্যে। সঙ্ঘবদ্ধতার ভাবটা তখনো আমাদের সমাজজীবনে অথবা জাতীয়-জীবনে দানা বেঁধে ওঠে নি, সুতরাং উনিশশো একুশ সালের এই ব্যাপক রেল-শ্রমিক ধর্মঘট নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব ব্যাপার ছিল।

আর এই ধর্মঘটকে আশ্রয় করে সেদিন যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্ব-শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছিল। তিনি নিজে অহিংস-অসহযোগী ছিলেন বলেই না, তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এই ব্যাপক ও দীর্ঘকালস্থায়ী ধর্মঘটের সময়ে কোথাও তেমন কোনো উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব দেখা যায় নি অথবা বিশেষ কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা কোথাও ঘটে নি। একশো-দু'শো বা একহাজার-দু'হাজার নয়, একেবারে পঁচিশ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রবভাবে সংগঠিত হওয়া বড়ো কম কথা ছিল না। এই পঁচিশ হাজার ধর্মঘটীকে বিক্ষোভ ও উত্তেজনার পথ থেকে শান্তির পথে, সংযমের পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে যতীন্দ্রমোহন তাঁর নেতৃত্বের যে পরিচয় দেশবাসীর সামনে রেখেছিলেন তাই-ই তাঁকে একজন কংগ্রেস নেতারূপে সর্বভারতীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

তথাপি এই শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট ভাঙবার জন্য সরকারের সঙ্গে যোগ-সাজসে রেল-কর্তৃপক্ষ যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তা সর্বতোভাবেই নিন্দনীয় ছিল। ধর্মঘটী কর্মচারী ও শ্রমিকদের শুধু যে তাদের বাসস্থান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তা নয়, তাদের কাউকেই নিজ নিজ আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে দেওয়া হয় নি। নির্যাতন ও নিপীড়নে যখন কোনো ফল হলো না, ধর্মঘটীদের অটুট মনোবল শিথিল হওয়ার কোনো লক্ষণই যখন পরিদৃষ্ট হলো না, তখন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলেন প্রলোভন প্রদর্শনের পথ, আর সেই সঙ্গে

চলতে থাকে নানাবিধ intimidation বা ভীতি-প্রদর্শনের ব্যবস্থা। তাতেও কিছু হলো না। ধর্মঘট পূর্ণোদ্যমেই এবং নিরুপদ্রবভাবে চলতে থাকে।

তখন ধর্মঘট অবসানের জন্য এগিয়ে এলেন স্থানীয় বণিক-সভা। কারণ এই ব্যাপক ধর্মঘটের ফলে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল ও কারবারী লোকদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলো। বণিক-সভার প্রতিনিধিরা এসে রেল-কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ এজেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ও ধর্মঘটের আশু মীমাংসার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু বণিক-সভার অনুরোধে তিনি কর্ণপাত করলেন না। যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর সহকর্মিগণ বুঝলেন যে, এই ধর্মঘট স্থায়ী হবে। সুতরাং এই ধর্মঘটীদের এখন কোনো গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করাই সমীচীন। অসহযোগের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল চরকা ও তাঁত। যতীন্দ্রমোহন চিন্তা করলেন, চিন্তা করে উপায় উদ্ভাবন করলেন এবং উপায় উদ্ভাবন করে কর্মে প্রবৃত্ত হলেন। যাত্রামোহন সেন ইনস্টিটিউটের বিরাট বাড়িটা তখন খালি পড়ে ছিল। সেইখানেই তিনি কয়েক শত চরকা ও তাঁত বসালেন। শত শত ধর্মঘটী চরকা কাটতে লাগল, তাঁত চালাতে লাগল। তাদের দৃষ্টান্ত অন্যদের অনুপ্রাণিত করল এবং শহরের অন্যত্রও এই গঠনমূলক কাজের প্রসার হতে লাগল। চট্টগ্রামে সে এক বিচিত্র দৃশ্য—চরকার ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে তাঁতের আওয়াজ মিলে অসহযোগের বাণীকে যেন জীবন্ত করে তুলল।

ধর্মঘট চালাতে গেলে টাকার দরকার হয়—হাজার হাজার টাকার। পঁচিশ হাজার মানুষ যেখানে ধর্মঘট করেছে সেখানে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এজন্য গোড়া থেকেই যতীন্দ্রমোহন 'দি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে এমপ্লয়িজ স্ট্রাইক ফাণ্ড' নামে একটি তহবিল গড়ে তুলেছিলেন। এই তহবিলে জেলা কংগ্রেস এবং চট্টগ্রামের জনসাধারণ প্রচুর অর্থসাহায্য

করেছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে তিনসুকিয়া—সর্বত্রই অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ধর্মঘটীদের প্রয়োজনের তুলনায় প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ সামান্যই ছিল। যা সংগৃহীত হয়েছিল তা ধর্মঘটীদের অনশন নিবারণে অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলে তাদের খুব কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। চরকা কেটে ও তাঁত চালিয়ে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেত তাও যথেষ্ট ছিল না। এভাবে ধর্মঘট আর কতদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ? যতীন্দ্রমোহন উদ্বিগ্ন হলেন। বুঝলেন যে. অবিলম্বে অর্থের ব্যবস্থা করতে না পারলে এই বিরাট ধর্মঘট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা একপ্রকার অসম্ভব।

উপায় ?

পঁচিশ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারীর ধর্মঘট চালাবার মতো টাকা কোথা থেকে আসবে ? ধর্মঘটীদের মধ্যে আবার অনেকে চিরকালের মতো চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এসেছেন জাতীয়তার প্রেরণায়। তখন চট্টগ্রামে যাঁরা যাত্রামোহনের বাড়ি দেখেছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, তখন ঐ বাড়িতে ধর্মঘটীদের কিরকম ভীড় হতো। সপ্তাহে দু'টি নির্ধারিত দিনে তারা এখানে আসত অর্থসাহায্য লাভের জন্য, আর যতীন্দ্রমোহন যোগাতেন সেই অর্থ নিজের পকেট থেকে। কথিত আছে যে, এই সময়ে তিনি একদিন তাঁর এক সহকর্মীকে বলেছিলেন, 'যদি কুবেরের ভাণ্ডার পেতাম তাহলে স্ট্রাইকারদের মনের সুখে সাহায্য করতে পারতাম।' কিন্তু তথাপি এই যে সপ্তাহে দু'দিন করে তিনি টাকা দিতেন, অনেকে ভাবত, কোথা থেকে তিনি এত টাকা সংগ্রহ করতেন ? কিন্তু অনেকেরই জানা ছিল না যে, এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব গ্রহণ করা তাঁর কাছে শুধু কথার কথা ছিল না। এজন্য তিনি তাঁর সর্বস্ব পণ করতেও পশ্চাদপদ ছিলেন না।

করেছিলেনও ঠিক তাই।

প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা দেনা করে তিনি রেল-শ্রমিকদের এই সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালিয়েছিলেন। তাঁর চোখে ধর্মঘট তখন জাতীয়

সংগ্রামের গুরুত্ব নিয়ে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল এবং এজন্য কোনো ত্যাগ স্বীকারকেই তিনি যথেষ্ট বলে বিবেচনা করতেন না। আর তা করতেন না বলেই সকলের অজ্ঞাতসারে চট্টগ্রাম শহরে তাঁর নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে বাঁধা দিয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই ঋণের পরিমাণ ছিল চল্লিশ হাজার টাকা। ভারতবর্ষে ধর্মঘটের ইতিহাসে কোনো ইউনিয়নের সভাপতি কখনো দেনা করে ধর্মঘট চালিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। এক্ষেত্রে যতীন্দ্রমোহন সত্যিই একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, বলতে হবে। দুঃখের বিষয়, একালের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ঠিক এর বিপরীত আচরণ করে থাকেন। অহিংস-অসহযোগ আদর্শের এমন বাস্তব প্রতিফলন সেকালে আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় নি। সম্ভবত এই কারণেই দীর্ঘকালস্থায়ী এই ধর্মঘট সর্বভারতীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল সেদিন। স্বয়ং গান্ধী পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহন-পরিচালিত এই অভূতপূর্ব ধর্মঘটের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর এটাই ছিল তাঁর ত্যাগের চরম স্বীকৃতি ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

দেখতে দেখতে ধর্মঘটের এক মাস অতিক্রান্ত হলো।

রেল লাইনের উপর ঘাস গজিয়ে গেল।

ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে নীরবতা। স্টেশনগুলি সব জনমানবশূন্য।

এইবার এগিয়ে এলেন শাসকপক্ষ রেল-কোম্পানীকে সাহায্য করতে। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুসারে পুলিশের বড়কর্তা জারি করলেন ১৪৪ ধারা; ২৪শে জুন থেকে এক মাসকাল চট্টগ্রাম শহরে সমস্ত প্রকার সভা বা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। যতীন্দ্রমোহন কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। কারণ তখনো পর্যন্ত কংগ্রেসের কর্মসূচীর মধ্যে আইন-অমান্য আন্দোলন গৃহীত হয় নি। এমন কি স্বয়ং গান্ধী পর্যন্ত আইন-অমান্য অন্দোলনে অগ্রসর হন নি। এর আগে বি. ও. সি.-র ধর্মঘটের সময়ে যতীন্দ্রমোহনকে আমরা ১৪৪ ধারা অমান্য করতে দেখেছি, কিন্তু কংগ্রেসের সুস্পষ্ট

নির্দেশের অভাবে পুনরায় সেই কাজ করা তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না। চির-নির্ভীক যতীন্দ্রমোহন যখনি প্রয়োজন বুঝেছেন তখনি তিনি দেশের স্বার্থে আমলাতন্ত্রের আদেশ অমান্য করতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এর বহু নিদর্শন আছে।

সবদিক বিবেচনা করে যতীন্দ্রমোহন তাঁর সহকর্মিগণের সঙ্গে পরামর্শ করে ধর্মঘটীদের বৃহত্তর স্বার্থে সরকারী আদেশ অমান্য করতে বিরত থাকলেন। কিন্তু আদেশ জারি হওয়ার এক সপ্তাহ অতিক্রম হওয়ার আগেই এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে তিনি বাধ্য হলেন। সেই ঘটনাটি এই: আগেই বলেছি ধর্মঘট ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেল-কর্তৃপক্ষ তাঁদের কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন; উপরন্তু তাদের নিত্যকার প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আটক করে রাখেন। এইসব আটক দ্রব্য উদ্ধার করার জন্য চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে নয় জন কংগ্রেস-কর্মী প্রেরিত হয়। তাঁরা পাহাড়তলীতে পৌঁছান মাত্রই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র যতীন্দ্রমোহন পুলিশের বড়কর্তার আদেশ লঙ্ঘন করে শহরে একটি শোভাযাত্রা বের করলেন ধর্মঘটীদের নিয়ে। সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন তিনি স্বয়ং। শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল সকালে। শহর পরিভ্রমণ করে শোভাযাত্রীদল যখন একটি স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের কাছাকাছি পৌঁছল তখন একদল গুর্খা সৈন্য নিয়ে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট শোভাযাত্রাকারীদের গতিরোধ করলেন।

শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ও মহিমচন্দ্র দাস, আর তাঁদের পিছনে বিপুল জনতা। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সঙ্গে কথা বললেন,—বললেন, এই শোভাযাত্রা যে বে-আইনী আপনি তা জানেন? যতীন্দ্রমোহন বৃথা তর্কে প্রবৃত্ত হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তখন শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করার আদেশ দিলেন। তিনি সে আদেশ মানলেন না। তখন তাঁর সহকর্মীসহ যতীন্দ্রমোহনকে

গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বিচার। কারাগার থেকে কোর্ট—সর্বত্রই এক বিপুল বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে অনুসরণ করেছিল সেদিন। আদালত-প্রাঙ্গণে সে কী জনসমাবেশ—কাতারে কাতারে এসে সমবেত হয়েছে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান। কারণ সকলেরই তিনি প্রিয় নেতা। জনতার কণ্ঠে উঠছে অবিরাম জয়ধ্বনি; সেই সঙ্গে হাজার কণ্ঠে উঠছে 'বন্দে মাতরম্।' সে-দৃশ্য অবর্ণনীয়। কলকাতা থেকে দেশবন্ধু তারের পর তার পাঠাচ্ছেন। তাঁরই উপদেশে যতীন্দ্রমোহন ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তিলাভ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

॥ আট ॥

'গত তিন-চার মাস যাবৎ আমি যেসব বক্তৃতা দিয়েছি, সেগুলির প্রত্যেকটিতে আমি এই কথাই বলেছি যে, অহিংস-নীতির সাফল্যের উপরেই আমাদের বর্তমান অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। আমি কখনো কোনো জনতাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বা উত্তেজনার পথ গ্রহণ করতে প্ররোচনা দিই নি। চট্টগ্রামের জনসাধারণ আমাকে ভালবাসেন বলে তাঁরা আমার এই নির্দেশ অনুসরণ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। এই কারণেই বি. ও. সি. ধর্মঘটের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এখানে কোনো উপদ্রবই সংঘটিত হয় নি—উত্তেজনার কারণ থাকলেও ধর্মঘটীরা কোনোরকম উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয় গ্রহণ করে নি। অথচ এর ফলস্বরূপ আমার সহকর্মিগণ ও আমার উপর বার বার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এইপ্রকার নিষেধাজ্ঞা অন্যায় ও অসঙ্গত। যাইহোক, আমি আপাতত এই আদেশ গ্রহণ করছি। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকাকালীন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যদি অন্যরূপ আদেশ করেন, তবে আমি তৎক্ষণাৎ কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করব।'

ধর্মঘটের তৃতীয় মাসে যখন যতীন্দ্রমোহনের উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি হয় তখন চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেটকে তিনি এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।

যে ঘটনাকে উপলক্ষ করে এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয় সেটি ছিল

এই। চট্টগ্রাম শহর থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত পাহাড়তলী নামক স্থানে আসাম-বেঙ্গল রেলের সদর-দপ্তর ছিল। স্থানটি মিউনিসিপাল এলাকা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। ধর্মঘট যখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল তখন একদিন পাহাড়তলীতে জনতা ও পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে; ফলে কিছুসংখ্যক লোক আহত হয়। সংঘর্ষের কারণ, ঠিকাদাররা নাকি জোর করে কতকগুলি ধর্মঘটী লাইনম্যানদের কাজে যোগদান করাবার চেষ্টা করে; কিন্তু তারা সম্মত হয় না। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল যে, এই সংঘর্ষ আগে থেকেই পরিকল্পিত হয়েছিল রেলের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী ও পুলিশের যোগসাজসে। এই হাঙ্গামার সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন বা তাঁর সহকর্মীদের আদৌ কোনো সম্পর্ক ছিল না। তথাপি পুলিশ-রিপোর্টের ভিত্তিতেই ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর উপর এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

অহিংসা ও অসহযোগে বিশ্বাসী একজন নেতার উপযুক্ত এই পত্র। তাঁর উপর নতুন করে যখন নিষেধাজ্ঞা জারি হয় তখন তার প্রতিবাদে চট্টগ্রামের মোসলেম হলে একটি মহতী সভা হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর সহকর্মীদের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল বলে তাঁরা এই সভায় যোগদান করতে বিরত ছিলেন। স্বামীর পরিবর্তে এই সভায় তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাকে যোগদান করতে দেখে সভায় উপস্থিত সকলেই যারপর-নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। হবারই কথা। একজন খাঁটি য়ুরোপীয় মহিলা তাঁর স্বামীর রাজনৈতিক আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে জনসাধারণের সামনে এসে নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন—সমকালীন ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। সেইদিন থেকে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা এই দেশের মুক্তি-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে বরণীয়া হয়েছেন—যেমন অতীতে হয়েছিলেন মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা) আর য়্যানি বেসান্ত।

এই সভায় শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা ইংরেজিতে একটি সুন্দর বক্তৃতা

করেছিলেন। সেই বক্তৃতার শেষে তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসীদের উদ্দেশে বলেছিলেন: 'মহাত্মাজির নেতৃত্বে আপনারা যে বিরাট আন্দোলনে যোগদান করেছেন তার সাফল্য সুনিশ্চিত। সে সাফল্য অর্জন করতে হলে, আপনাদিগকে অহিংস-নীতিই অনুসরণ করতে হবে।' তাঁর কণ্ঠে এ যেন তাঁর স্বামীর কথাই উচ্চারিত হলো। সেইদিন থেকে চট্টগ্রামের অধিবাসী তথা সমগ্র বাঙালির চোখে শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা যে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন আজো তিনি সেই আসনেই অধিষ্ঠিতা আছেন। যতীন্দ্রমোহন আজ নেই, কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী এখনো আমাদের মধ্যে আছেন। আজ তিনি জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হয়েছেন ও দেশের স্বাধীনতাকে চাক্ষুষ করেছেন— যে স্বাধীনতার জন্য একদা তাঁর স্বামী দেশ-মাতৃকার বেদীমূলে তাঁর যৌবনদৃপ্ত জীবনকে আত্মাহুতি প্রদান করেছিলেন। গান্ধী-যুগে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর সহধর্মিণীর ত্যাগ ও দেশসেবার যথার্থ মূল্যায়ন বোধ হয় আমরা আজো করে উঠতে পারিনি। তা যদি পারতাম, তাহলে দেশপ্রিয়ের স্মৃতি তাঁর স্বদেশবাসীর মন থেকে এমনভাবে মুছে যেত না।

রেল-ধর্মঘট তখনো পূর্ণোদ্যমে চলছে

ধর্মঘট তহবিলে কোন একটি পয়সাও নেই। সমগ্র দেশের জনমতকে এইদিকে আকৃষ্ট করবার জন্য ও আরো কিছু অর্থসংগ্রহের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার সপ্তাহকাল পরে যতীন্দ্রমোহন এলেন কলকাতায়, সঙ্গে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা। নিজের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ এই দুইমাস কালের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে গেছে, তাছাড়া ধর্মঘট চালাবার জন্য এই সময়ের মধ্যে তাকে ঋণগ্রস্তও হতে হয়েছিল। জেলা-কংগ্রেসের তহবিলে অর্থাভাব। এভাবে ধর্মঘট আর বেশি দিন চলতে পারে না। টাকা দরকার। সেই প্রয়োজনায় টাকা সংগ্রহ করবার জন্য যতীন্দ্রমোহনকে কলকাতায় আসতে হলো। রেল-ধর্মঘটই তখন তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই মহানগরীর জনসাধারণ সেদিন যতীন্দ্রমোহনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল। 'জে. এম. সেনগুপ্ত'—এই নামটি তখন লোকের মুখে মুখে। এর অল্পকাল পরেই তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁকে 'দেশপ্রিয়' আখ্যায় অভিহিত করেন। চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জনকে তাঁর দেশবাসী যেমন ইতিপূর্বে 'দেশবন্ধু' আখ্যায় অভিহিত করে তাঁর অতুলনীয় ত্যাগ ও দেশপ্রেমের স্বীকৃতি দিয়েছিল, আজ তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য, চট্টগ্রামের বীরসন্তান, যতীন্দ্রমোহনকে 'দেশপ্রিয়' আখ্যায় ভূষিত করে বাঙালী তাঁরও ত্যাগ ও দেশপ্রেমের স্বীকৃতি প্রদান করে ধন্য হয়েছিল। বাংলার রাজনৈতিক গগনে সেদিন যেন যুগপৎ দু'টি পূর্ণ-চন্দ্রের উদয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম—দেশবন্ধুর পাশে দেশপ্রিয়। তাঁদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব থেকে যে স্নিগ্ধ কৌমুদীধারা সেদিন বিচ্ছুরিত হয়েছিল, ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা নিরর্থক ছিল না; কারণ বাঙালির হৃদয়-মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেই কিরণসম্পাতে।

যতীন্দ্রমোহন এলেন কলকাতায়।

নাগরিকবৃন্দ শুধু তাঁকে স্বাগতই জানাল না—তাদের নিকট তিনি লাভ করলেন অসাধারণ সম্মান। প্রদেশ কংগ্রেস, সংবাদপত্র, বণিক-সভা, শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ, এমন কি ছাত্র-সম্প্রদায়—সকলেই তাঁর প্রতি বিপুল সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন সেদিন। সকলের মুখেই চট্টগ্রামের রেল-ধর্মঘটের কথা। আলোচনা, বৈঠকে ও প্রকাশ্য জনসভায় যতীন্দ্রমোহন ধর্মঘটের চিত্রটি সকলের সামনেই তুলে ধরলেন। 'এই ধর্মঘট পরিচালনার জন্য আরো অর্থের প্রয়োজন'—তাঁর মুখে এই কথা শুনে কলকাতার জনসাধারণ নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকে নি। কয়েক-দিনের মধ্যেই বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়, এবং তা দেখে যতীন্দ্রমোহন খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা নিয়ে তিনি কলকাতা ত্যাগ করে ফিরবার পথে বরিশাল হয়ে আসেন। বরিশালের জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের পিতৃ-

বন্ধু। চট্টগ্রামের রেল-ধর্মঘটের সংবাদ তিনি রাখতেন, আর, তাঁরই বন্ধু যাত্রামোহনের পুত্র যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে সেই ধর্মঘট চলছিল, এজন্য তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করতেন। তাই যতীন্দ্রমোহন বরিশালে উপনীত হয়ে যখন তাঁর পিতৃবন্ধুর ভবনে এসে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন, তখন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ অশ্বিনীকুমার তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। 'তুমিই পূর্ববঙ্গের ভাবী নেতা'—এই উক্তিটি সেদিন তিনি সকলের সামনেই করেছিলেন।

তিন মাস ধরে প্রবলভাবে চলছে ধর্মঘট।

এইবার সেই ধর্মঘট ভাঙবার জন্য সরকারের সহযোগিতায় রেল-কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে সচেষ্ট হলেন। প্রলোভন ও ভয়-প্রদর্শনে যখন কোনো কাজ হলো না, তখন এক নতুন উপায় অবলম্বিত হলো। কোম্পানী নতুন লোক সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করতে থাকে। শত শত নব-নিযুক্ত কর্মচারী কাজে যোগদান করল। ধর্মঘটী কর্মচারিগণের মনে দেখা দিল এর প্রতিক্রিয়া। তাদের মনোবল শিথিল হতে থাকে। তাদের অনেকেই গোপনে চাকরিতে যোগদান করল। কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাদের অনেককে পুনরায় কাজে বহাল করা হলো, আবার অনেককে করা হলো না। সন্দেহ-ভাজন বহু প্রাক্তন কর্মচারী লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে কর্মে পুনরায় যোগদান করবার অনুমতি পেয়েছিল, কিন্তু চাকরির পূর্বেকার বহু রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছিল। ধর্মঘটের এই পরিণতি অপ্রত্যাশিত ছিল না।

রেল-ধর্মঘট বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেকার একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। সেই ঘটনাটি ছিল চট্টগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর আগমন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশব্যাপী যে গণ-জাগরণ দেখা দিয়েছিল তা চাক্ষুষ করবার জন্য মৌলানা মহম্মদ আলির

সমভিব্যাহারে গান্ধী ভারত-ভ্রমণে বেরুলেন। এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল বাংলা—দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশই সেদিন এই আন্দোলন সবচেয়ে সফলতা লাভ করেছিল। এই বিষয়ে দেশ-বন্ধুর কৃতিত্ব দেখে অন্যান্য প্রদেশের নেতৃবর্গ যারপরনাই বিস্ময় বোধ করেছিলেন। কিছুকাল বাংলাদেশের নানা স্থান পরিভ্রমণ করে গান্ধী এলেন আসামে। তখন যতীন্দ্রমোহন তাঁকে একবার চট্টগ্রামে আসবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন ক্ষিতীশচন্দ্র গাঙ্গুলি, মহিমচন্দ্র দাস প্রমুখ তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মিগণ খুব উল্লসিত হলেন। তখনো রেল-ধর্মঘট চলছে। মহাত্মাজির উপস্থিতি ধর্মঘটীদের প্রাণে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করবে, যতীন্দ্রমোহন এমন আশাও তাঁর মনের মধ্যে পোষণ করে থাকবেন।

যতীন্দ্রমোহন গান্ধীকে চট্টগ্রামে আসবার অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র লিখলেন। তিনি সানন্দে সেই অনুরোধ করবার রক্ষা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন তার শেষে গান্ধী লিখেছিলেন : 'You need not have requested me, for Chittagong is already included in my itinerary.' গান্ধী চট্টগ্রাম পরিদর্শনে আসছেন, এই সংবাদ যখন প্রচারিত হয় তখন সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে সে কি উল্লাস! যাঁর ইঙ্গিতে ভারতের গণমানসে আজ জেগেছে নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্য, জাতির রাজনৈতিক চেতনায় দেখা দিয়েছে এক নতুন দিগন্ত, সেই মহাত্মা গান্ধী চট্টগ্রামে আসছেন—চট্টগ্রামবাসীর জীবনে এটাই ছিল সেদিন একটি শুভসংবাদ। রাজোচিত সম্বর্ধনায় সম্বর্ধিত করবেন মহাত্মাজিকে - এই ছিল যতীন্দ্রমোহনের সংকল্প।

করেছিলেনও তাই।

তখন ভাদ্র মাস। দারুণ গ্রীষ্মকাল। সেই প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে অল্পকালের মধ্যে চট্টগ্রামে গান্ধীজির সম্বর্ধনার যে বিরাট ও অভূতপূর্ব আয়োজন যতীন্দ্রমোহন করেছিলেন তাঁর অনুরক্ত সহকর্মি-গণের ঐকান্তিক সহযোগিতায়, তা মহাত্মা গান্ধীকে এতদূর অভিভূত

করেছিল যে, পরবর্তীকালে তিনি তাঁর নিজস্ব 'Young India' পত্রিকায় এই বিষয়ে দু'টি প্রবন্ধ লিখে তা প্রকাশ করেছিলেন। চট্টগ্রামে গান্ধীর আগমন স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের জীবনে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর দর্শনলাভের জন্য সেদিন চট্টগ্রামে প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। এমন বিশাল জনতা এর আগে এখানে আর কখনো পরিদৃষ্ট হয় নি। গান্ধীর আগমন, তাঁকে দর্শন ও তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করা চট্টগ্রামবাসীদের জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। চট্টগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে সেদিন যেভাবে সম্বর্ধিত করেছিলেন তা সর্বতোভাবেই মহাত্মাজির যোগ্য অভ্যর্থনা বলেই বিবেচিত হয়েছিল। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনেও এমন উদ্দীপনা-মণ্ডিত বিপুল অভ্যর্থনা খুব বেশি দেখা যায় না। চট্টগ্রামে এসে গান্ধী যে দু'টি জিনিস প্রত্যক্ষ করে সবচেয়ে বেশি আহ্লাদিত হয়েছিলেন, তা ছিল সাম্প্রদায়িক ঐক্য আর খদ্দরের জনপ্রিয়তা। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক ও নেতা চট্টগ্রামে পদার্পণ করে এখানকার হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য দেখে সত্যিই প্রীতিলাভ করেছিলেন এবং এজন্য তিনি যতীন্দ্রমোহনের ঐকান্তিক প্রয়াসকে যারপরনাই সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন—'Your achievement is really singular. I have seldom witnessed such spoutaneous communal harmony elsewhere in India.'

আমরা, এই সুদূরকালের ব্যবধানে, কল্পনা করতে পারি যে, গান্ধীজির কাছ থেকে এইরকম অকুণ্ঠ প্রশংসাবাক্য শুনে যতীন্দ্রমোহন নিশ্চয়ই পুলকিত ও গর্ববোধ করে থাকবেন। তারপর যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে পরিচালিত তিন মাসকালব্যাপী রেল-ধর্মঘটের সমুদয় বিবরণ অবগত হয়ে গান্ধীজি মুখে শুধু তার ভূয়সী প্রশংসা করে ক্ষান্ত হন নি, 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় 'Chittagong in the Fore' ও 'Chittagong Speaks'—শীর্ষক এই দু'টি প্রবন্ধ লিখে অসহযোগ

আন্দোলনে চট্টগ্রাম তথা এর জনপ্রিয় নেতার ভূমিকা ভারতের সর্ব-সাধারণের কাছে তুলে ধরেছিলেন। বলা বাহুল্য, মহাত্মাজির এই মহত্ত্ব দেখে যতীন্দ্রমোহন এতদূর অভিভূত হয়েছিলেন যে, পরবর্তীকালে তিনি তাঁর অন্যতম সহকর্মী মহিমচন্দ্র দাসকে বলেছিলেন, 'দেশবন্ধু মিথ্যা বলেন নি যে, গান্ধীজি শুধু আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নন, তিনি একজন যথার্থ মহামানব।'

এই নেতা ও এই মহামানবের রাজনৈতিক আদর্শের একজন সুযোগ্য উত্তরসাধক ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গতি-প্রকৃতি ও কর্মপ্রণালী যাঁরাই গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন তাঁরাই বলবেন যে, দেশবন্ধুর মতো দেশপ্রিয়ও মনে-প্রাণে গান্ধী-ভাবের ভাবুক ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের দিন চট্টগ্রাম যে গৌরব লাভ করেছিল তার সকল কৃতিত্ব যে একা যতীন্দ্রমোহনের প্রাপ্য ছিল তা বললে অন্যায় হবে। তিনি এখানকার নেতা ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর সেই নেতৃত্বের সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর অনুগামী ও অনুরক্ত অনেক সহকর্মীর প্রয়াস। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ, আর কেউ কেউ ছিলেন তাঁর বয়োকনিষ্ঠ। তাঁর এই সহকর্মিগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, যথা—অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিমচন্দ্র দাস, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, প্রফুল্লকুমার সেন, মৌলবী কাজেম আলি আর অম্বিকাচরণ দাস। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন চট্টগ্রামের বিখ্যাত 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার সম্পাদক।

'চট্টগ্রাম সকলের পুরোভাগে।'

'চট্টগ্রাম আজ সোচ্চার।'

সেদিন চট্টগ্রামকে গান্ধী যে এইভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন তার মূলে ছিল যতীন্দ্রমোহনের সংগঠনী-শক্তি, অপূর্ব ত্যাগ আর অসহ-যোগের আদর্শে অকুণ্ঠ বিশ্বাস। চট্টগ্রাম ত্যাগ করে যাওয়ার আগে গান্ধী রেল-ধর্মঘটের বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ধর্মঘটীদের সঙ্গে

আলোচনা করে এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন ও যে কর্মসূচী তাদের সামনে রেখেছিলেন তাতে অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ধর্মঘটীদের অধিকাংশই এই তিনটি মাস আলস্যে কাল যাপন করেছে ও অন্যের প্রদত্ত অর্থসাহায্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেছে। তিনি এর নিন্দাই করলেন এবং বললেন—হয় তারা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করুক, নতুবা তারা তাদের চাকরিতে প্রত্যাবর্তন করুক; অপরের গলগ্রহ হয়ে এইভাবে কাল-ক্ষেপ করা ঠিক নয়। যতীন্দ্রমোহন কথাটির সারবত্তা বিশেষভাবেই অনুধাবন করলেন। 'মহাত্মাজি সত্যিই একজন বাস্তববাদী নেতা'—সেদিন তিনি এই উক্তিটি করেছিলেন তাঁরই এক সহকর্মীর কাছে।

গান্ধীর উপস্থিতি, তাঁর বক্তৃতা ও সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্বের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক প্রভাব—এইসব মিলে চট্টগ্রামবাসীর জীবনে পরিলক্ষিত হয়েছিল এক আশ্চর্য পরিবর্তন। এর ফলে কলকাতার পরেই পূর্ব-বাংলার এই শহরটি হয়ে উঠেছিল অসহযোগের অন্যতম প্রধান তীর্থ-স্থান। অবশ্য তার আগে থেকেই যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় অসহযোগের আদর্শ বেশ ভালভাবেই এখানে প্রচারিত হয়েছিল। তারপর দেশবন্ধু যখন এখানে আসেন তখন থেকেই এখানে জেগে উঠেছিল বিপুল প্রাণবন্যা যার কথা অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় বিশদভাবেই বিবৃত হয়েছে। চট্টগ্রামের হিন্দু ও মুসলমান তাঁতীদের তৈরি এরকম মোটা কাপড় খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ওখানকার ব্রাহ্মণরা তাদের পৈতার সূতা নিজের হাতে কাটত। তাই মহাত্মা গান্ধী যখন বললেন যে, যদি ঘরে ঘরে চরকার প্রবর্তন হয় তাহলে কাউকেই আর আলস্যে কাল যাপন করতে হবে না অথবা অন্যের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভরও করতে হবে না, তখন থেকেই চট্টগ্রামের অধিবাসীদের প্রাণে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল, তার ফলে, সেদিন অসহযোগ আন্দোলনের সেই দু'কূলপ্লাবী দিনে—সমগ্র বাংলার মধ্যে চট্টগ্রাম সকলের পুরোভাগে এসে স্থান

করে নিয়েছিল। যতীন্দ্রমোহনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বই যে চট্টগ্রামবাসীর জীবনে এনে দিয়েছিল নবজীবনের স্পন্দন, উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদেরকে অহিংস-অসহযোগের বলিষ্ঠ আদর্শে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চট্টগ্রামের রাজনৈতিক জাগরণের ইতিহাসে তাঁর স্মৃতি চিরদিনই অম্লান থাকবে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় একমাত্র মেদিনীপুর ব্যতীত আর কোনো জেলায় ঠিক এইরকম একটি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সর্বত্যাগী নেতার আবির্ভাব ঘটে নি বললেই হয়।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২১।

দেশবন্ধুর নির্দেশে তিন মাসের জন্য যে মুচলেকা যতীন্দ্রমোহন দিয়েছিলেন এই তারিখে তার মেয়াদ শেষ হলো। তিন মাসকাল তিনি ফৌজদারি বিধানের ১৪৪ ধারা অনুযায়ী কোনোরকম আইন অমান্য করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর সহকর্মীরা সকলেই এই একই মুচলেকায় আবদ্ধ ছিলেন। নেতাদের উপর এই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ যখন উত্তীর্ণ হলো তখন ২৬শে সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রমোহনের ভবনে কর্মী ও নেতাদের এক বিরাট সমাবেশ হয়। সেদিন সন্ধ্যায় সংকীর্তনের ভিতর দিয়ে যখন এই উৎসব প্রতিপালিত হয় তখন সহসা একদল পুলিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় এবং যতীন্দ্রমোহনকে গ্রেপ্তার করে। সেই ওয়ারেণ্টে লেখা ছিল যে, যেহেতু পাহাড়তলীর হাঙ্গামার সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল সেইহেতু ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯, ১১১ ও ১৪৭ ধারা অনুসারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো।

ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরিত ওয়ারেণ্টে আরো লেখা ছিল যে, মিস্টার সেনগুপ্ত যদি এক হাজার টাকার জামিন দেন তাহলে বিচারকাল পর্যন্ত তিনি মুক্ত থাকতে পারবেন। জামিনে মুক্তিলাভ! অসম্ভব। তিনি অসহযোগী, জামিন দিতে তিনি সম্মত হলেন না; তাঁর

সহকর্মীরাও তাঁকে সমর্থন করলেন। পুলিশ-কর্মচারীদের অনুসরণ করে জেল-হাজতে যাওয়ার আগে যতীন্দ্রমোহন এই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যেন কোনোরকম হরতাল না হয়, যেন কিছুমাত্র শান্তিভঙ্গ না হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁকে গ্রেপ্তার করার আগে আরো কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; তাঁদের মধ্যে ছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আব্দুল করিম, সাধু কৃপাল দাস প্রভৃতি। তাঁদের সকলকেই জেল-হাজতে রাখা হয়েছিল।

স্বামীর গ্রেপ্তারের পর শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা প্রকাশ্যভাবে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং স্থানীয় যুবক-কর্মীদের নিয়ে কংগ্রেসের নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী বিদেশী বস্ত্র-বর্জন ও খদ্দর প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। যতীন্দ্রমোহনের সহধর্মিণীকে দেশের কাজে এইভাবে এগিয়ে আসতে দেখে চট্টগ্রামের তরুণদের মধ্যে সে কী উৎসাহ আর উদ্দীপনা! নেতাদের অভাবে ম্রিয়মান জনসাধারণ আবার তুমুল উৎসাহের সঙ্গে বয়কট আর খদ্দর নিয়ে মেতে উঠতে থাকে। চট্টগ্রামের পথে যুবককর্মীদের পুরোভাগে শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তাকে দেখে জনসাধারণের মধ্যেও জেগে উঠেছিল বিপুল উৎসাহ। কর্তৃপক্ষ তখন তাঁর উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন।

যতীন্দ্রমোহনের সহধর্মিণী ইংরেজ মহিলা।

স্বাধীনদেশের মুক্ত পরিবেশের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন। তাঁর স্বামী গান্ধীর অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত। স্বামীর ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম। হিন্দুনারীর এই আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা। এমন অবস্থায় তাঁর পক্ষে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। সেদিন এর প্রতিবাদে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে যে সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখে পাঠিয়েছিলেন, তার ছত্রে ছত্রে বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁর অন্তরের দেশপ্রেম। যেমন তার ভাষা, তেমনি তার দৃপ্ত প্রকাশভঙ্গী। এই পত্রের শেষাংশে শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা লিখেছিলেন:

'Is it a sin to request people openly to patronise their home industry? Is it a crime to ask the shopkeepers to exhibit country-made productions to attract the notice of the purchasers? Is the law in India so destructive of the industry? Are we here to prohibit rather than encourage what we hold up zealously at home? Or, are we here under the British rule? Am I to understand the British officers cease to be gentlemanly and honourable, when they come to India? I reserve the right to disobey this order, when Mahatma Gandhi, the leader of the national movement in India and the Indian National Congress, orders me to disobey it.'

৪ঠা অক্টোবর বিচার আরম্ভ হলো। বিচারে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে দু'জন এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন, আর সবাই মুক্তিলাভ করলেন। যতীন্দ্রমোহনের বিরুদ্ধে আনীত তিনটি ধারার একটি অভিযোগও পুলিশ প্রমাণ করতে পারল না। তাঁকে মুক্তিদান করার সময়ে বিচারক এই আদেশ করলেন, দরকার হলে তাঁকে আবার আদালতে হাজির হতে হবে। এর উত্তরে যতীন্দ্রমোহন আদালতে বলেছিলেন, তাই হবে, যদি অবশ্য কংগ্রেস থেকে আইন অমান্যের আদেশ না দেওয়া হয়।

বলেছি, যতীন্দ্রমোহন ও চট্টগ্রাম—এক নেতা ও তাঁর দেশ—তখন দেশের বহু সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ তখনকার প্রখ্যাত এবং সর্বকালের নিরপেক্ষ সাংবাদিক, শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Modern Review' পত্রিকায় যতীন্দ্রমোহনের বিচারের উল্লেখ করে যে মন্তব্যটি করেছিলেন সেটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন: 'শ্রীযুত জে. এম.

সেনগুপ্ত প্রমুখ চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার, তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত একটি অভিযোগও সপ্রমাণ করতে সরকারের অক্ষমতা, আর যাঁরা সম্পূর্ণরূপে আইনানুগ প্রতীক-ধর্মঘট সংগঠন করেন অথবা যাঁরা দেশের সর্বত্র শাসনতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন, তাঁদের প্রতি নির্যাতন ও তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা থেকে এটা পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে, শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও দেশ পূর্বে যেখানে ছিল, এখনো সেইখানেই আছে।'

এই মন্তব্যে উল্লিখিত মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার ভারতবাসীকে খুশি করতে পারে নি বলেই তো দেশব্যাপী অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হয়েছিল গান্ধীজির নেতৃত্বে ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এই শাসনতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে যে কতখানি আশার ছিল সেটা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে দেশবন্ধু অভ্রান্তভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। সে কাহিনী এখন থাক। যদিও যতীন্দ্রমোহনকে কোনোপ্রকার মুচলেকা বা জামিন ব্যতিরেকেই মুক্তিপ্রদান করা হয়েছিল, এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য মামলাটি স্থগিত ছিল, তথাপি ২০শে অক্টোবর তারিখে পুনরায় তাঁকে বিচারের জন্য হাজির করা হয়। পুলিশ আইনের ৩২ ধারা ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারা অনুযায়ী তাঁর ও তাঁর সতেরোজন সহকর্মী একটি শোকযাত্রা পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত হন ও তাঁদের প্রত্যেকে তিন মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এটাই ছিল প্রথম কারাদণ্ড। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল তুমুল বিক্ষোভ আর তীব্র উত্তেজনা এবং তাঁর ফলে সমস্ত চট্টগ্রাম শহরে প্রতিপালিত হলো হরতাল। দণ্ডিত বন্দীদের চট্টগ্রাম জেলে রাখা সমীচীন নয় মনে করে পরের দিনেই তাঁদের সকলকে কলকাতায় আলিপুর সেণ্ট্রাল-জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

তাঁর প্রথম কারাদণ্ডের সময়েই যতীন্দ্রমোহন 'দেশপ্রিয়' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন এবং তখন থেকে তিনি সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে

এই নামেই পরিচিত হন। দেশবাসীর হৃদয়ে সেদিন চট্টলের এই বীরসন্তান কী গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারই অভ্রান্ত নিদর্শন ছিল এই 'দেশপ্রিয়' অভিধাটি। চট্টগ্রামের দণ্ডিত নেতৃবর্গ যখন কলকাতায় পৌঁছলেন তখন শিয়ালদহ স্টেশনে কংগ্রেস নেতৃবর্গ তাঁদের বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করেন। যে ট্রেনে তাঁদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল, শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা সেই একই ট্রেনে তাঁদের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন।

॥ নয় ॥

ঘটনা-বহুল উনিশশো একুশ সাল শেষ হতে আর দেরী নেই। সারা ভারতবর্ষ তখন অসহযোগ আন্দোলনে টলমল করছে। কলকাতার জনসমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ।

দেশবন্ধুর পাশে এসে তখন দাঁড়িয়েছেন যৌবনমূর্তি সুভাষচন্দ্র বসু। কৃতিত্বের সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করেও তিনি সোনার পিঞ্জরে আবদ্ধ না হয়ে দেশসেবার যজ্ঞে তাঁর জীবনকে আহুতি দিয়ে দেশপ্রেমের এক নতুন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে সেই বয়সেই গান্ধী প্রমুখ সকল বিশিষ্ট নেতার স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে দেশবন্ধুর। ১৯২১ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারি কেম্ব্রিজ থেকে সুভাষচন্দ্র যে অবিস্মরণীয় চিঠিখানি দেশবন্ধুকে পাঠিয়েছিলেন তার একস্থলে তিনি লিখেছিলেন :

'আপনি আজ বাঙলাদেশে স্বদেশ সেবাযজ্ঞে প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তার তরঙ্গ চিঠি ও খবরের কাগজের ভিতর দিয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃভূমির আহ্বান শোনা গিয়াছে।···আপনি বাঙলাদেশে সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।'

দেশমাতৃকার বেদীমূলে নিবেদিত এই তরুণ তাজা প্রাণটিকে দেশবন্ধু কিভাবে তাঁর বুকে টেনে নিয়েছিলেন, সে-কাহিনী সুবিদিত। দেশবন্ধুর মধ্যেই সুভাষচন্দ্র তাঁর ঈপ্সিত নেতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন সেদিন, যেমন একদা পেয়েছিলেন যতীন্দ্রমোহন। 'যতীন আর সুভাষ এই দু'জনই তো আমার ডান হাত বাঁ হাত'—উত্তরকালে দেশবন্ধুকে অনেক সময়ে এই কথা বলতে শোনা গিয়েছে। বস্তুত বাংলার রাজনীতিতে সেদিন চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্রের সম্মেলন যেন একটি অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছিল।

১৯২১ সালটিকে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে সত্যিই একটি বিক্ষোভ ও সংঘাতপূর্ণ বছর বলে অভিহিত করা চলে। বছরের শেষভাগে ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত-আগমন উপলক্ষে সেই সংঘাত যেন চরমে উঠেছিল। ভারতবর্ষে এক বিক্ষুব্ধ পরিবেশের মধ্যে যুবরাজ ভারত-পরিভ্রমণে আসেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধী নির্দেশ দিলেন, যেহেতু পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফতের অবিচার, এই দু'টির একটিরও কোনো প্রতিকার হয় নি, সেইজন্য ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত-আগমন উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র—বিশেষ করে যুবরাজ যেসব শহর পরিদর্শন করবেন সেইসব শহরে প্রতিপালিত হবে হরতাল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সেদিন (২৪শে ডিসেম্বর, ১৯২১) কলকাতায় যে হরতাল প্রতিপালিত হয় তা ছিল অভূতপূর্ব। দেশবন্ধু তখন জেলে, তখনো তাঁর বিচার চলছে, তথাপি তাঁরই ইঙ্গিতে একদিনের জন্য নাকি এই মহানগরীর প্রাণস্পন্দন থেমে গিয়েছিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তখন আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে—আইন-অমান্য আন্দোলন। দেশবন্ধু তখন বাংলা কংগ্রেসের প্রথম ডিক্টেটর। নভেম্বরের শেষভাগ থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতিরূপে আরম্ভ হয়েছিল 'Civil Disobedience Movement' বা 'আইন-অমান্য আন্দোলন।'

বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতায় তখন এক দারুণ প্রাণচঞ্চল

পরিবেশ। সারা ভারতবর্ষেই সেই একই উত্তাল পরিবেশ। এইসময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য ত্রিশ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল—আন্দোলনের পুরোভাগে যেসব নেতা ছিলেন তাঁরাও বাদ যান নি। একমাত্র গান্ধী তখনো পর্যন্ত জেলের বাইরে ছিলেন। ১৯শে নভেম্বর যুবরাজ বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষোভ শুরু হয়। বড়লাট লর্ড রীডিং প্রমাদ গনলেন। যুবরাজ যদি ঠিকভাবে অভ্যর্থিত না হন, তাহলে পার্লামেন্ট থেকে তাঁকেই দোষারোপ করা হবে। কিন্তু তাঁর ভাগ্য মন্দ ছিল, তাই বহু চেষ্টা করেও যুবরাজের জন্য কোথাও, ভারতবর্ষের কোনো শহরে রাজকীয় ও শান্তিপূর্ণ অভ্যর্থনার ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন নি। কংগ্রেস, তথা এর নেতা গান্ধীর সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় সেদিন লর্ড রীডিংকে সত্যিই সাময়িকভাবে নতিস্বীকার করতে হয়েছিল।

১০ই ডিসেম্বর, শনিবার। দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হলেন। আরো অনেক নেতাকেও গ্রেপ্তার করা হলো। গ্রেপ্তারের সময় দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি বলে গেলেন, 'যদি দুঃখক্লেশ নির্যাতনে স্বাধীনতা লাভ করতে চাও তো এই সুবর্ণ সুযোগ' ; আর সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবেই বলে গেলেন, 'সুভাষ, দেখো, বয়কটের বছরটা যেন ঠিকমতো হয়।' নেতার এই নির্দেশ কিভাবে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, সেকথা আগেই বলেছি। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কলকাতার অবস্থা সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার মর্মার্থ এই ছিল, 'সমস্ত শহর নীরব, নিস্তব্ধ, সমস্ত পথঘাট জনমানবশূন্য শ্মশান—লোক নেই, জন নেই, গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই।'

বিচারে দেশবন্ধু ছয় মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন এবং আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেই তিনি বন্দীজীবন যাপন করেছিলেন। এখানে তখন 'নরক গুলজার' অবস্থা বললেই হয়।

ছোট-বড় সব নেতাই তখন সাময়িকভাবে সরকারের এই অতিথি-শালায় একত্রে অবস্থান করছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যখন দেশবন্ধুর বিচার আরম্ভ হয় (ফেব্রুয়ারি, ১৯২২) যতীন্দ্রমোহন তখন মুক্তিলাভ করেছেন এবং তাঁর প্রিয়তম নেতার বিচার কালে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এই বছরেই (১৯২২) কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসল আমেদাবাদে : দেশবন্ধু এই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তখন জেলে ; একটি লিখিত অভিভাষণ পাঠিয়ে দিলেন। সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে দেশবন্ধুর সেই বক্তৃতা পাঠ করলেন।

কারামুক্তির পর যতীন্দ্রমোহন কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্যপদে গৃহীত হলেন। দেশবন্ধু তখন কারান্তরালে, কাজেই ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তিনিই নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ বছর। কংগ্রেসের নীতি-নির্ধারণী সভায় সেই বয়সে সদস্য নির্বাচিত হওয়া তাঁর পক্ষে বড়ো কম গৌরবের বিষয় ছিল না। বয়সে তরুণ হলেও, অন্যান্য বিষয়ে তিনি যে এর যোগ্য ছিলেন, সে-কথা বলা বাহুল্য।

এইবার দেশপ্রিয় একটি বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন তিনি চট্টগ্রামে আহ্বান করলেন। দেশজননী বাসন্তী দেবী এই কনফারেন্সের সভানেত্রীর পদে নির্বাচিতা হয়েছিলেন। আর সর্বসম্মতিক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হলেন যতীন্দ্রমোহন। ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন বাংলার সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে চট্টগ্রাম তখন কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তার একটি সুন্দর চিত্র আমরা পাই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণের মধ্যে। যতীন্দ্রমোহন বলেছিলেন :

'যদিও ১৯২১ সালের এপ্রিল মাস থেকে আমরা চট্টগ্রামে বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিনাতিপাত করছিলাম, তথাপি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সময়ে সময়ে দেশবাসীর সামনে গঠনমূলক যে কার্যসূচী তুলে ধরেছেন, তার রূপায়ণে আমরা যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছি। চট্টগ্রামে কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার হওয়া উচিত। আমরা প্রকৃত-পক্ষে এই জেলাতে ছত্রিশ হাজার সভ্য সংগ্রহ করেছি। তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডেও আমাদের চাঁদার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা হওয়া উচিত, আমরা দিতে পেয়েছি উনত্রিশ হাজার টাকা। এই কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘট ও অন্যান্য স্থানীয় কার্যবশতঃ এই জেলার অধিবাসিগণ রাজনৈতিক ও দেশহিতকর কাজে চাঁদাস্বরূপ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডেও আমরা উল্লিখিত চাঁদাই দিয়েছি।

'গত বৎসর আমরা এই জেলাতে আঠারো হাজার চরকার প্রচলন করেছি। আমরা বিশ হাজার চরকা প্রচলন করতে পারব বলে আশা করেছিলাম। গত বছর সমগ্র জেলাতে আমরা ষোল শ' তাঁত প্রবর্তন করেছি। কংগ্রেস প্রবর্তিত ষোল শ' তাঁত ছাড়া এই জেলার তাঁতীরা অন্তত চার-পাঁচ হাজার তাঁত চালিয়ে আসছে। সুতরাং গত বছর চট্টগ্রামবাসিগণকে অনেক বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে, তথাপি জাতির গঠনমূলক কার্য সম্পাদনে চট্টগ্রাম বাংলার অন্যান্য জেলার পিছনে থাকে নি।'

পিছনে তো নয়ই, বরং গান্ধীজির কথায়, যতীন্দ্রমোহনের চট্টগ্রাম সেদিন সকলের পুরোভাগেই ছিল। এইখানেই ছিল তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

বলেছি, চট্টগ্রাম কনফারেন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেন, তাই বলি। দেশবন্ধুই তখন বাংলার একমাত্র নেতা ও সর্ববিধ আন্দোলনের পরিচালক ছিলেন। তাঁর কারাদণ্ডের পর স্বভাবতই বাংলার নেতৃত্বে সাময়িকভাবে একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। তাঁর অনুপস্থিতি কালে

আন্দোলনে কে নেতৃত্ব করবেন—এটাই ছিল সেদিন একটি বিশেষ প্রশ্ন। যতীন্দ্রমোহন তাঁর নিজের জেলায় অপরিসীম প্রতিষ্ঠালাভ করলেও, কলকাতার রাজনীতিতে তিনি তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। এমন অবস্থায় তাঁর পক্ষে বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ অসম্ভব ছিল। বয়সে তরুণ ছিলেন, তাঁর উপর এখানে তিনি তেমনভাবে কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। সকলের মনেই তখন প্রশ্ন জাগল, তাহলে বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ করে দেশবন্ধুর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করবার দায়িত্ব নিতে সক্ষম হবেন কে?

এই প্রশ্নটি সমবেতভাবে আলোচনা করার জন্যই এইসময়ে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। অনেকে আবার সমকালীন পরিবেশের কথা চিন্তা করে এই সম্মেলনের বিরোধী ছিলেন, কারণ কোনো জেলাই তখন এই সম্মেলন আহ্বান করতে ভরসা পায় নি। প্রত্যেক জেলার নেতৃস্থানীয়েরা তখন কারাগারে। কে এই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করবেন? অথচ দেশের লোকের নৈরাশ্য ও উদ্যমহীনতা দূর করার জন্য তখন প্রাদেশিক সম্মেলনের আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এ ছাড়া, অর্থ ও সময়ের কথাও চিন্তা করে অনেকে সম্মেলনের বিষয় থেকে বিরত ছিলেন। তাই মত-বিরোধ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক সম্মেলন হওয়াই সাব্যস্ত হয়। তারপর যখন বাংলার অন্য কোনো জেলা এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে এলো না, তখন চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে যতীন্দ্রমোহন এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে স্বীকার করলেন। এর কিছু পরেই তিনি চট্টগ্রামে ফিরে এসে প্রাদেশিক সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করলেন। তিনি সম্মেলন আহ্বান করেছেন—এই সংবাদ যখন চট্টগ্রামের অধিবাসীদের কানে গিয়ে পৌঁছল তখন তাঁরা একজোটে তাঁকে সমর্থন করলেন। শুধু সমর্থন করা নয়, সেই অল্প সময়ের মধ্যে (হাতে তখন মাত্র এক মাস সময় ছিল) তাঁর অনুরক্ত সতীর্থ ও সহকর্মিগণ বহুবিধ বাধা-বিপত্তির

মধ্যে কিভাবে চট্টগ্রাম সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই।

আগেই বলেছি, এই স্মরণীয় অধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন বাসন্তী দেবী। সভায় তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন তার মধ্যে দেশবন্ধুরই ভাবী কর্মসূচীর ইঙ্গিত যেন অনেকে দেখতে পেলেন। সেই কর্মসূচী হলো Council entry বা আইনসভায় প্রবেশ করে দ্বৈত শাসনকে অচল করে দেওয়া ও নতুন শাসন সংস্কারের প্রকৃত স্বরূপটা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা। এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে আমরা এখানে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম :

'তখনো অসহযোগের ভীষণ বন্যা বাংলার কূলে কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল। এই সময়ে সভানেত্রীর এই সহযোগিতার প্রস্তাব সম্মিলন কর্তৃক গৃহীত হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বাসন্তী দেবী সভানেত্রীরূপে কাউন্সিল অধিকারের প্রস্তাব করাতে অসহযোগী প্রতিনিধিবর্গ তাঁহার তীব্র সমালোচনা করিতে থাকেন। বাসন্তী দেবীর এই বাণী যে তাঁহার নিজস্ব নয়, উহা যে দেশবন্ধুর অভিমতের প্রতিধ্বনি মাত্র, ইহা সকলেই অনুভব করিলেন। কিন্তু দেশবন্ধুও সহযোগিতার প্রস্তাব করিলে সম্মিলন তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিত না। যে দেশবন্ধু কংগ্রেসের অনুমোদন ব্যতীত আইন-ভঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিলেন, অসহযোগী ও সত্যাগ্রহিগণের অবিসংবাদিত নেতা, তাঁহার বীর-পত্নীর মুখে এ কী কথা?'

যাইহোক, চট্টগ্রাম কনফারেন্সে বাসন্তী দেবীর বক্তৃতাকে কেন্দ্র করেই সেদিন দেশবন্ধু সম্পর্কে অনেকের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, তিনি বুঝি তাঁর মত পরিবর্তন করে এখন সহযোগিতার পথে দেশকে পরিচালিত করার কথা চিন্তা করছেন। এইবার কিছুক্ষণের জন্য মূল কাহিনী থেকে আমরা বিষয়ান্তরে প্রবেশ করব। অর্থাৎ সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশের চালচিত্রটা পাঠকদের সামনে

একটু তুলে ধরব। যতীন্দ্রমোহনের জীবনের কাহিনীর সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে এর কোনো সম্বন্ধ নেই বটে, তথাপি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পরবর্তী স্তরকে বুঝবার পক্ষে ইহা প্রয়োজন। কারণ ব্যক্তি-মানুষের জীবনকে তাঁর সমকালীন ইতিহাস থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল আইন-অমান্য আন্দোলন। গান্ধীকে এই আন্দোলনের অধিনায়ক বা ডিক্টেটর করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে ঠিক হয় যে, বারদৌলিতে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হবে। লর্ড রীডিংকে গান্ধী তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যখন এই সংবাদ এসে পৌছল তখন দেশবন্ধু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও তাঁর সহকর্মিগণ (যাঁরা তখন তাঁর সঙ্গে বন্দীজীবন যাপন করছিলেন) আশা করলেন যে, এইবার স্বয়ং মহাত্মা যখন আন্দোলন পরিচালনা করতে কৃতসংকল্প হয়েছেন তখন নিশ্চয়ই তা ফলপ্রসূ হবে। বড়লাটকে তিনি যে পত্রখানি লিখেছিলেন তাতে গান্ধী বলেছিলেন যে, যদি এক সপ্তাহ কালের মধ্যে সরকারের হৃদয়ের কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হয় তাহলে তিনি আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। সমস্ত দেশ সেদিন অধীর আগ্রহের সঙ্গে গান্ধীজির পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রতীক্ষায় ছিল।

কিন্তু এই নির্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ঘটনাস্রোত সহসা অন্যদিকে মোড় নিল। উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলায় চৌরিচৌরা নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে একদল ক্ষুব্ধ কৃষক কংগ্রেস স্বেচ্ছাদল দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্থানীয় পুলিশ-চৌকি আক্রমণ করে ও কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করে। এই ঘটনা যখন ঘটে গান্ধী তখন বারদৌলিতে এবং সেইখানেই তিনি ওয়ার্কিং কমিটির একটি জরুরী বৈঠক আহ্বান করেন। চৌরিচৌরার ব্যাপারে মর্মাহত হয়ে এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে জনসাধারণের আসক্তি দেখে তিনি একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব

উত্থাপন করেন। কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রস্তাব 'বারদৌলি প্রস্তাব' নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ও এরই ভিত্তিতে গান্ধী অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্ত গণ-আন্দোলন—অহিংস-অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ বা আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। বারদৌলিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কিছুদিন পরে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (A.I.C.C.) অধিবেশনে প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

কারান্তরালে থেকে এই সংবাদে কংগ্রেস নেতারা যারপরনাই মর্মাহত ও বিচলিত হলেন। মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই দু'জন নেতা বিশেষভাবে মর্মাহত হলেন গান্ধীর এই সিদ্ধান্তে—এ যেন মাঝপথে আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া, এ যেন পশ্চাদপসরণ। গান্ধী-সমালোচকদের অনেকেই তাই বারদৌলি প্রস্তাবকে 'Bardoli retreat' বলে অভিহিত করেছিলেন সেই সময়ে। আন্দোলন মাঝপথে প্রত্যাহৃত হওয়াতে তরুণদের মধ্যে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রও কম ক্ষুব্ধ হলেন না। 'The Bardoli retreat came as a staggering blow'—এই কথা পরে লিখেছিলেন সুভাষচন্দ্র; আর জওহরলাল লিখেছিলেন: 'We were angry when we learnt of this stoppage of our struggle at a time when we seemed to be consolidating our position and advancing on all fronts.' এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারিতে, আর ১০ই মার্চ গান্ধীকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলনের মূলে শেষ আঘাত হানলেন সরকার। বিচারে গান্ধীর ছয় বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।

আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জেলে থাকতেই দেশবন্ধু তাঁর সহকর্মিগণের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী কার্যসূচী নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, এরপর বাইরের আন্দোলনকে আইনসভার মধ্যে নিয়ে যাওয়া ভিন্ন আর কোনো পথ নেই। তাঁর সেই ভাবনা-চিন্তাই

প্রতিফলিত হয়েছিল চট্টগ্রাম কনফারেন্সের সভানেত্রী বাসন্তী দেবীর ভাষণের মধ্যে। তখনকার দিনে প্রাদেশিক কনফারেন্সগুলির বিশেষ গুরুত্ব ছিল এবং সেখানে গৃহীত কোনো কোনো প্রস্তাব পরে সর্বভারতীয় স্তরে আলোচিত হতো। তাই আগে থেকেই দেশবন্ধু বাসন্তী দেবীর ব-কলমে ভবিষ্যৎ কার্যপন্থার কথাটা দেশবাসীর সামনে রেখেছিলেন সেদিন। বাসন্তী দেবীর ভাষণের এক স্থলে এই কথাটি ছিল, 'এখন কংগ্রেসের কার্যক্রমের পরিবর্তন প্রয়োজন। অসহযোগিতাকে এখন আইনসভায় নিয়ে যেতে হবে।' প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই বাংলার আকাশে-বাতাসে শুধু কাউন্সিল প্রবেশের কথাই শোনা যেত।

১৯২২, ৯ই আগস্ট দেশবন্ধু কারামুক্ত হলেন।

এই বছরের ডিসেম্বর মাসেই তিনি গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এখান থেকেই কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়—একদল আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে, অন্যদল এর বিপক্ষে। গয়া কংগ্রেস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল; এই কংগ্রেসেই কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাবটিকে উপলক্ষ করে কংগ্রেস দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এখানেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্বরাজ্য দলের উদ্ভব হয়। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট তিন বৎসর কাল স্বরাজ্য দলের দলপতি হিসাবে চিত্তরঞ্জন সেদিন ভারতের রাজনীতিতে যে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা এক কথায় তুলনারহিত। এইসময় থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনীতি বলতে গেলে একমাত্র তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়েছিল। নাগপুর কংগ্রেসের মতো গয়া কংগ্রেসেও দেশবন্ধু প্রচুর সংখ্যক ডেলিগেট নিয়ে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বিষয়-নির্বাচনী সভায় ভোটের সংখ্যাধিক্যে কাউন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে নেওয়া।

কিন্তু তিনি সফলকাম হতে পারলেন না। গয়া কংগ্রেসে তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি উপযুক্ত সংখ্যক সমর্থক পান নি এবং

কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সভাপতিরূপে যখন তিনি প্রতিনিধিদের সামনে কংগ্রেসের নতুন কার্যসূচী রাখলেন তখন তা অনুমোদন করার জন্য খুব বেশি প্রতিনিধি এগিয়ে এলেন না। এই গয়া কংগ্রেসে সভাপতিরূপে দেশবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সেরূপ মৌলিক ও চিন্তাপূর্ণ ভাষণ বিরল বললেই হয়। একজন সমালোচকের মতে, 'In this remarkable address Chittaranjan first advanced his proposal to depart from Mr. Gandhi's programme on a very crucial issue and boldly made a bid for entry into the Councils'. অপূর্ব যুক্তিজালপূর্ণ এই গয়া-ভাষণ ছিল দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। বিষয়-নির্বাচনী সভায় বিপুল ভোটাধিক্যে দেশবন্ধুর প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। কিন্তু সংগ্রামে চিরঅপরাজেয় দেশবন্ধু এতে কিছুমাত্র দমলেন না। তিনি কংগ্রেস সভাপতিত্বের পদে ইস্তফা দিলেন এবং পরের দিনই তাঁর নতুন দলের উদ্ভবের কথা ঘোষণা করে সবাইকে বিস্মিত করে দিলেন।

এই পটভূমিকাতেই উদ্ভূত হয়েছিল স্বরাজ্য দল।

ইংরেজি নববর্ষের (১৯২৩) প্রথম দিনে গয়াতেই এই নতুন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব সমকালীন ইতিহাসের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। সেদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলে দেশবন্ধু জাতির স্তিমিত জীবনে যে উদ্দীপনার, যে উৎসাহের সঞ্চার করেছিলেন তার আনুপূর্বিক বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশে প্রথম যাঁরা স্বরাজ্য দলের সভ্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন, কিরণশঙ্কর, সুভাষচন্দ্র, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অনিলবরণ রায়, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সাতকড়িপতি রায়, হেমন্তকুমার সরকার প্রভৃতি। স্বরাজ্য দলের অনুকূলে জনমত গঠনের জন্য সেই বয়সে ঝড়ের বেগে দেশবন্ধুর ভারত-পরিক্রমা সকলকে বিস্মিত করল—সর্বত্রই তিনি আশানুরূপ ফললাভ

করেছিলেন। বহু প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি স্বরাজ্য দলে যোগদান করলেন। সারা ভারতের রাজনৈতিক চেতনায় তখন একটি মানুষেরই ছায়াপাত ঘটেছিল—তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সারা ভারতে তখন একটি রাজনৈতিক দলের কথাই শোনা গিয়েছিল। সেই দল—স্বরাজ্য দল। মতিলাল নেহরু ছিলেন এর সভাপতি; আর এর সর্বময় অধিনায়ক ছিলেন দেশবন্ধু। দেশবন্ধু ও স্বরাজ্য দল—এই দুটি শব্দ তখন যেন সমানার্থবোধক হয়ে জনসাধারণের চিত্তে স্থায়ী স্থান অধিকার করেছিল।

॥ দশ ॥

সামনেই নির্বাচন।

নতুন শাসন-সংস্কার অনুযায়ী ১৯২৩ সালের শেষভাগে নির্বাচন সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার কথা। নির্বাচনে জয়লাভ করতে হলে এখন থেকেই তার প্রস্তুতি দরকার। দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল সেপ্টেম্বর মাসে। সভাপতি ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বরাজ্য দলকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে আইনসভা অধিকারের জন্য অনুমতি দেওয়া হলো। দেশবন্ধু 'এক রাউণ্ড' জয়লাভ করলেন।

অসহযোগ আন্দোলন যখন প্রত্যাহৃত হয় ও দেশবন্ধু যখন স্বরাজ্য দল গঠন করে আইনসভা অধিকারের কথা চিন্তা করেন তখন থেকে যতীন্দ্রমোহন আবার আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। নাগপুর কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু তাঁকে তিন মাসের জন্য ব্যবসায় বন্ধ রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি প্র্যাকটিস করার কথা চিন্তা করেন নি এবং ঘটনাচক্রে তার অবকাশও তিনি পান নি। দেশবন্ধুর কাউন্সিলে যাওয়া যেমন অনেকের কাছে নিন্দনীয় হয়েছিল, যতীন্দ্রমোহনের পুনরায় হাইকোর্টে যোগদান করার বিষয়টাও অনেকের কাছে ঠিক তেমনি নিন্দনীয় হয়েছিল। কিন্তু দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় আইন-ব্যবসায় বন্ধ রাখার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো একটি কারণ ছিল। এই দেড় বৎসরকাল প্র্যাকটিস বন্ধ রাখার ফলে তিনি বহুল পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার সুরেন্দ্রচন্দ্র ধর লিখেছেন: 'যখন যতীন্দ্রমোহন পুনরায় ব্যবসায়ে যোগদান করেন, তখন কংগ্রেস কর্মিগণের অনেকে তাঁহাকে নানাভাবে বিদ্রূপ ও নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার উত্তরে দেশবন্ধু বলেন—যতীনকে পুনরায় ব্যবসায়ে যোগ দিতে হলো। তাতে তার দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই—দেশেরই দুর্ভাগ্য আছে। তার মতো কর্মী আর একটি জুটবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে তাকেও ব্যবসায়ে যোগদান করতে হলো। তোমরা তাকে বিদ্রূপ করছ। আমি তার অভাব অনুভব করে ব্যথিত হচ্ছি।'

এই হৃদয়বত্তার গুণেই তো দেশবন্ধু—দেশবন্ধু।

যতীন্দ্রমোহনের কর্মজীবনের সূচনাকাল থেকেই দেশবন্ধু বিশেষ-ভাবেই চট্টলের এই বীর সন্তানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং কথিত আছে যে, 'বারে' যখন দুজনে একসঙ্গে প্র্যাকটিস করতেন তখন উদীয়মান ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহনকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন, যেসব মামলা নিজে নিতে পারতেন না সেগুলি যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। 'বারে' এইভাবে একজন জুনিয়ারকে সাফল্য অর্জনের জন্য সহায়তা করা একমাত্র দেশবন্ধুর মতো অমন মহানুভব ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল। দেশপ্রিয় চিরকাল সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর নেতার এই মহানুভবতার কথা স্মরণে রেখেছিলেন। 'There was only one Deshbandhu who had a mother's heart.'—দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে দেশপ্রিয় এই সুন্দর উক্তিটি করেছিলেন।

বাংলাদেশে যখন স্বরাজ্য দল গঠিত হয় তখন দেশবন্ধু যতীন্দ্র-মোহনকে এর সম্পাদক পদের দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁর যোগ্যতার পুরস্কার দিয়েছিলেন। স্বরাজ্য দলপতি দেশবন্ধু আবার যতীন্দ্রমোহনকে তাঁর সহকর্মীরূপে আহ্বান করলেন। সে-আহ্বানে তিনি সাড়া দিলেন। শুধু বঙ্গীয় স্বরাজ্য পার্টির সম্পাদক পদেই তিনি নির্বাচিত হলেন না,

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতির পদও তিনি এই সময়ে লাভ করেছিলেন। এইভাবেই সেদিন শুরু হয়েছিল যতীন্দ্রমোহনের রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। চট্টগ্রামের সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যে যে প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ হয় নি, এইবার আমরা দেখতে পাব যে, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে এসে তিনি কিভাবে তাঁর নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

এর পরেই আরম্ভ হলো কাউন্সিল নির্বাচন।

সেই স্মরণীয় নির্বাচন সংগ্রামে তিনিই ছিলেন দেশবন্ধুর প্রধান সহকর্মী। নতুন দলের প্রচারকার্যের জন্য দরকার হলো একটি নতুন ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার। ভূমিষ্ঠ হলো দেশবন্ধুর পরিচালনায় 'Forward' পত্রিকা। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক পি. কে. চক্রবর্তী। সূচনাকাল থেকেই দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ড' ভারতবর্ষের সংবাদপত্র-জগতে যে অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল তা আজকের দিনের সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের মালিক বা সম্পাদকদের কল্পনার বাইরে বললেই হয়। নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের জয়লাভের মূলে ছিল এই কাগজখানি। পত্রিকাটি পরিচালনা ও সংগঠনের দুরূহ দায়িত্ব দেশবন্ধু ন্যস্ত করেছিলেন তরুণ সুভাষচন্দ্রের উপর। সুভাষচন্দ্র মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় নিবন্ধও রচনা করতেন কাগজের জন্য। সে-সব নিবন্ধ ছিল যেমন অগ্নিগর্ভ, তেমনি উদ্দীপনাময়; অসহযোগ আন্দোলনের যুগে শ্যামসুন্দরের 'সার্ভেন্ট' ও দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ড' এই দুটি পত্রিকাই ভারতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দিয়েছিল বললেই হয়—যেমন এনেছিল স্বদেশীযুগে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা। মহারাষ্ট্রে তিলকের 'কেশরী' পত্রিকাটিও সেদিন এই গৌরবের অধিকারী হয়েছিল। গান্ধীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সুরেন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত প্রত্যেক নেতার জীবনেই আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করি, সেটি হলো এই। তাঁদের অধিকাংশেরই নিজস্ব একটি

পত্রিকা ছিল এবং একদিকে তাঁদের রসনা, আর অন্যদিকে তাঁদের লেখনী—এই দুটিকে আশ্রয় করেই জাতীয়তার ভাবধারা বিকশিত হয়ে উঠেছিল ও জনসাধারণকে করে তুলেছিল রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন। আজকের দিনের সংবাদপত্রগুলি এইরকম গৌরবের দাবী কতটুকু করতে পারে সেটা বিশেষভাবেই বিচার্য।

নির্বাচন সংগ্রামে দেশবন্ধুর প্রধান সহকর্মী ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে সাতান্নজন-হিন্দু ও মুসলমান আইনসভার সভাপদের জন্য মনোনীত হলেন। যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে মনোনীত হলেন। এই নির্বাচনে স্বরাজ্য দল বাংলাদেশে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল· দলের মনোনীত সাতান্নজন প্রার্থীর মধ্যে চল্লিশজন জয়যুক্ত হয়েছিলেন। বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন উকিল অন্নদাচরণ দত্ত। এর আগে অর্থাৎ ১৯২০ সালের নির্বাচনের সময় যতীন্দ্রমোহন প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তখন তাঁর স্বপক্ষে চট্টগ্রামের জনমত এত প্রবল ছিল যে, নির্বাচনে তাঁর জয় একপ্রকার সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু যেহেতু কংগ্রেস সেই নির্বাচন বয়কট করেছিল সেইজন্য কংগ্রেসের নির্দেশে তিনি মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এবারকার অর্থাৎ ১৯২৩ সালের নির্বাচনের সময় যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে দীর্ঘকাল চট্টগ্রামে অবস্থান করা কিম্বা কেন্দ্রে কেন্দ্রে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভোটদাতাগণের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে নি, কারণ তখন স্বরাজ্য দলের সংগঠনের দায়িত্ব তাঁর উপর ছিল। কলকাতা থেকে দেশবন্ধু তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাই মনোনয়ন পত্র দাখিল করে ও চট্টগ্রামবাসী হিন্দু ভোটারদের উদ্দেশে স্বরাজ্য দলকে জয়যুক্ত করার আবেদন জানিয়েই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। নির্বাচনে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা সত্ত্বেও, জয়লাভ সম্বন্ধে তার মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অনিশ্চয়তা ছিল না। কর্মীদের উপর ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার পরে দেখা গেল যে, বিপুল ভোটাধিক্যে তাঁর প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে যতীন্দ্রমোহন বিজয়ী হয়েছেন। এর থেকে সেদিন এই সত্যটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, চট্টগ্রামে তাঁর জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি বা হ্রাস পায় নি। চট্টগ্রামবাসীদের হৃদয়ে তাঁর যে স্থান ছিল সেখান থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি। নির্বাচনের ফল প্রমাণ করে দিল যে, চট্টগ্রাম যতীন্দ্রমোহনের আর যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রামের; অর্থাৎ এই জেলার অধিবাসীবৃন্দ তাঁদের এই প্রিয় নেতার প্রতি পূর্বে যেমন ছিল আজো তেমন অনুরক্ত। নেতৃত্ব একেই বলে। বাংলাদেশে সেদিন এমন গৌরবময় নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন দুইজনই—দেশবন্ধু আর দেশপ্রিয়।

যদিও এই নির্বাচনে বাংলাদেশে স্বরাজ্য দলের নিরঙ্কুশ জয়লাভ অপ্রত্যাশিত ছিল না, তথাপি দেশবন্ধুর মনে কিছুটা সংশয় যে না ছিল তা নয়। সংশয়ের প্রধান কারণই ছিল অর্থাভাব। পার্টির তহবিলে তখন টাকা ছিল না বললেই হয়। ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য দাঁড়ালেন বাংলার একদা 'মুকুটহীন' রাজা ও জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ। যদিও ১৯২০ সালের নির্বাচনের পর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে জনসাধারণের চক্ষে তিনি তখন আর পূর্বকার গৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন না, তথাপি সুরেন বাঁড়ুজ্জো—সুরেন বাঁড়ুজ্জো তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বক্তৃতা কিছুই তখন ম্লান বা ক্ষীণ হয় নি। সেই সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তরুণ চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায়কে স্বরাজ্য দলের প্রার্থীরূপে দাঁড় করিয়ে দেশবন্ধু সেদিন খুবই দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ বিধানচন্দ্র রাজনীতিতে তখন নবাগত ছিলেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকৃতপক্ষে সুরেন্দ্রনাথ ও বিধানচন্দ্রের মধ্যে ছিল না, এ ছিল সুরেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধুর মধ্যে—আমলাতন্ত্র ও কংগ্রেসের মধ্যে। সেদিন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের এই নির্বাচনটির উপর সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। নির্বাচনী ফল ঘোষিত হলে দেখা গেল যে, সুরেন্দ্রনাথ পরাজিত হয়েছেন। স্বরাজ্য দলের এই

জয়লাভকে সেদিন বহু পত্র-পত্রিকায় একটি উল্লেখযোগ্য জয়লাভ বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

নির্বাচনের পর কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের (Congress Council Party) সম্পাদক-পদ লাভ করলেন যতীন্দ্রমোহন। বাংলাদেশে স্বরাজ্য দলের সম্পাদকরূপে তিনি যথেষ্ট সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে দেশবন্ধুর আরো নিকটে এসেছিলেন। এমন অবস্থায় পরিষদীয় দলের সম্পাদক-পদের জন্য তিনিই যে যোগ্যতম ব্যক্তি এ বিষয়ে দলপতির মনে কোনো সংশয় ছিল না। দেশবন্ধুর পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য। মহানগরীর ইংরেজ-অধ্যুষিত পৌরসভাকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়ে গিয়েছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। তিনি যখন এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি 'Calcutta Municipal Act, 1923' নামে যে আইনটি রচনা করেন এবং স্বয়ং তা প্রবর্তন করেন তারই ফলে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি রূপান্তরিত হয় কলকাতা কর্পোরেশনে এবং এখানে পৌর-প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। সুরেন্দ্রনাথ আইন করলেন, কিন্তু তার সুফল ভোগ করলেন স্বরাজ্য দলপতি চিত্তরঞ্জন।

কাউন্সিল-প্রবেশের পর স্বরাজ্য দলের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল নতুন আইন অনুসারে পৌরসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। সেখানেও স্বরাজ্য দলের মনোনীত বহু প্রার্থী বাঘা বাঘা কাউন্সিলারদের পরাজিত করে নির্বাচিত হলেন। পৌরসভায় উড্ডীন হলো স্বরাজ্য দলের বিজয়কেতন। নব-গঠিত পৌরসভার প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু। পৌরসভার নির্বাচনে স্বরাজ্য দল অর্ধেকের বেশি আসন লাভ করেছিল। যতীন্দ্রমোহন প্রথমে কাউন্সিলার পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন না, তথাপি দেশবন্ধু তাঁকেই কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল

এসোসিয়েসনের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত করলেন। বঙ্গীয় স্বরাজ্য দলের সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সহ-সভাপতি ও কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সম্পাদক—এইভাবে তিনটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে যতীন্দ্রমোহন এইসময়ে দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের এক জীবনীকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন : 'তাঁহার অসাধারণ সংগঠন-শক্তিতে দেশবন্ধুর গভীর আস্থা ছিল এবং তাঁহার কার্যাবলীতে তিনি ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, দেশবন্ধু যোগ্যপাত্রেই এই আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। বাংলার স্বরাজ পার্টির অপূর্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি স্থাপনে, কাউন্সিলে কংগ্রেস পার্টির পুনঃপুনঃ অসাধারণ জয়লাভে এবং কর্পোরেশনে কংগ্রেস দলের অসামান্য নেতৃত্বে দেশবন্ধুর নিম্নেই যতীন্দ্রমোহনের স্থান।' সমকালীন ইতিহাসের খবর যাঁরা কিছুমাত্র রাখেন তাঁরা এই মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে কিছুমাত্র সংশয় প্রকাশ করবেন না। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নির্বাচনের পর মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্য বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবে চিত্তরঞ্জনকেই আহ্বান করলেন। গভর্নরের চিঠি এলে পরে, দেশবন্ধু লাটভবনে গিয়ে মন্ত্রিত্বগঠন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একদিন আলোচনা করে এলেন ও বলে এলেন যে, তাঁর দলের সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি সিদ্ধান্ত জানাবেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদর দপ্তরে স্বরাজ্য দলের একটা জরুরী সভা হয়েছিল। দলের প্রায় সকল বিশিষ্ট সভ্যই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। লাট লিটনের সঙ্গে তাঁর আলোচনার মর্মার্থ উপস্থাপিত করলেন দেশবন্ধু। সভায় আলোচনার প্রারম্ভে যতীন্দ্রমোহনই দেশবন্ধুকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি লর্ড লিটনকে কি বললেন?

—সে অনেক কথা যতীন।

—কিন্তু মোদ্দা কথাটা কি বলে এলেন ?

—বলে এসেছি মন্ত্রিত্ব গঠন মানে যদি শুধু transferred subjectগুলির দায়িত্ব নেওয়া হয় তাহলে আমার দল তাতে রাজী হবে কিনা সন্দেহ।

—আর কি বললেন ?

—আরো বলে এসেছি যে, finance-এর উপর কোনো কর্তৃত্ব না দিলে আমার দলের পক্ষে মন্ত্রিত্ব গঠনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

—So we are not going to be hooked and fished like the Moderates.

—Certainly not, Jatin. I have taken a week's time to communicate the reply of the Party to the Governor.

সভায় শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হবে না। দলের সিদ্ধান্ত জানিয়ে লাটসাহেবকে যে চিঠিখানি পাঠানো হয়েছিল, তার প্রাথমিক মুসাবিদাটা দেশবন্ধুর নির্দেশে যতীন্দ্রমোহনই করেছিলেন, কারণ তিনিই তখন স্বরাজ্য দল ও কংগ্রেস কাউন্সিল পার্টির সেক্রেটারি ছিলেন। মুসাবিদাটি দেশবন্ধুর খুব পছন্দ হয়েছিল এবং তার সামান্য মাত্র অদল-বদল করে লাটসাহেবের কাছে প্রেরণ করা হয়। 'পার্লামেন্টারি রাজনীতি যতীন ভালোভাবেই বোঝে'—সেই সময়ে তাঁর এক সহকর্মীর কাছে দেশবন্ধু এই মন্তব্যটি করেছিলেন। ১৯২৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন লর্ড লিটনকে যে চিঠিখানি পাঠিয়েছিলেন তাতে স্বরাজ্য দলের সুস্পষ্ট অভিমতই প্রতিফলিত হয়েছিল। এই স্মরণীয় পত্রের একস্থলে লেখা হয়েছিল : 'The awakened consciousness of the people of this country demands a change in the present system of Government and until that is done or unless there is some change in the general administration

including a change of heart, the people of the country cannot offer willing co-operation'

দল নয়, দেশবাসী—দেশবন্ধুর এই দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্যণীয়।

কাউন্সিলে প্রবেশ করে দলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য দলপতির প্রথম প্রয়াস ছিল হিন্দু-মুসলমান চুক্তি। এ-ক্ষেত্রেও তিনি যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে বিশেষভাবেই পরামর্শ করেছিলেন বলে জানা যায়। সেদিন এই হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট নিয়ে দেশের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তুমুল আলোড়ন। পরিষদীয় রাজনীতিতে দেশবন্ধুর পরেই ছিল দেশপ্রিয়ের স্থান। যে সংহার-মূর্তি নিয়ে তিনি আইনসভায় প্রবেশ করেছিলেন তার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন অভিব্যক্ত হয়েছিল দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, অন্যদিকে তেমনি অভিব্যক্ত হয়েছিল তার দেশপ্রেম। যতীন্দ্রমোহনকে পাশে পেয়ে তিনি অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন এই জন্য যে, বিরোধী পক্ষের তূণ থেকে শরনিক্ষেপ কৌশলে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন অপরাজেয়। কি বাজেট অচল করা, কি মন্ত্রীদের বেতনের বিল নাকচ করে দেওয়া, কাউন্সিলে প্রত্যেকটি বিষয়েই দেশবন্ধু তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতেন।

১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে কাউন্সিলের যে অধিবেশন হয় সেটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই অধিবেশনেই অর্ডিন্যান্স বিলটি আলোচিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল রাউলাট বিলেরই পুনরুজ্জীবন এবং বাংলার বিপ্লবীরা ছিল এর লক্ষ্য। এই বিল পাশ হওয়া মানে সরকারের অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা। স্বরাজ্য দলের দুজন সভ্য তখন কারা-বন্দী ছিলেন। যদি কোনো উপায়ে এই সভ্য দুজনকে কাউন্সিল কক্ষে নিয়ে আসা যায় তাহলে দুটো মূল্যবান ভোট পাওয়া যাবে। এ-ক্ষেত্রেও যতীন্দ্রমোহন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তার মধ্যেও পরিষদীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তিনি এই অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট তাতে সম্মত হন নি।

এই বিল—যা Black Bill নামে অভিহিত হয়েছিল সেদিন, যাতে পাশ না হয় সেজন্য স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয় এবং স্বয়ং দেশবন্ধু অসুস্থতা সত্ত্বেও চিকিৎসকগণের সঙ্গে স্ট্রেচারে বাহিত হয়ে আইনসভায় এসেছিলেন। কাউন্সিলে এই বিল পরিত্যক্ত হলে লর্ড লিটন তাঁর অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে তা মঞ্জুর করে দিয়ে এই সত্যকেই সেদিন প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, নবতম শাসনতন্ত্রের (Reformed Council) আমলেও জনমতকে অগ্রাহ্য করা চলে।

একবার দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে লর্ড লিটন মীমাংসার জন্য যতীন্দ্রমোহনকে ডেকে পাঠালেন। বার বার Ministry প্রত্যাখ্যাত বা বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে বিরোধী দলের সঙ্গে লিটন আলোচনা করে মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। দেশবন্ধু তখন অসুস্থ হয়ে পাটনায় চলে গিয়েছেন। তখন কাউন্সিল এবং কর্পোরেশনে কংগ্রেস পক্ষকে পরিচালনার সব দায়িত্বই ন্যস্ত হয়েছিল যতীন্দ্রমোহনের উপর। লাটভবনে দেখা করার জন্য চিঠি এলো। কিন্তু তাঁর নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে লিটনের মীমাংসা প্রস্তাব গ্রহণে তিনি সম্মত হতে পারেন নি। দেশবন্ধুকে যখন তিনি এই কথা জানালেন, তখন পাটনা থেকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন: 'যতীন, তুমি যে step নিয়েছ আমি তা সর্বান্তঃকরণেই অনুমোদন করি। আমার শরীর আর বইছে না। এখন থেকে দায়িত্বের বোঝাটা তোমাকেই বেশি করে নিতে হবে। সুভাষ, সত্যেন ও হেমন্ত—সবাইকেই আমি অনেক আগেই বলে রেখেছি যে, আমি যখন থাকব না, তখন তোমরা সবাই মিলে-মিশে কাজ করবে। রাজনীতি বড়ো নোংরা জিনিস, দলগত রাজনীতি আরো নোংরা। এই নোংরামির ঊর্ধ্বে থাকবার যোগ্যতা আমি যেন তোমার মধ্যেই সমধিক পরিমাণে দেখতে পাই। বাংলাদেশের নেতা যদি কখনো তুমি হও, নেতৃত্বের অভিমানটুকু তখন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করো।'

দেশবন্ধুর এই চিঠিখানি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যতীন্দ্র-মোহনের মধ্যে তিনি যেন একজন যথার্থ কর্মীপুরুষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাংলাদেশে সেদিন কংগ্রেস, পৌরসভা ও স্বরাজ্য দলের পরিচালনায় যতীন্দ্রমোহনের সহায়তা, তাঁর সংগঠনী প্রতিভা, কর্মপদ্ধতি ও কর্মশক্তি দেখে দেশবন্ধুর মনে, আমরা অনুমান করতে পারি, এই ধারণা জন্মেছিল যে, নেতা হওয়ার যোগ্যতা যতীন্দ্র-মোহনেরই বেশি ছিল। পাটনা থেকে লিখিত পত্রখানিতে কি তারই একটা ইঙ্গিত ছিল না?

এর কয়েকমাস পরেই একদিন বাংলা তথা ভারতে আচমকা ইন্দ্রপতন হলো।

১৬ই জুন, ১৯২৫—দার্জিলিঙে দেশবন্ধু মহাপ্রয়াণ করলেন।

সেদিন ছিল মঙ্গলবার, বাংলা ২রা আষাঢ়, ১৩৩২। দিনের সূর্য তখনো অস্ত যায়নি। কিন্তু অস্তমিত হলেন ভারতসূর্য। হিমালয়ের পাদমূলে কর্মক্লান্ত দেহভার রক্ষা করে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন শতযুদ্ধের বিজয়ী বীর চিত্তরঞ্জন। বাংলার আশা-ভরসা সঙ্গে নিয়ে লোকান্তরে গমন করলেন লোককান্ত মহান্ নেতা। যেন আচম্বিতে অন্তর্হিত হলেন ভারতের রাজনীতি থেকে শক্তিমান এক বিরাট পুরুষ —নবযুগের শৃঙ্খলমুক্ত প্রমেথুস। স্বদেশ-সেবাযজ্ঞে একটি পরিপূর্ণ আত্মাহুতি প্রত্যক্ষ করেছিল ভারতবাসী সেদিন আষাঢ়ের সেই মেঘভারাক্রান্ত দিনটিতে। দেশবন্ধু একজন নেতামাত্র ছিলেন না—একাধারে তিনি ছিলেন 'মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী'। ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে 'দেশবন্ধু' এই নামটি তাই স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

॥ এগারো ॥

দেশবন্ধুর অকালমৃত্যুতে বাংলার রাজনীতিতে একটা বিরাট শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। শুধু শূন্যতা নয়। দেশবন্ধুকে হারিয়ে বাংলা সেদিন সত্যিই নিজেকে যেন অনাথ মনে করল। দুর্দিনের কাণ্ডারীকে হারিয়ে বাঙালী সেদিন নিজেদের এমন অসহায় বোধ করেছিল যে, তা ভাষায় বুঝিয়ে বলবার নয়। সহসা মাথার উপর থেকে আচ্ছাদন আর পায়ের নীচের মাটি সরে গেলে মানুষ যেমন নিজেকে অসহায় ও বিহ্বল বোধ করে, উনিশ শ' পঁচিশ সালের সেই ষোলই জুন তারিখে দেশবন্ধুকে হারিয়ে বাঙালির অবস্থাটা ঠিক সেইরকমই হয়েছিল। রাজনৈতিক সংকটকালে এমন একজন ক্রান্তদর্শী রাজনীতিজ্ঞ নেতার অভাবে সমগ্র বাঙালী তথা ভারতবাসী সেদিন সত্যিই শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছিল। তিনি তো শুধু নেতা ছিলেন না তিনি ছিলেন দেশপ্রেমের একটি সজীব মূর্তি। এমন মূর্তি ভারতবাসী বহুকাল সন্দর্শন করে নি।

দেশবন্ধুর মৃত্যুকালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা একটা যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে একটা শূন্যতার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। সন্ধিক্ষণ বলছি এই কারণে যে, অসহযোগিতার রাজনীতি তখন সহযোগিতার পথে মোড় নিতে উদ্যত হয়েছে। মৃত্যুর মাত্র ছয় সপ্তাহকাল পূর্বে ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলনার সভাপতিরূপে দেশবন্ধু যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তাতে সহযোগিতার সুর বেশ স্পষ্টভাবেই ধ্বনিত হয়েছিল। সেই

কনফারেন্সে স্বয়ং গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। যে সহযোগিতার কথা তিনি সেদিন সেখানে বলেছিলেন তা অবশ্য ছিল দেশবন্ধুর নিজের কথায়, 'honourable co-operation' বা সম্মানজনক সহযোগিতা। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য।

দেশবন্ধুর জীবিতকালেই অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের আপাত নিষ্ফলতা দেখে বাংলার বিপ্লবীরা সেইসময়ে ঐ আন্দোলনের প্রতি তাঁদের আস্থা হারিয়েছিলেন। যে বিপ্লব-বহ্নি সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল এবং দীর্ঘ এক দশক কাল পর্যন্ত যা আর নির্বাপিত হয় নি, ১৯১৪ সালের পর থেকে বাংলায় সেই বিপ্লব স্তিমিত ছিল এবং তা ছিল দেশবন্ধুর নির্দেশেই—তাঁরই কথায় বিপ্লবীরা সেদিন এই নতুন আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু ১৯২৪ সালেই তাঁরা নব পর্যায়ে তাঁদের বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস শুরু করেন এবং এরই প্রথম প্রয়াস ছিল তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা। এর পরেই একদিন লর্ড লিটনের সঙ্গে দেশবন্ধুর এক সাক্ষাৎকার ঘটে ও তারপর তিনি সকল রকম হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যের নিন্দা করে প্রকাশ্যে একটি বিবৃতি দিলেন। অবশ্য সেই বিবৃতিতে তিনি সরকারের স্বৈরাচারী নীতিরও খুব তীব্র নিন্দা করেছিলেন।

এই পটভূমিকাতেই ফরিদপুর কনফারেন্সে সভাপতির ভাষণের মধ্যে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যেন একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাঁর কণ্ঠে সেদিন শোনা গিয়েছিল সহযোগিতার সুর—সম্মানজনক সহযোগিতা। সকলেই বুঝলেন যে, তিনি সরকারের সঙ্গে একটা আপোস-রফায় আসবার জন্য ব্যগ্র হয়েই সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন। বাংলার বিপ্লবীদের কাছে দেশবন্ধুর এই মত-পরিবর্তন সমর্থন পাওয়া তো দূরের কথা, বরং তাঁরা এর নিন্দায় সেদিন সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এর অল্প-কাল পরেই দেশবন্ধুর মৃত্যু হয় এবং ভারতসচিব তথা ভারত সরকার

কেউই আর কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে অগ্রসর হলেন না। তাই এই কথা বলা চলে যে, দেশের একটা রাজনৈতিক সঙ্কটকালেই দেশবন্ধুর মৃত্যু ঘটেছিল এবং তাঁর মৃত্যুতে বাংলার রাজনীতিতে সেদিন সত্যিই একটি বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই অবস্থায় সকলের মনে তাই প্রশ্ন জাগল --Who will lead Bengal now ?—কে এখন বাংলাদেশকে পরিচালিত করবেন ? সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় জেলে, দেশবন্ধুর একান্ত অনুগামী ও বিশিষ্ট কর্মীদের সকলেই তখন আটক বন্দী হয়ে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ ছিলেন। অর্ডিন্যান্স আইনের বলে এঁরা সকলেই ধৃত হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিনা-বিচারে বন্দীজীবন যাপন করছিলেন। এসব ঘটনা দেশবন্ধুর জীবিতকালেই ঘটেছিল এবং এঁদের অভাবে তাঁর যেন তখন ভগ্নপক্ষ জটায়ুর অবস্থা হয়েছিল বললেই হয়। বাংলাকে এখন কে নেতৃত্ব দেবেন ?—এই প্রশ্নটাই সেদিন তাই বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী তখনো বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। দেশবন্ধুকে সহসা হারিয়ে বাংলা যে কতখানি অনাথ ও অসহায় হয়েছে, সেটা বোধ হয় সকলের চেয়ে তিনিই যেন বেশি করে অনুভব করেছিলেন। এবং তা করেছিলেন বলেই দেখা গেল যে, শোকের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও, গান্ধীজি আরো কিছুকাল কলকাতায় অবস্থান করে বাংলার রাজনৈতিক শূন্যতার অবস্থা নিয়ে গভীরভাবেই চিন্তা করতে থাকেন ও নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে তখন যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধানত এই তিনটি বিষয়ে শূন্যতা দেখা দিয়েছিল, যথা—১. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ; ২. বাংলার স্বরাজ্য দলের সভাপতির পদ এবং ৩. কলিকাতা পৌরসভার পৌরপ্রধানের পদ। তাঁর জীবিত-কালে দেশবন্ধু একাই এই তিনটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—তিনিই

ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, স্বরাজ্য দলের সভাপতি ও কর্পোরেশনের মেয়র। এই তিনটি দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে পারেন এমন যোগ্যতা সেদিন মাত্র একজনের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাই সকলের দৃষ্টি, বিশেষ করে গান্ধীর দৃষ্টি তাঁরই উপর নিবদ্ধ হয়েছিল।

এটাই প্রত্যাশিত ছিল।

গান্ধী যেমন তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার জওহরলাল নেহেরুকে দিয়ে গিয়েছিলেন, দেশবন্ধু অবশ্য তেমন কিছু করে যান নি। না করার কারণ সম্ভবত তিনি তখন বুঝতে পারেন নি যে, মৃত্যু তাঁর এত সন্নিকটে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে তিনি দুজনকে যোগ্যতম বলে বিবেচনা করতেন—যতীন্দ্রমোহন আর সুভাষচন্দ্র। এই দুজনের মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে তিনি পেয়েছিলেন অনেক পরে আর খুব স্বল্পকালের জন্য, কারণ রাজনীতিতে যোগদান করার পর তিনি তাঁর নেতার পাশে থেকে একত্রে কাজ করার সময় খুব বেশি পান নি—কারাগার ও নির্বাসনেই তাঁকে থাকতে হয়েছে বেশির ভাগ সময়। অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন রাজনীতিতে এসেছেন ১৯১১ সাল থেকে; ঐ বছরে তিনি ফরিদপুর কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১৯১২ সালে চট্টগ্রাম কনফারেন্সে তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে তিনি আসেন এইসময় থেকেই যদিও তখনকার পরিচয়টা মুখ্যত ছিল হাইকোর্টে 'বারের' পরিচয়। তারপর ১৯১৯ সালে মৈমনসিং কনফারেন্সে মঞ্চের উপর তাঁকে চিত্তরঞ্জনের পাশেই দেখা গিয়েছিল। স্মরণ থাকতে পারে যে, এই কনফারেন্সে তাঁরই পিতৃদেব যাত্রামোহন সভাপতিত্ব করেছিলেন; বৃদ্ধ পিতার ভাষণ সেদিন পাঠ করেছিলেন তাঁরই তরুণ পুত্র যতীন্দ্রমোহন। তারপর অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকেই তিনি দেশবন্ধুর পাশে এসে তাঁর শিষ্য ও সহকর্মীরূপে দাঁড়িয়েছিলেন। পরিষদীয় রাজনীতিতেও তিনি আইনসভায় তাঁর প্রিয় নেতার সঙ্গে একত্রে কাজ করেছেন। তাঁর কর্মশক্তি, সংগঠনী

প্রতিভা, বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে দেশবন্ধুর অনেকখানি নিকটে টেনে এনেছিল বলা চলে।

Who will lead us now ?

কে এখন আমাদের নেতা হবেন ?

এই প্রশ্নটির উত্তর সেদিন অনেকেই খুঁজে পেলেন একটি মানুষের মধ্যে। তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। সকলেরই মনে হলো, দেশবন্ধুর শূন্যস্থান যদিও সহজে পূর্ণ হওয়ার নয়, তথাপি তা কিছুটা পূর্ণ করবার মতো যোগ্যতা যদি কারো মধ্যে থাকে তবে সেই মানুষ হলেন যতীন্দ্র-মোহন। গান্ধীও তাই মনে করলেন। তাঁর চট্টগ্রাম পরিদর্শনের কালে তিনি এই যুবকের প্রতি কিরকম আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা তিনি সেই সময়ে তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখে প্রকাশ করেছিলেন, সেকথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। দেশপ্রিয়ই এখন দেশবন্ধুর যোগ্য রাজ-নৈতিক উত্তরাধিকারী—এই কথা যখন গান্ধী বাংলার নেতৃস্থানীয়দের কাছে বললেন, তখন সকলেই একবাক্যে তাঁকে সমর্থন করলেন। দেশবন্ধুর পরে দেশপ্রিয়ই ছিলেন সেদিন দ্বিতীয় শক্তিধর পুরুষ যাঁকে বাংলার জনসাধারণ সহজেই নেতা বলে গ্রহণ করেছিল। আর দেশ-সেবায় তাঁর ত্যাগও বড়ো সামান্য ছিল না। জনসাধারণের মন গান্ধী বিলক্ষণ বুঝতেন। তাই তাঁর প্রস্তাবে সকলেই সানন্দে সায় দিলেন। দেশবন্ধুবিহীন বাংলায় সেদিন দেশপ্রিয়ের মতোই স্বার্থলেশহীন একজন বলিষ্ঠ নেতার প্রয়োজন ছিল। তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর বারো দিন পরে।

সেদিন ছিল ২৮শে জুন, ১৯২৫।

আজ বঙ্গীয় স্বরাজ্য দলের একটি বিশেষ অধিবেশন হবে দলের সদর দপ্তর কলকাতায়। এই জরুরী সভার কার্যসূচীতে দুইটি মাত্র বিষয় ছিল—দেশবন্ধুর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা এবং দলের সভাপতি নির্বাচন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে প্রায়

চারশোজন সভ্য যোগদান করতে এলেন এই বিশেষ অধিবেশনে। এই সভায় সেদিন সভাপতিত্ব করবার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন দলের অন্যতম প্রবীণ নেতা ও আলিপুরের খ্যাতনামা ফৌজদারী উকিল বিজয়কৃষ্ণ বসু। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে ইনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেন্দ্র থেকে স্বরাজ্য দলের প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর চারজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছিলেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সভাপতির পদের জন্য দুইজনের নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল যথা,—যতীন্দ্রমোহন ও মৌলানা আক্রাম খান। পরে মৌলানা সাহেব তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তখন যতীন্দ্রমোহনই সর্বসম্মতি-ক্রমে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশেষ আমন্ত্রণে মহাত্মা গান্ধী সেদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর গান্ধীজি বলেন: 'দেশপ্রিয় নির্বাচিত হয়েছেন, এতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। দেশবন্ধুর স্থানে নেতৃত্ব করবার মতো যোগ্যতা তাঁর যথেষ্ট পরিমাণেই আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

এরপর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের পালা।

দেশবন্ধুর জীবিতকালে তিনি যখন বি. পি. সি. সি.-র সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন থেকেই যতীন্দ্রমোহন এর সহকারী সভা-পতির পদে নির্বাচিত হয়ে দল-পরিচালনে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় রেখেছিলেন। সুতরাং সভাপতির মৃত্যুতে ঐ পদে সহকারী সভাপতিরই অধিকার, এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধ ছিল না। তথাপি গণতন্ত্রের রীতি অনুসারে ও গান্ধীজির কথা মতো নির্বাচনের ভিতর দিয়ে আসাই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন যতীন্দ্রমোহন।

২৯শে জুন, ১৯২৫।

বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদর দপ্তরে আজ একটি বিশেষ অধিবেশন হবে। কার্যসূচী মাত্র একটি—সভাপতি নির্বাচন। দুই-

জনের নাম প্রস্তাবিত হলো—যতীন্দ্রমোহন ও ললিতমোহন দাস। ললিতমোহন স্বেচ্ছায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন। তখন যতীন্দ্রমোহনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচনে তাঁর স্বপক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ষাট: বিপক্ষে মাত্র আটটি। বলা বাহুল্য, বাংলার রাজনীতিতে এটাও ছিল সেদিন তাঁর জনপ্রিয়তার একটা বড়ো নিদর্শন। সেদিন বাংলার নবীন নেতাকে স্বাগত জানিয়ে স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় যে সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয়েছিল (জুন ৩০,১৯২৫) তার শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল: 'Hail, The Leader.'--হে জননায়ক, স্বাগতম্। বাঙালীর মনের কথাই যেন অভিব্যক্ত হয়েছিল এর প্রতিটি ছত্রে।

ঐ নিবন্ধটিতে বলা হয়েছিল: 'শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বঙ্গীয় স্বরাজ্য দল ও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি-পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এজন্য সবাই আনন্দিত হবেন। তাঁর নির্বাচনে শুধু যে স্বরাজ্য দল বা কংগ্রেসের সভ্যরা আনন্দিত হয়েছেন তা নয়—দেশবাসিগণ প্রায় সকলেই এজন্য আজ আনন্দিত: যে সম্মান আজ তাঁর প্রতি প্রদর্শিত হয়েছে, তিনি সবাংশে সে সম্মানের যোগ্য।... একজন মানুষের প্রকৃত নেতৃপদ লাভ করতে যেসব সদ্গুণের প্রয়োজন হয়, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের মধ্যে সেসব গুণ বহুল পরিমাণেই বিদ্যমান।... যদি অতীত ঘটনায় ভবিষ্যৎ ঘটনা সূচিত হয় তবে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এই নবীন নেতা দেশবাসীদের আহ্বানে আজ যে বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তা তিনি অনায়াসে বহন করতে পারবেন।'

একে একে তাঁর মাথায় দুইটি সম্মানের মুকুট স্থাপিত হলো।

চার বছর আগে শ্যামসুন্দরের 'সার্ভেন্ট' পত্রিকায় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বের যে জয়ধ্বনি শোনা গিয়েছিল, আজ দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় যেন তারই প্রতিধ্বনি শুনলাম। এইবার তাঁর মস্তকে সম্মানের তৃতীয় মুকুটটি কিভাবে স্থাপিত হয়েছিল, অর্থাৎ কেমন করে

তিনি পৌরসভার মেয়র বা পৌরপ্রধান-পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই কাহিনী বলব। যতীন্দ্রমোহন কাউন্সিলর ছিলেন না। তথাপি যখন দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে কর্পোরেশনে মেয়রের পদটি শূন্য হয়, তখন স্বরাজ্য দল থেকে তাঁকেই মেয়র করবার জন্য একটি প্রস্তাব করা হয়েছিল। 'স্টেটস্‌ম্যান' ও 'বেঙ্গলী' কাগজে সেদিন এই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে সম্পাদকীয় পর্যন্ত লেখা হয়েছিল।

১৭ই জুলাই, শুক্রবার ১৯২৫।

যতীন্দ্রমোহনের জীবনে তথা কলিকাতা পৌরসভার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন তিনি এই মহানগরীর দ্বিতীয় মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তারপর উপর্যুপরি আরো চারবার তিনি এই গৌরব লাভ করে তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচয় রেখেছিলেন। তাঁর প্রথমবার মেয়র হওয়ার সময়ে স্বরাজ্য দল ও প্রদেশ কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে প্রথমে কিছু মতভেদ দেখা গিয়েছিল। মতভেদের কারণ পৌরসভায় এই গৌরবের আসনটির প্রতি দলের অনেকেরই সতৃষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের একান্ত অনুগামী যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁকেই ঐ পদে দেখবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কারণ তাঁদের বিবেচনায় দেশবন্ধুর পরে দ্বিতীয় মেয়র হওয়ার মতো যোগ্যতা সেদিন তিনি ভিন্ন আর কারো ছিল না। শেষ পর্যন্ত মীমাংসার জন্য বিষয়টি যখন মহাত্মাজীর কাছে এল, তিনি যতীন্দ্রমোহনের স্বপক্ষেই তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন। কি কারণে তাঁকে তিনি এই পদের যোগ্য বলে মনে করেছিলেন তা তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখিত একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করেছিলেন। প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন নির্বাচন হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই।

সুদীর্ঘ সেই প্রবন্ধটিতে গান্ধী লিখেছিলেন :

'I had little expected that I should have to give advice or guidance in the selection of the Mayor of Calcutta in the place of Deshbandhu. The

matter was to be formally decided by the Congress Municipal Association. Whether the advice, I tendered, was sound or not, whether it was in the interest of the city or not, is undoubtedly a matter, which is capable of many opinions. I can only say that I gave the advice that, in my opinion, was the best for the country and for the City of Palaces. The Congress has, for the past four years, decided to capture municipalities and local boards in its own interest- acquisition of greater political power. There was nothing wrong in this ambition. Deshbandhu captured the Corporation of Calcutta to that end and used it most effectively for consolidation of the power of the Congress.

'Who was then to be the Mayor in his place? It must be bestowed upon him who could best carry out the tradition bequeathed by the great chief, who could gain additional prestige for the Party···In my opinion, Mr. J. M. Sen-Gupta was the fittest person. And if he was good enough to lead the Srawaya Party, he deserved all the adventitious support, that could he given to him in order to enable him to wear Deshbandhu's mantle with grace and dignity.'

দেখা যাচ্ছে, গান্ধী মেয়র-পদের জন্য যতীন্দ্রমোহনকে শুধু যোগ্য ব্যক্তি বলে বিবেচনা করেন নি—তাঁকেই তিনি যোগ্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধু দলগত ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বরাজ্য দলপতি চিত্তরঞ্জন কর্পোরেশন দখল করেন নি; পক্ষান্তরে নাগরিক

উন্নতি-বিধানের বিষয়টি তিনি যে কতখানি গভীরভাবে চিন্তা করতেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটির মধ্যে যেটি তিনি পৌরসভায় মেয়র হিসাবে সর্বপ্রথম প্রদান করেছিলেন।

এইবার আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

যতীন্দ্রমোহন পৌরসভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। সেইজন্য মেয়র-নির্বাচনের দু'দিন আগে তিনি অল্ডারম্যান পদে নির্বাচিত হলেন। তারপর মেয়র-নির্বাচনের দিন (১৭ই জুলাই) কাউন্সিল চেম্বারে পৌরসভার সদস্যগণ ব্যতীত প্রচুরসংখ্যক দর্শকও সমবেত হয়েছিলেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণও উপস্থিত ছিলেন। দর্শকদের গ্যালারি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং বিশিষ্ট দর্শক হিসাবে সেদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, যমুনাদাস মেটা, ভি. জে. প্যাটেল, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি। নাগরিক ও ভোটদাতাদের মনে সেদিন এই মেয়র-নির্বাচন বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি মেয়র এইচ. এস. সুরাবর্দী। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে দেশবন্ধু যখন পৌরসভা অধিকার করেন তখন হিন্দু-মুসলমান চুক্তির ভিত্তিতে শহরের মুসলিম করদাতাদের সঙ্গে তাঁর এই কথা হয়েছিল যে, পৌরসভায় একবার একজন হিন্দু মেয়র ও মুসলমান ডেপুটি মেয়র ও পরের বার মুসলিম মেয়র ও একজন হিন্দু ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হবেন। দেশবন্ধু যখন মেয়র নির্বাচিত হন, তখন সুরাবর্দী সাহেব ডেপুটি মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সভার কাজ আরম্ভ হওয়া মাত্র কাউন্সিলর চারুচন্দ্র বিশ্বাস যতীন্দ্রমোহনের অল্ডারম্যান পদে নির্বাচিত হওয়ার বৈধতা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ডেপুটি মেয়র কিন্তু সেই প্রশ্নটি প্রত্যাখ্যান করেন। নির্বাচনে দাঁড়াবার আগে, কংগ্রেস মিউনিসিপাল এসোসিয়েসনের নিয়ম অনুসারে, ভাবী মেয়রকে শপথ নিতে হয়। শপথ নেওয়ার পর্ব শেষ হলে কাউন্সিলর রায়বাহাদুর

রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়র-পদের জন্য যতীন্দ্রমোহনের নামটি প্রস্তাব করেন, কাউন্সিলর এম. এ. রেজ্জাক সেটি অনুমোদন করেন এবং সমর্থন করেন অল্ডারম্যান ওয়াহেদ হোশান। জি. মর্গান নামে একজন শ্বেতাঙ্গ অল্ডারম্যান এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভোট গ্রহণের পর দেখা গেল যে, যতীন্দ্রমোহন পেয়েছেন ৫২টি ভোট আর মর্গান সাহেব মাত্র ১৭টি। তারপর যতীন্দ্রমোহনকে মেয়রের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় ও তাঁকে মেয়রের আসনে বসবার জন্য অনুরোধ করা হয়। এইভাবেই সেদিন তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন কলিকাতা পৌরসভার দ্বিতীয় মেয়র।

এইভাবে সেদিন দেশপ্রিয়ের মস্তকে একে-একে গৌরবের ত্রিমুকুট (Tripple crown) সংস্থাপিত হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়ে একচল্লিশের কোঠায় এসেছে। এই যে তাঁর মাথায় দুর্লভ সম্মানের ত্রিমুকুট ন্যস্ত হয়েছিল, এই যে তিনি তিনটি দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদ সেদিন লাভ করেছিলেন, এটাই ছিল তাঁর প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিদর্শন এবং যতীন্দ্রমোহনের দেশসেবার পুরস্কার। সেদিন থেকে দেশবন্ধু-পরবর্তী বাংলায় 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন' এই নামটি নতুন নেতৃত্বের একটি শিরোনাম হিসাবে সমস্ত বাঙালীর দৃষ্টিপথে যেন সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সেইদিন থেকে 'দেশপ্রিয়' নামটি ঠিক সেইরকম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল যেমন একদিন উচ্চারিত হয়েছিল 'দেশবন্ধু' নামটি। সেদিন গান্ধী অসংশয়িত চিত্তে এই আশা করেছিলেন যে, দেশবন্ধুর মহিমান্বিত নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে যতীন্দ্রমোহন আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করবেন। বলা বাহুল্য, তাঁর কার্যদ্বারা যতীন্দ্রমোহন এর প্রমাণ রেখেছিলেন।

দেশবন্ধু মেয়র থাকাকালীন সময়ে পৌরসভার নবরূপ দানের জন্য যেসব কার্যক্রম গৃহীত হয় তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল পৌরসভার একটি নিজস্ব পত্রিকার প্রচলন করা। এরই ফলে আমরা

পেলাম 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'। এই নতুন পত্রিকাটি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেজন্য দেশবন্ধু একজন অভিজ্ঞ ও যোগ্য সাংবাদিককেই নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি এই গ্রন্থলেখকেরই শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীঅমল হোম। তাঁরই সম্পাদনার গুণে উত্তরকালে এই গেজেট ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মিউনিসিপ্যাল পত্রিকা হিসাবে সমাদৃত ও স্বীকৃত হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন কলকাতার দ্বিতীয় মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর গেজেটে একটি সুন্দর সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল 'OUR NEW MAYOR' এই শিরোনামায়।

এই প্রবন্ধে যতীন্দ্রমোহনের যোগ্যতা ও বিবিধ গুণাবলীর বর্ণনা করার পর লেখা হয়েছিল: 'লোকান্তরিত নেতার দায়িত্বভার তাঁর স্কন্ধেই নিপতিত হয়েছে। শুধু কলিকাতাবাসী নয়, সমগ্র দেশবাসী তাঁর উপরে ন্যস্ত এই দায়িত্ব যোগ্যরূপে সুসম্পাদনের জন্য তাঁর প্রতি চেয়ে রয়েছে। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তা সুসম্পন্ন করতে পারবেন, এ আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কলকাতার প্রধান নাগরিকরূপে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দাবি করবার অধিকারী। তিনি সর্বোচ্চ দেশপ্রেম ও নাগরিক সেবার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মেয়র-পদের গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।···তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্বাধিক জনমত-ভূয়িষ্ঠ রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁর নির্বাচনে সকলেই আনন্দিত।'

এই আনন্দের আরো একটি কারণ ছিল।

দলগত ক্ষমতা-বৃদ্ধি বা ব্যক্তিগত কার্যসিদ্ধির কথা দ্বিতীয় মেয়রের চিন্তায় আদৌ স্থান পায় নি এবং তা পায় নি বলেই একবার নয়, কলকাতার করদাতাগণ তাঁকে পাঁচ-পাঁচবার এই পদে নির্বাচিত করেছিলেন। ১৭ই জুলাই পৌর-প্রধানরূপে যতীন্দ্রমোহন যখন ঘোষণা করলেন: 'আমি ভেদ-বৈষম্য না করে কলকাতার করদাতাদের সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতি আন্তরিকভাবে যত্নবান হব এবং পৌরসভায় যেসব সমস্যার উদ্ভব হবে, আমি কলকাতার নাগরিক

হিসাবেই সেগুলোর সমাধানের চেষ্টা করব—রাজনৈতিকরূপে সে চেষ্টা কখনই করব না।'—তখন সকলেই বুঝতে পেরেছিল যে, তিনি দলগত স্বার্থ অপেক্ষা নাগরিকদের স্বার্থ, তাদের অভাব-অভিযোগকেই প্রাধান্য দেবেন। অক্ষরে অক্ষরে এই প্রতিশ্রুতি পালন করেই তিনি মেয়রের দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন। এবং তা করেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে চারবারের মধ্যে তিনবার তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়র-পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

॥ বারো ॥

যতীন্দ্রমোহনের গলায় তখন গৌরবের মালা থরে থরে বিদ্যমান। দেশবাসী পরিয়ে দিয়েছে তাঁর মাথায় ত্রিবিধ সম্মানের মুকুট। একই সময়ে একজন মানুষকে আমরা দেখলাম বঙ্গীয় স্বরাজ্য দলের সভাপতি, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও কর্পোরেশনের মেয়রের পদে। মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে এইরকম সম্মানলাভ সত্যিই অভাবনীয় ছিল এবং নিঃসন্দেহে তা সেদিন তাঁর জীবনে গৌরবান্বিত এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে দিয়েছিল। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুকে হারিয়ে বাঙালির জীবনে যে অপরিসীম শূন্যতা দেখা দিয়েছিল, তার অনেকখানি যেন তারা তাঁরই মতো একজন সর্বজনপ্রিয় নেতাকে পেয়ে পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিল। দেশবন্ধুর শূন্যস্থান কিছুকালের জন্য দেশপ্রিয়ই গ্রহণ করেছিলেন বলা চলে।

প্রসঙ্গত বলি, তিনি যখন মেয়র হলেন তখন যতীন্দ্রমোহনের গৌরবকে বিদ্রূপ করে সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' কাগজে একটি কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ত্রিমুকুট-শোভিত ও ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান মেয়রের সামনে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আছেন করদাতারা। কার্টুনটি তিনি খুব উপভোগ করেছিলেন এবং পরিহাস করে তাঁর এক সহকর্মীকে বলেছিলেন, 'একেবারে ত্রিশূলধারী মহাদেব বানিয়েছে আমাকে, জটা, সাপ, বাঘছাল আর ডমরুটা দিলেই একেবারে খাঁটি মহাদেব হতো।' যতীন্দ্রমোহন কম পরিহাসরসিক ছিলেন না। ছবিটি তিনি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন।

তাঁর সভাপতিত্বে প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনীতি কিভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং কাউন্সিলে স্বরাজ্য দল কি কি কাজ করেছিল, সে বিষয়ে আলোচনা পরে করছি। কলকাতার মেয়র হিসাবে তিনি পৌরসভার পরিচালনায় দেশবন্ধুর আদর্শ ও কর্মসূচীকে কতদূর রূপায়িত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই ইতিহাসটা আগে বলি।

মহানগরীর পৌরসভার প্রথম মেয়র হিসাবে দেশবন্ধুর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, শহরের প্রত্যেকটি নাগরিক যাতে কম দামে তরি-তরকারি, দুধ, মাছ প্রভৃতি পেতে পারে তার ব্যবস্থা করেন, ব্যবস্থা করেন যাতে দেশীয় প্রথায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত নাগরিকদের ছেলে-মেয়েরা বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা পেতে পারে। পৌরসভায় প্রথম ভাষণে তাঁর কর্মসূচীর কথা বলতে গিয়ে দেশবন্ধু বলেছিলেন :

'এক বৃহৎ জাতিগঠনের কাজের দায়িত্ব আমি গত দশ-পনের বছর যাবৎ গ্রহণ করেছি। সেই দায়িত্ব নিয়ে এই পৌরপ্রতিষ্ঠানে অনেক কাজ করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। আমার কর্মসূচীর লক্ষ্য কলকাতার নাগরিকবৃন্দের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন। পৌরপ্রতিষ্ঠানকে এর মেয়র হিসাবে যে বিভিন্ন কার্যতালিকা নিয়ে প্রবৃত্ত হতে আমি উপদেশ দেব তা এই : ১. অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ; ২. দরিদ্রের জন্য বিনা খরচে চিকিৎসা ; ৩. কম মূল্যে বিশুদ্ধ খাদ্য এবং খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ ; ৪. পরিশ্রুত ও অপরিশ্রুত জলের অধিকতর সরবরাহ ব্যবস্থা ; ৫. বস্তি এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উন্নত ধরনের ব্যবস্থা ; ৬. দরিদ্রের জন্য গৃহসংস্থান ; ৭. শহরতলির উন্নতি বিধান ; ৮. পরিবহণের অধিকতর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাপনা এবং ৯. স্বল্পব্যয়ে পৌর-শাসন ব্যবস্থায় অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন।'

এক কথায় দরিদ্রনারায়ণের সেবার মহৎ আদর্শকে সামনে রেখেই কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রথম মেয়র তাঁর কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিলেন। যে-সব দায়-দায়িত্বের মধ্য দিয়ে দেশবন্ধু সেদিন পৌর-প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন, দ্বিতীয় মেয়র হিসাবে

যতীন্দ্রমোহন যে সে-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি এবং তাঁর পূর্বসূরীর কার্যসূচীর রূপায়ণেই তিনি যে মনোনিবেশ করবেন, এটাই তো প্রত্যাশিত ছিল। দেশবন্ধু মেয়র হিসাবে তাঁর কার্যসূচীর সার্থক রূপায়ণের জন্য নির্ভর করেছিলেন কর্পোরেশনের প্রথম চীফ একজিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্রের উপর। কিন্তু তিনি তখন রেগুলেশন আইনের বন্দী। তাঁর মতো একজন দক্ষ কর্মকর্তার অভাব যতীন্দ্রমোহন নিশ্চয় বোধ করেছিলেন। ১৯২৪-এর পঁচিশে অক্টোবর তিন নম্বর রেগুলেশন আইনে পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মেয়রের আসন থেকে সেদিন দেশবন্ধু এই স্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন: 'If love of country is a crime, I am a criminal. If Mr. Subhas Chandra Bose is a criminal, I am a criminal—not only the Chief Executive Officer of the Corporation but the Mayor of the Corporation is equally guilty.'

যাই হোক, কলকাতা পৌরসভার দ্বিতীয় মেয়রও তাঁর সামনে দেশবন্ধুর আদর্শকে রেখে তাঁরই কর্মসূচীকে যথাযথভাবে রূপায়িত করার কাজে সেদিন আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দেশবন্ধুর পৌরসেবার আদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্যই তাঁকে সেদিন পৌরসভার সদস্যবৃন্দ ও মহানগরীর করদাতাগণের কাছে বিশেষভাবেই জনপ্রিয় করে তুলেছিল। সেইসঙ্গে ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়চিত্ততা। তাঁর সমসাময়িকদের কাছে শুনেছি, যতীন্দ্রমোহন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন। সেইসঙ্গে মিলেছিল নিরপেক্ষতা, উদারতা ও ধৈর্য। এইসব গুণের জন্য খুব অল্পদিনের মধ্যেই পৌরসভায় তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাই দেখা গিয়েছিল যে, তিনি যখন দ্বিতীয়বার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন তাঁর বিরুদ্ধ কাউন্সিলরগণ পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহনের প্রশংসা করেছিলেন, এমন কি পৌরসভার ইংরেজ কাউন্সিলরগণও তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

তিনি যখন প্রথমবার মেয়র-পদে নির্বাচিত হন তখনকার একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন চৌরঙ্গী অঞ্চলে বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত হোটেল-রেস্তোরাঁগুলিতে দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত ব্যক্তিদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। একদিন সন্ধ্যায় মেয়র যতীন্দ্রমোহন ফিরপোতে গিয়েছেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরিধান করে। তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হলো না। 'Customers are not allowed in Indian dresses.'—এই কথা তাঁকে বলা হয়েছিল। পরের দিন পৌরসভায় এসেই তিনি সেক্রেটারীকে ডেকে নির্দেশ দিলেন : 'Cancel the licence of Firpo's'. সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন হোটেলের মালিক এবং যতীন্দ্রমোহনকে ঢুকতে না দেওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এই ঘটনার পর থেকেই নিয়ম পাল্টে যায়।

যতীন্দ্রমোহন পাঁচবার মেয়র-পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রথমবার ১৯২৫-২৬ : দ্বিতীয়বার ১৯২৬-২৭ ; তৃতীয়বার ১৯২৭-২৮ ; চতুর্থবার ১৯২৯-৩০ আর পঞ্চমবার ১৯৩০-৩১। যখন শেষবার নির্বাচিত হন তখন তিনি কারাগারে। কর্পোরেশনের মেয়র-নির্বাচনের ইতিহাসে মেয়র যতীন্দ্রমোহন তাঁর জনপ্রিয়তার যে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তা আজ পর্যন্ত একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মহানগরীর আর কোনো মেয়রের ভাগ্যে এইরকম গৌরবলাভ ঘটে নি। নিঃসন্দেহে তিনি দেশপ্রিয় এবং সর্বজনপ্রিয় নেতা ছিলেন। সেদিন তাঁর এই আশ্চর্য জনপ্রিয়তার সঙ্গে একমাত্র দেশবন্ধুর জনপ্রিয়তাই তুলনীয় ছিল—যদি আদৌ কোনো তুলনার কথা বলতে হয়। যতীন্দ্রমোহনের অকালমৃত্যুর পরে বাংলার রাজনীতিতে আবার যখন শূন্যতা দেখা গিয়েছিল সেদিন সেই শূন্যস্থান যিনি পূর্ণ করেছিলেন সেই দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তাও বড়ো কম ছিল না। বস্তুত, ইতিহাস একদিন এই কথাই বলবে যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় ও দেশগৌরব —এই তিনজনের মতো এমন সর্বজনপ্রিয় নেতা আর কখনো দেখা যায় নি।

মেয়র হিসাবে যতীন্দ্রমোহন শুধু যে নিরপেক্ষতার পথ অনুসরণ করতেন তা নয়, তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে কখনো রাজনৈতিক মনোভাব দেখা যেত না। তাঁর লক্ষ্যই ছিল সর্ববিধ পৌরস্বার্থের উন্নয়ন ও করদাতাগণের সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যবিধান। যে পাঁচ বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে কর্পোরেশনের এতদূর উন্নতিবিধান হয়েছিল যে, তার ফলে সেদিন ভারতবর্ষের প্রধান মিউনিসিপ্যালিটিগুলির মধ্যে কলকাতা কর্পোরেশন সর্বোচ্চ স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর সময়কার একজন কাউন্সিলর যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে : 'He made the Calcutta Corporation a vigorous unit in an autonomous scheme of municipal Self-government.' পৌরপ্রতিষ্ঠানে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের যে স্বপ্ন একদিন সুরেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন এবং যে আশা নিয়ে তাঁর মন্ত্রিত্বকালে তিনি 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল'টি রচনা করে তারই উপর স্বায়ত্তশাসনের সৌধ নির্মাণের কল্পনা করেছিলেন, দেশবন্ধুর পরে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সুরেন্দ্রনাথের সেই স্বপ্ন আর সেই কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে এই ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। মেয়র হিসাবে তিনি সত্যিই একটি অনন্যলব্ধ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন—এই কথা লেখককে বলেছেন কলকাতার চতুর্থ মেয়র, স্বনামধন্য শ্রীসন্তোষকুমার বসু।

যতীন্দ্রমোহন যখন মেয়র হয়ে পৌরসভায় এলেন, তখন শহরে মিশনারিদের স্কুল ব্যতীত ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ছিল না। নবগঠিত কর্পোরেশন মেয়েদের জন্য শতকরা পঞ্চাশটি প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। প্রকৃত-পক্ষে কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হিসাবে দেশবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, দ্বিতীয় মেয়র তাকে অনেকখানি রূপায়িত করে তুলেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন তাঁর নেতার মতোই সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং হিন্দু-মুসলমানের প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শনে

আস্থাবান ছিলেন। প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে সুভাষচন্দ্র এই সম্পর্কে যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন: 'নবগঠিত পৌরসভাকে সময়ের সঙ্গে চলতে হবে। মুসলমান, খ্রীস্টান ও অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের দাবি সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে এবং পৌর শাসন-ব্যবস্থায় যাতে কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব বা অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেজন্য বিশেষ কোনো সম্প্রদায় থেকে কাউকে কর্মে নিযুক্ত করা হবে না।'

যতীন্দ্রমোহনের সময়ে শহরের জনস্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল ও দরিদ্র লোকের জন্য চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশুদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত সুলভ খাদ্য, বিশেষ করে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের প্রশ্নটিও বিবেচনা করা হয়েছিল। জলসরবরাহের উন্নতিও পরিলক্ষিত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল শহরের বস্তী এলাকাগুলিতে এবং এতকাল ধরে উপেক্ষিত এইসব অঞ্চল সম্পর্কে নতুন নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। বস্তুত, এই বস্তী উন্নয়নের ব্যাপারে মেয়র যতীন্দ্রমোহন যে যত্ন ও প্রয়াস সেদিন পেয়েছিলেন তা ছিল সর্বতোভাবেই প্রশংসনীয়। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত এইসব নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর বস্তীর মধ্যে মানুষগুলি কিভাবে জীবন-যাপন করত তা যতীন্দ্রমোহন স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে কর্পোরেশনের এক সভায় বলেছিলেন যে, 'মহানগরীর বুক থেকে এই নরককুণ্ডগুলি লুপ্ত করে দিতে না পারলে শহরের স্বাস্থ্যনৈতিক জীবন কোনোদিনই নিরাপদ হবে না। আসুন আমরা সবাই মিলে শহরকে বস্তীমুক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করি।'

তাঁর প্রথমবার মেয়র থাকাকালীন সময়ে যতীন্দ্রমোহন পৌরসভার কার্যসূচীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সাম্প্রদায়িক শান্তি ও ঐক্যের উপর। তিনি যখন দ্বিতীয়-বারের জন্য মেয়র-পদে নির্বাচিত হলেন তখন, অনেকের স্মরণ থাকতে পারে, বড়বাজার অঞ্চলে একটি ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা

দিয়েছিল। এই দাঙ্গার মূলে ছিল মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানর বিষয়টি। বিষয়টি খুবই উত্তপ্ত ছিল, সন্দেহ নেই। একদল আর্য-সমাজী বাদ্যসহকারে বড়বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। হ্যারিসন রোড (বর্তমান নাম মহাত্মা গান্ধী রোড) ও চিত্তরঞ্জন য্যাভিনিউ-এর সঙ্গমস্থলে শোভাযাত্রাটি যখন এসে পৌঁছল তখন মুসলমানগণের পক্ষ থেকে স্থানীয় মসজিদটির সামনে বাজনা বন্ধ করার কথা বলা হয়। এই হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সেই সময়ে উপদ্রুত অঞ্চলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মেয়র যতীন্দ্রমোহন নিজে উপস্থিত থেকে হাঙ্গামারত দেশবাসিগণকে যেভাবে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে সেদিন সাময়িকভাবে কর্পোরেশনের দৈনন্দিন কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হওয়ার দরুন শহরের রাজপথগুলি আবর্জনাস্তূপে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল কিভাবে তা পরিষ্কার করা সম্ভব? এইটিই ছিল মেয়রের সামনে একটি প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ। বলা বাহুল্য, যতীন্দ্রমোহন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়চিত্ততা ও কর্মতৎপরতার সঙ্গে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছিলেন। শহরের রাস্তাগুলি আবর্জনামুক্ত করবার জন্য তিনি আহ্বান জানালেন মহানগরীর তরুণদের কাছে। তাঁরা তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে এগিয়ে এসেছিলেন ও পৌরসভার কর্মচারীদের সঙ্গে কোমর বেঁধে ধাঙ্গরের কাজ করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নি। জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ তরুণদের এই উৎসাহের প্রশংসা করে কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় সেদিন মেয়র যতীন্দ্রমোহন বলেছিলেন :

'I desire on my behalf and on behalf of my colleagues in the Corporation, to express our

sincere appreciation of the public spirit shown by hordes of young men and other respectable gentlemen in various parts of District I and II in readily coming forward to assist the Corporation staff in attending to the conservancy of the area. They swept streets and flushed drains with their own hands and materially helped in the disposal of accumulated refuse and I recognise that, but for their splendid co-operation, it would have been impossible for the Corporation to cope with the work in such a short time.'

এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল পৌরসভায়। পনেরজন মুসলমান কাউন্সিলর একযোগে মেয়রের কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু মেয়র এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন না। অন্যদিকে শান্তি স্থাপনের জন্য তিনি যে প্রয়াস পেয়েছিলেন তার ফলে উগ্রপন্থী হিন্দুদের মধ্যে একটা বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন, দেশবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও ঐক্যস্থাপনে তাঁর প্রচেষ্টা সমানভাবেই চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং তাঁর অনুরোধে পদত্যাগকারী পনেরজন মুসলিম কাউন্সিলরদের মধ্যে বারোজন তাঁদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এই ঘটনায় তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ বিদেশী শাসক সম্প্রদায় আদৌ খুশি হলেন না; কারণ এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়েই তো তাঁরা দীর্ঘকাল যাবৎ 'divide and rule' নীতির অনুসরণ করে আসছিলেন।

১৯২৭, ২৬শে জানুয়ারি।

যতীন্দ্রমোহন তৃতীয়বারের জন্য মেয়র-পদে নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনই

জয়লাভ করেছিলেন। কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা দীর্ঘকাল যাবৎ বিনাবিচারে আটক হয়ে সুদূর মান্দালয় জেলে বন্দীজীবন যাপন করছেন। দেশবাসীর, বিশেষ করে কলকাতার নাগরিকবৃন্দের সেজন্য উদ্বেগের সীমা-পরিসীমা ছিল না। নাগরিকদের বেদনাকে ভাষা দিয়ে মেয়রের আসন থেকে সেদিন যতীন্দ্রমোহন যে বক্তৃতাটি করেছিলেন তা দেশবন্ধুর সেই বিখ্যাত বক্তৃতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যেটি তিনি মেয়র হিসাবে দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরেই। ভাবে, ভাষায় ও প্রকাশভঙ্গিতে যতীন্দ্রমোহনের এই বক্তৃতাটি, তাঁর বহু স্মরণীয় বক্তৃতার মধ্যে অন্যতমরূপে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। মেয়রের সেই বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো:

'I take my stand on the Bar of humanity. We, the people of India, have no power today either to coerce, or threaten or coax you. In the plentitude of your power listen for a moment to the still, small voice with you—'Release Subhas Chandra Bose.' The mute pangs of the whole of the people are throbbing out —'Release him'. The power that guides the State and prompts the individual dictates—'Release him. Release Subhas Chandra Bose.'··· We, as representatives of the citizens of Calcutta, ought to have only one feeling with regard to the condition of our Chief Executive Officer, Subhas Chandra Bose. This feeling is a feeling of anxiety.'

এই সভার কার্যবিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, মেয়র যতীন্দ্রমোহনের আবেগমথিত ও আন্তরিকতায় ঋদ্ধ এই বক্তৃতা শুনে সেদিন পৌরসভায় উপস্থিত সকল সদস্য যারপরনাই অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর হৃদয়-মনের ঔদার্য কতখানি ছিল, এই বক্তৃতাটি

যেন তারই একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। উত্তরকালে বাংলার এই দুই জনপ্রিয় নেতার মধ্যে যাঁরা বিভেদ সৃষ্টির জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা যদি যতীন্দ্রমোহনকে ভুল না বুঝতেন, তাহলে বাংলার রাজনীতি এই দুই নেতার নেতৃত্বদ্বারা পরিচালিত হয়ে এক নবরূপ ধারণ করত। কিন্তু সে কাহিনী এখানে নয়। সেদিন মেয়র যতীন্দ্রমোহন 'Release Subhas Chandra' এই দাবি তুলেছিলেন বলেই না পরবর্তীকালে তা দেশব্যাপী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও তা বিশেষভাবেই জোরালো হয়ে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্রকে পৌরসভার কাজে ফিরে পাবার জন্য তিনি বিশেষভাবেই আগ্রহান্বিত ছিলেন, কারণ মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে প্রধান কর্মকর্তারূপে সুভাষচন্দ্র পৌরসভার শাসন-ব্যবস্থায় যে নবজীবনের সঞ্চার করেছিলেন তা আজো বিস্ময়কর হয়ে আছে। যতীন্দ্রমোহনের সময় ঐ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল শ্রী জে. সি. মুখার্জির উপর। তিনিও দীর্ঘকাল যাবৎ পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা-রূপে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯২৮ সালের এপ্রিলে চতুর্থবারের জন্য মেয়র নির্বাচন হয়। ইতিপূর্বে তিন-তিনবার ঐ পদ অলঙ্কৃত করে যতীন্দ্রমোহন যেভাবে পৌরসভার ক্ষমতা ও গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন তাতে তিনি যদি চতুর্থবারের জন্য প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে অভিলাষ করতেন তাহলে ১৯২৮ সালেও তিনি মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না। এর কয়েকমাস পূর্বেই দীর্ঘ চার বৎসরকাল বন্দী জীবন যাপন করার পর সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। স্বভাবতই সকলের দৃষ্টি তখন তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়েছিল এবং তিনিই তখন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অনেকেই এবার সুভাষচন্দ্রকে মেয়র হিসাবে দেখতে চাইলেন।

যতীন্দ্রমোহনও অন্তরের সঙ্গে তা সমর্থন করলেন।

শুধু মৌখিক সমর্থন নয়; সুভাষচন্দ্র যাতে এইবার মেয়র-পদে নির্বাচিত হন সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস-

বিরোধী কাউন্সিলরগণ মেয়রপদের জন্য বিজয়কুমার বসুকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করালেন। তখন পৌরসভায় কংগ্রেসের ভোটের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে মেয়র-পদে কংগ্রেসপ্রার্থীর জয়লাভ অনিশ্চিত ছিল। নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মিস্টার ফেলপস ও চারুচন্দ্র বিশ্বাস—এই দু'জন কাউন্সিলর এক টুকরো কাগজে লিখে যতীন্দ্রমোহনকে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি সুভাষচন্দ্রের নামই প্রস্তাব করতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রের পরাজয় ঘটার ফলে পৌরসভা কংগ্রেসের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। অবশ্য নব-নির্বাচিত মেয়র বিজয়কুমার বসু পৌরসভায় যতীন্দ্রমোহনের অনুসৃত কংগ্রেস নীতিই অনুসরণ করেছিলেন।

তারপর ১৯২৯ সালে যখন পরবর্তী মেয়র-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সকলেই অনুভব করলেন যে, পৌরসভায় কংগ্রেসকে অবশ্যই তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে। মুসলিম কাউন্সিলরগণ যতীন্দ্র-মোহনকে আবার নির্বাচনে দাঁড়াবার অনুরোধ করলেন এবং কংগ্রেস থেকে তাঁকেই মেয়র-পদের জন্য প্রার্থীরূপে মনোনয়ন দেওয়া হলো। যেদিন কর্পোরেশনের সভায় এই মনোনয়নের বিষয়টি উত্থাপিত হয়, সেদিন ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ, অল্ডার-ম্যান শরৎচন্দ্র বসু। তিনি যখন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে বললেন সুভাষচন্দ্রই তখন যতীন্দ্রমোহনের নামটি প্রস্তাব করেন ও জনৈক মুসলিম কাউন্সিলর তা সমর্থন করেন। যতীন্দ্রমোহন বিনা বাধায় চতুর্থবারের জন্য মেয়র নির্বাচিত হলেন।

তাঁর প্রথমবার মেয়র হওয়ার সময় পৌরসভায় যে স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস পরিলক্ষিত হয়েছিল, চতুর্থবার ঐ পদে নির্বাচিত হওয়ার সময় ঠিক সেইরকম উল্লাসই দেখা গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র বসু স্বয়ং নব-নির্বাচিত মেয়রকে মাল্যবিভূষিত করেন ও চারদিক থেকেই তখন তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি হয়। সেদিনও পৌরসভার ভিতরে ও বাহিরে বিপুল

জনসমাবেশ হয়েছিল এই মেয়র-নির্বাচন উপলক্ষে। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, নির্বাচনের পর কাউন্সিল চেম্বার থেকে যখন নব-নির্বাচিত মেয়রকে তাঁর কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেই জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি করে উঠেছিল। পৌরসভার জীবনে সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। সেদিন তাঁর প্রতি নাগরিকবৃন্দের ও করদাতাগণের সমর্থন দেখে যতীন্দ্রমোহন যারপরনাই অভিভূত হয়ে মেয়রের আসন থেকে বলেছিলেন : 'I take it that this uncontested election means, first that you have confidence in me and secondly you have confidence in the programme set before us in this Corporation, by our late leader, the first Mayor of this city, Deshbandhu Chittaranjan Das.'

এবারও যতীন্দ্রমোহন পৌরসভায় দেশবন্ধুর কর্মসূচীকেই সফল করে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং নানা দিক দিয়ে নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে বিশেষভাবে তৎপর হয়েছিলেন। এই কাজ তিনি করেছিলেন সকল দলের সদস্যদের সহযোগিতায়। শ্বেতাঙ্গ সদস্যগণও এই বিষয়ে তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। এইখানেই তো দেশপ্রিয়ের জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৯৩০, ২৯শে এপ্রিল।

কর্পোরেশন তথা যতীন্দ্রমোহনের জীবনে একটি অবিস্মরণীয় তারিখ। দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে তখন ঘটেছে এক পট-পরিবর্তন—শুরু হয়েছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন-অমান্য আন্দোলন। সেই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন এবং তার ফলে তিনি দণ্ডিত ও কারারুদ্ধ হন। যতীন্দ্রমোহন তখন জেলে যখন কর্পোরেশনে মেয়র-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার নেতৃস্থানীয়দের অনেকেই তখন আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে

কারান্তরালে দিন যাপন করছিলেন। লর্ড আরউইন তখন বড়লাট এবং তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এই পটভূমিকাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল মেয়র-নির্বাচন।

দেশপ্রিয় তখন খ্যাতির শিখরদেশে।

সারা ভারতবর্ষেই তখন তাঁর নাম।

তিনিই তখন বাংলার অবিসম্বাদী কংগ্রেস নেতা।

এবারও তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয় ও বিনা বাধায় তিনি পঞ্চম-বারের জন্য মেয়র-পদে নির্বাচিত হন। এই সময়ে শ্রীসন্তোষকুমার বসু ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। কলকাতার নাগরিকবৃন্দ এবং এর করদাতাগণের হৃদয়-মন তিনি যে কতখানি জয় করেছিলেন আপন স্বভাবসিদ্ধ চারিত্রিক মহত্ত্বের জন্য, এই নির্বাচনের ভিতর দিয়েই তা অভিব্যক্ত হয়েছিল যথাযথভাবে।

পৌরসভার মেয়ররূপে পৌরজনের উন্নতিবিধান ছাড়াও, যতীন্দ্র-মোহন আরো একটি মহৎ কাজের সূচনা করে গিয়েছিলেন। সেটি হলো তাঁর প্রিয়তম নেতা দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থায় অগ্রণী হওয়া। দেশবন্ধুর মৃত্যুর দু'বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতি-দিবসে কেওড়াতলা শ্মশানে একটি স্মৃতিমন্দির (এইখানেই দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল) স্থাপনের কথা হয়। প্রথমে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, কিন্তু তাঁরা যখন খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে অসমর্থ হলেন তখন যতীন্দ্রমোহন উদ্যোগী হয়ে সকল দলের প্রতিনিধিস্থানীয়দের নিয়ে 'দেশবন্ধু মেমোরিয়াল কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেন ও শ্রীসন্তোষকুমার বসুকে এর সম্পাদক নিযুক্ত করেন।

এই স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন যতীন্দ্রমোহন। এই উপলক্ষে কেওড়াতলা শ্মশানে আয়োজিত এক সুপবিত্র ও ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন: 'আমার পরলোকগত নেতার স্মৃতির প্রতি আমার ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করবার এই সুযোগ লাভ করে

আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। দেশের কাজে তিলে তিলে আত্মদান করে তিনি অকালমৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। দেশসেবায় লাভ-ক্ষতির বিবেচনা তাঁর অন্তরে কোনোদিন স্থান পায় নি। যখনি সেবার আহ্বান এসেছে, তখনি তিনি যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অসুবিধা, বাধা-বিঘ্ন প্রভৃতি কখনো তাঁকে কর্তব্য পথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশসেবায় ও দেশের হিতচিন্তায় বিরত হন নি।'

দেশপ্রিয় সম্পর্কেও আমরা কি ঠিক এই কথাগুলি প্রয়োগ করতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। কারণ এই দুই লোককান্ত নেতার জীবন পর্যালোচনা করলে পরে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয় দুজনেই যেন একই ধাঁচের মানুষ ছিলেন—একই মানস-প্রকৃতি নিয়ে তাঁরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর দু'জনে ঠিক একইভাবে তাঁদের জীবনকে দেশের কাজে আহুতিস্বরূপ নিবেদন করে দেশসেবার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন।

॥ তেরো ॥

মেয়র যতীন্দ্রমোহনের কথা বললাম।

এইবার স্বরাজ্য দলপতি যতীন্দ্রমোহনের কথা।

তার আগে কানপুর কংগ্রেসের কথা একটু বলা দরকার। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু। যতীন্দ্রমোহন এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সম্পর্কে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। বাংলার বুকে তখন অর্ডিনান্সের ষ্টীম রোলার চলছে। এই বেঙ্গল অর্ডিনান্সের বলে বিনা বিচারে বাংলার দেশপ্রেমিক বহু সন্তানকে তখন নির্বাসনে অথবা বিভিন্ন জেলে বন্দী-জীবন যাপন করতে হচ্ছিল অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে। এর প্রতিবাদও হয়েছে, কিন্তু বিশেষ কোনো প্রতিকার হয় নি। বাংলা থেকে আগত প্রতিনিধি হিসাবে যতীন্দ্রমোহন তাই কানপুর কংগ্রেসের সুযোগ গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি জানতেন কংগ্রেস একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং গান্ধীর নেতৃত্বে এর প্রতিষ্ঠা ও গৌরব দুই-ই তখন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে যা আলোচিত হবে, ভারত সরকারকে তার গুরুত্ব দিতেই হবে।

কানপুর কংগ্রেসে বেঙ্গল অর্ডিনান্স ও সেই অর্ডিনান্সের বলে আটক বন্দীদের দুর্দশা সম্পর্কে বক্তৃতা করতে উঠে সেদিন যতীন্দ্রমোহন বলেছিলেন: 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স গোপনে সৃষ্টি হয়েছে এবং গভীর রাত্রির অন্ধকারে একান্ত নির্মমভাবে সেই অর্ডিনান্স অনুসারে কাজ করা হচ্ছে।

একশোজন যুবককে গভীর রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা এখন কারাজীবনের দুর্বহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন। এইসব হতভাগ্য বন্দীর দুর্দশা ও যন্ত্রণা অবর্ণনীয়। শীতের রাতে অনাবৃত দেহে রেলযোগে তাঁদের সকলকে নানা স্থানে প্রেরণ করা হয়েছিল। পুলিশি তল্লাশের ফলে তাঁদের কারো বাড়িতে একটি বোমা, একটি কার্তুজ বা একটি রিভলভারও পাওয়া যায় নি। কোনো বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র দমনের জন্য এইসব যুবকদের গ্রেপ্তার করা হয় নি। তাঁদের এইভাবে গ্রেপ্তার করা এবং এইভাবে তাঁদের বিনা বিচারে আটক রাখার একটি মাত্র উদ্দেশ্যই আমি দেখতে পাই—স্বরাজ্য দলের কাজে ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাজে বিঘ্ন উৎপাদন করাই এই অর্ডিনান্সের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়।'

এ যেন দেশপ্রিয়ের কণ্ঠে দেশবন্ধুর কণ্ঠস্বর!

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯২৬ সালের সূচনাকাল থেকেই যতীন্দ্রমোহন এলগিন রোডে ২০।৪ নম্বর বাড়িতে উঠে আসেন ও তাঁর জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলি এখানেই অতিবাহিত হয়েছিল। ভাগ্যকুলের রায়েরা তখন এই অঞ্চলে নতুন যে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করিয়েছিলেন, তারই একটি তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে কলকাতায় তাঁর আবাসস্থল ছিল ময়রা স্ট্রীট। সেই বাড়িটি ছিল অল্প পরিসরের; এখন প্রয়োজন হলো অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিসরের একটি আবাসস্থল। একদা ভবানীপুরে ১৪৮ নম্বর রসা রোডে দেশবন্ধুর বাড়িটি যেমন স্বরাজ আশ্রমে রূপান্তরিত হয়েছিল ও নবীন বাংলার রাজনৈতিক পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল, ১৯২৬ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত ২০।৪ নম্বর এলগিন রোডে যতীন্দ্রমোহনের আবাসভবনটিও ঠিক তেমনি মর্যাদা লাভ করেছিল। এইখানেই আসতেন ভারতের নেতৃবৃন্দ, মিলিত হতেন তাঁরা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে, চলত কত বিষয়ের গোপন ও প্রকাশ্য আলোচনা। দেশপ্রিয়ের গৌরবময় রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতি-বিজড়িত এই ভবনটি একটি জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে

গণ্য হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, তাঁর স্মৃতিরক্ষা সম্পর্কে বাঙালি আজো উদাসীন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে বাংলার স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন দেশপ্রিয়। তিনিই এখন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের সম্পাদক পদে গৃহীত হলেন নলিনীরঞ্জন সরকার আর প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক পূর্বে যিনি ছিলেন তিনিই—সাতকড়িপতি রায়—রইলেন। ১৯২৫ সালে কাউন্সিলের যে শরৎকালীন অধিবেশন হয় তাতে দলপতির নির্দেশে দু'জন বিশিষ্ট রাজবন্দীর—সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও অনিলবরণ রায়—মুক্তির প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। দেশবন্ধুর জীবিতকালেই কাউন্সিলের এক অধিবেশনে অর্ডিনান্স বিলটি যখন আলোচিত হয় যতীন্দ্রমোহন তখন এই প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থকাম হয়েছিলেন। এইবার স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে তাঁদের মুক্তির প্রস্তাবটি আবার উত্থিত হয়, আলোচনা হয় ও শেষ পর্যন্ত ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। কিন্তু সরকার কাউন্সিলে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করলেন না। দেশবন্ধু মিথ্যা বলেন নি যে, 'Councils under the new Reforms are but sham and mockery.' এরই স্বরূপ উদ্ঘাটন করবার জন্যই তো তিনি আইনসভায় প্রবেশ করেছিলেন এবং এর অসারতা চূড়ান্তভাবেই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

কিন্তু কাউন্সিলের পরবর্তী অধিবেশনে (নভেম্বর, ১৯২৫) স্বরাজ্য দল কয়েকটি প্রস্তাবে বিশেষভাবেই জয়লাভ করলেন। প্রস্তাবগুলির মধ্যে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিল, শ্রীহট্ট একত্রীকরণ বিল ও বালি ব্রীজ নির্মাণ বিল—এই তিনটি বিলই প্রধান ছিল। বিল তিনটির আলোচনা শেষে যখন ভোট গ্রহণ করা হয় তখন দেখা গেল যে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই স্বরাজ্য দল জয়লাভ করেছেন। কিন্তু এই অধিবেশনে স্বরাজ্য দলের কৃতিত্ব সমধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়েছিল যখন দলের পক্ষ থেকে একটি censure motion বা সরকারের

নিন্দা-সূচক প্রস্তাব আনা হয়। রাজনৈতিক বন্দিগণের প্রতি তখন ভীষণ দুর্ব্যবহার চলছিল এবং সংবাদপত্রে তার বিবরণ পাঠ করে জনসাধারণের মনে দেখা দেয় দারুণ বিক্ষোভ সরকারী কার্যনীতির বিরুদ্ধে। যতীন্দ্রমোহন স্বয়ং এই প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করতে হলে কাউন্সিলের পূর্ব-নির্ধারিত কার্যাবলী স্থগিত রাখতে হয়। সুতরাং যতীন্দ্রমোহনকে সর্বাগ্রে কাউন্সিলের কার্যাবলী স্থগিত রাখবার প্রস্তাব নিয়ে আসতে হলো। এই প্রস্তাব আনতে গিয়ে সেদিন তিনি একটি চমৎকার বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন :

'It is not that we have tabled this motion for political consideration. It is a humanitarian cry, so far as this particular cry is concerned. We brought forward this motion because we know these detenues were taken from one place to another in the middle of a cold wintry night without any clothings to cover the upper part of their body···I do therefore charge the Government that they are guilty of in-human treatment towards these prisoners. I charge the Government with mal-administration of the Act and the ill-treatment of the prisoners after detention without trial.'

দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য যে ব্যথা, যে বেদনা একদা দেশবন্ধু তাঁর হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতেন, দেশপ্রিয়ও ঠিক সেই ব্যথা, সেই বেদনা তাঁর হৃদয়ের মধ্যে সেদিন অনুভব করেছিলেন। তাই না তিনি এইরকম তেজোদৃপ্ত কথা আইনসভায় দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিলেন। আলোচনার পরে প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভোট গৃহীত হয় ; কংগ্রেস পক্ষে ৫৮টি ও সরকার পক্ষে ৫০টি ভোট প্রদত্ত হয়।

তখন বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট স্বরাজ্য দলের জয় ঘোষণা করেন। দেশপ্রিয়ের নেতৃত্বে কাউন্সিলে স্বরাজ্য দলের পর-পর এইরকম কয়েকটি বিষয়ে জয়লাভ একদিকে যেমন দলের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করল অন্যদিকে তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত করল যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বকে।

অনাস্থার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া যে কোনো স্বাধীন দেশের সরকারের পক্ষে যেমন নিন্দার কথা তেমনি বিশেষ নিন্দার কথা একটি পরাধীন দেশের সরকারের পক্ষেও। এমন কি এর ফলে মন্ত্রিসভা পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ তখনো স্বাধীন হয় নি; দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্রও তখন ছিল না। কাজেই আইনসভায় অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হলেও শাসন-ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটল না। কিন্তু বিরোধী দল অর্থাৎ কংগ্রেস জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন আরো বেশি করে লাভ করল।

১৯২৬ সালের শরৎকালে নতুন নির্বাচন হলো।

স্বরাজ্য দল এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে সকল প্রদেশেই জয়লাভ করলেন। এই সময়ে দলের নির্বাচনী প্রচারকার্য পরিচালনা করবার জন্য যতীন্দ্রমোহনকে বাংলা ও ভারতের প্রায় সর্বত্রই পরিভ্রমণ করতে হয়েছিল—যেমন এর আগে দ্বিতীয় নির্বাচনের সময়ে করতে হয়েছিল দেশবন্ধুকে। এবারের নির্বাচনেও যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ালেন।

এই নির্বাচনী সফরের সময়ে দেশপ্রিয় যখন নবদ্বীপে আসেন, লেখক তখন কলেজের ছাত্র এবং সেই সময়েই তিনি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। নবদ্বীপে তিনি যে কয়েক ঘণ্টাকাল অবস্থান করেছিলেন তখন তাঁর পরিচর্যার ভার লেখকের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। 'তোমরা ছাত্ররা, দেশের কাজে আরো বেশি সংখ্যায় যোগদান করো—এই আমি দেখতে চাই।' সেদিন তাঁর মুখে এই কথা শুনে নবদ্বীপের ছাত্রবৃন্দ খুব উৎসাহিত বোধ করেছিল।

সেই স্মৃতি আজো লেখকের মানসপটে বিদ্যমান রয়েছে। সেই প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলাম দেশবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহনের যোগ্যতা দেশপ্রিয়ের কতখানি ছিল।

'The dynamic Bengali leader.'

ভারতের রাজনীতিতে এইভাবেই যতীন্দ্রমোহনের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সেদিন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে দলীয় অনৈক্য সত্ত্বেও, যতীন্দ্রমোহন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছিলেন; স্বরাজ্য দল এবারও কাউন্সিলে এলো সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে যদিও আগের তুলনায় তেমন বর্ণাঢ্য ছিল না। এই নতুন কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়। তিনি সরকারের বেতনভোগী ছিলেন; সরকারই তাঁকে ঐ পদে নিযুক্ত করেছিলেন—কাউন্সিলের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত সভাপতি তিনি ছিলেন না। এই সময়কার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য।

সরকার-বিরোধী দলের নেতাকে (Opposition leader) সম্মান প্রদর্শন করা একটি চিরাচরিত পরিষদীয় রীতি। আবার সেই নেতা যদি এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের লীডার হন, যে-দল ভোটাধিক্যে সরকার পক্ষকে (Treasury Bench) পরাজিত করতে সক্ষম তবে তাঁর প্রতিষ্ঠা আরো বেশি হয়ে থাকে। ১৮ই ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে উত্তর চট্টগ্রামের জনৈক প্রতিনিধি একটি প্রস্তাব সম্পর্কে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলেন। সভাপতি তাঁকে অনুমতি দিলেন না—তিনি উক্ত সভ্যকর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন। বিক্ষুব্ধ সদস্যটি তখন এর প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন: 'It is the arbitrary use of the power of the President.'

সম্ভবত মন্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে সভাপতির কর্ণগোচর হয় নি। তথাপি যতটুকু তিনি শুনতে পেলেন তাতে তাঁর মনে হলো যে, তাঁর নিরপেক্ষতার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। তখন তিনি সেই সদস্যটিকে

সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন : 'Will the Hon'ble member please repeat what he said ?' সদস্যটি কিন্তু নিরুত্তর রইলেন ; সভাপতি পুনরায় আদেশ করেন। তখন সদস্য মহোদয় তাঁর মন্তব্যের পুনরুল্লেখ করলেন।

—'Will the Hon'ble member please withdraw it ?

—No Sir, I am not going to withdraw it.

—Then you will have to leave the Council chamber at once and you must not participate in the proceedings of the day.

—You can say whatever you like.'

অতঃপর সদস্যটি পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন।

সঙ্গে সঙ্গে পরিষদ কক্ষে বিরোধী সভ্যদের কণ্ঠে উঠল সমবেত চীৎকার ধ্বনি—'Shame, shame.'

ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের কণ্ঠস্বরই সভাপতি শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে তাঁকে বলেন : 'Dr. Kumud Shankar Roy has done wrong by shouting shame, shame. Let him withdraw it at once.

—I refuse to do so, Sir.

—Then I order you to leave the Council room.'

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ও ডাঃ কুমুদশঙ্কর দু'জনই ছিলেন স্বরাজ্য দলের সদস্য। দলের দু'জন সদস্যকে এইভাবে বহিষ্কৃত হতে দেখে দলপতি যতীন্দ্রমোহন তখন আর নীরব থাকতে পারলেন না। সভাপতির এই উদ্ধত আচরণ যেন পরোক্ষভাবে তাঁর দলেরই অপমান। তিনি তখন উঠে দাঁড়ালেন ও জলদগম্ভীর স্বরে বললেন :

'I do protest against this sort of childish action of the President in turning out member after member for crying out shame. I think to cry out shame is a

legitimate act and this is done even in the House of Commons. I do object to this sort of conduct on the part of the Chair.

—Mr. Sengupta, will you please withdraw the remark 'childish'?

—I wont do so.

—Then I order you to leave the Council room at once.'

যতীন্দ্রমোহন তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে পরিষদ কক্ষ পরিত্যাগ করলেন। নাটকের যবনিকা পতন কিন্তু এখানেই ঘটল না। তখন পরিষদ কক্ষে উঠল কলগুঞ্জন ও সৃষ্টি হলো একটি বিশৃঙ্খলার পরিবেশ। নানাজন নানা কথা বলতে থাকে। স্বরাজ্য দলের আর একজন সদস্য তখনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: 'I say that the conduct of the President has not only been childish but worse than childish.'

সভাপতি যেন ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। এইবারও তিনি এই সদস্যটিকে বহিষ্কৃত করে দিলেন। স্বরাজ্য দলের অপর এক সদস্য তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: 'The President's conduct is almost insane.' আবার সেই একই দৃশ্যের অবতারণা হয়। সভাপতির এই অশিষ্ট ও অশোভন আচরণের প্রতিবাদে সকল স্বরাজী সদস্য, এমন কি স্বতন্ত্র সদস্যগণও একে একে সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

এখানেও কিন্তু নাটকের পরিসমাপ্তি নয়। পরের দিনই স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে একযোগে পাঁচ-পাঁচটি অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল। সেই পাঁচটি প্রস্তাবের দাবি কিন্তু একই ছিল—সভাপতিকে বিতাড়িত করা হোক। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মেদিনীপুরের জননায়ক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রমুখ পাঁচজন স্বরাজী সদস্য পরপর

পাঁচটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলেন। ভোটে অবশ্য প্রস্তাবগুলি টেকেনি। না টিকুক, সভাপতি যে তাঁর জীবনে একটি বিলক্ষণ শিক্ষালাভ করেছিলেন সেদিন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রাজবন্দীদের প্রসঙ্গে এবার আসা যাক।

এটাই ছিল সেদিনকার বাংলার একটা গুরুতর বিষয়। শুধু বাংলা নয়, ভারতের সর্বত্রই তখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। যতীন্দ্রমোহন ও স্বরাজ্য দলের সদস্যগণ কাউন্সিলে বার বার এই প্রশ্নটি তুলে রাজবন্দীদের মুক্তিদানের প্রস্তাব এনেছিলেন। ভোটাধিক্যে সে প্রস্তাব পাশও হয়েছিল; কিন্তু ফলপ্রসূ হয় নি। সরকার গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রদর্শন করতে যেন বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন সেদিন। মুক্তিদান করা দূরে থাকুক, শঙ্কিত সরকার সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট রাজবন্দীকে একেবারে সুদূর ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে প্রেরণ করেন।

সেই সময়ে মান্দালয় জেলের রাজবন্দীরা একবার অনশন ধর্মঘট করেন। বন্দীরা বাণীর অর্চনা করবেন এবং এজন্য তাঁরা অতিরিক্ত অর্থ দাবি করলেন। সরকার সে দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন। এর প্রতিবাদে তাঁরা অনশন ধর্মঘট করে বসলেন। যখন এই সংবাদ কলকাতায় এসে পৌঁছল তখন সারা বাংলাদেশে সে কী উত্তেজনা। বাঙালির অন্তরের বেদনা অনুভব করলেন যতীন্দ্রমোহন। তিনি তৎক্ষণাৎ সুভাষচন্দ্র প্রমুখ রাজবন্দীর কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে অনশন ধর্মঘট পরিত্যাগ করার জন্য তাঁদের সকলকে অনুরোধ করলেন। কথিত আছে, সেই সময়ে একটি ব্যক্তিগত পত্রে তিনি তাঁর প্রিয়তম সহকর্মী সুভাষচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন: 'আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আপনাদের অভিযোগ দূর করার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করব না। মুক্তির দাবি তো আমরা সমানভাবে করেই চলেছি। আশার কথা এই যে, আমাদের এই দাবি এখন সর্বভারতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে। বলতে কি সমস্ত দেশ এখন আপনাদের পিছনে।

এমন অবস্থায় অনশন ত্যাগ করবার জন্য আমি, আপনার একজন সহকর্মী হিসাবে, আপনাকে এই অনুরোধ করে পাঠালাম। অনুরোধ সকলকেই জানালাম।'

যতীন্দ্রমোহনের এই অনুরোধ বৃথা হয় নি।

মান্দালয় জেলের রাজবন্দীরা অনশন-ধর্মঘট সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং সেটা তাঁরা করেছিলেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করেই। সুভাষচন্দ্রের একটি পত্রে তাঁর এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন। যতীন্দ্রমোহন নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। এখানে কাউন্সিলে ও রাজধানী দিল্লীর রাষ্ট্রপরিষদে তিনি যে আলোচনা ও আন্দোলন চালিয়েছিলেন তারই ফলে বন্দীদের অভিযোগ দূর করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। দলের নেতা হিসাবে এটা বড়ো কম কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল না। দেশপ্রিয় যে যোগ্যতার সঙ্গেই দেশবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

স্বরাজ্য দল আইনসভায় প্রবেশ করেছিলেন সুখ্যাত নতুন শাসন-সংস্কারের অসারতা প্রমাণ করবার জন্য ও দ্বৈতশাসন (Dyarchy) অচল করে দেওয়ার জন্য। তাঁদের এই দু'টি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছিল; কিন্তু পরিষদীয় রাজনীতি যে দেশকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে না, সে বিষয়ে কংগ্রেসের নেতাদের মনে কোনো সংশয় ছিল না। দেশের লোক আরো বুঝল যে, পরিষদ কক্ষে জয়লাভ করলেও, সে যুদ্ধ বাগ্‌যুদ্ধ মাত্র। বিরোধী পক্ষের প্রস্তাব পাশ হয়, কিন্তু তা কার্যে পরিণত করার ইচ্ছা সরকারের মধ্যে ক্বচিৎ দেখা যায়।

এই অবস্থায় কানপুর কংগ্রেসে (১৯২৫) এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হলো যে, আইনসভা অধিকার ও সভাকক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে

বাগ্‌যুদ্ধে নেতাদের মূল্যবান সময়েরই অপচয় ঘটছে। তার পরিবর্তে গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করলে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হবে ও জাতি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে। অতএব স্বরাজ্য দল যেন অবিলম্বে আইনসভার ব্যর্থ সংগ্রাম পরিত্যাগ করে গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করে। কানপুর কংগ্রেসের এই প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দিল্লী অধিবেশনে সমর্থিত ও গৃহীত হয়। এর ফলে, ভারতের সর্বত্র স্বরাজ্য দল আইনসভা পরিত্যাগ করতে সংকল্প করলেন। কাউন্সিল পরিত্যাগ করার প্রস্তাবটি যখন কানপুর কংগ্রেসে বিষয়-নির্বাচনী সভায় উপস্থাপিত হয় তখন একজন গান্ধী-পন্থী 'নো-চেঞ্জার' নেতাকে এই মন্তব্যটি করতে শোনা গিয়েছিল : 'Entry into Councils only creates illusions and differences while non-cooperation seeks to draw the public towards popular institutions, diverting their attention from the British Government and its institutions. Non-cooperation will awaken the constructive strength of the people whereas Council entry will divert them from the main goal of Swaraj.'

আগেই বলেছি, যতীন্দ্রমোহন কানপুর কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই মন্তব্যটির যাথার্থ্য স্বীকার করলেও একটি মূল্যবান উক্তি করেছিলেন সেদিন। তিনি বলেছিলেন, 'Illusion no doubt, but is it not the illusion of the reality as well as the reality of the illusion ?' পরবর্তীকালে যখন তাঁর এক সহকর্মী কানপুরে তাঁর এই বিখ্যাত উক্তিটির নিহিতার্থ জানতে চান, তখন দেশপ্রিয় পরিহাসের ভঙ্গীতে তাঁকে বলেছিলেন—'কাউন্সিলে যাওয়াটা আমার কাছে মনে হতো যেন বাস্তবতার ইন্দ্রজাল, আর ইন্দ্রজালের বাস্তবতা—দুই-ই।' ইতিহাসের বিচারে কথাটি কিন্তু খাঁটি সত্য। যতীন্দ্রমোহন ক্রান্তদর্শী নেতা ছিলেন।

১৯২৬, ১৫ই মার্চ।

কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে আইনসভার স্বরাজী সদস্যগণ কাউন্সিল পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাংলাদেশে স্বরাজ্য দলের দুই নেতার—দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয়—আইনসভায় প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের জনসাধারণ এখানে শুধু চমকপ্রদ গলাবাজি শোনে নি, সেইসঙ্গে তারা প্রত্যক্ষ করল যে, মণ্টেগু-চেমস-ফোর্ড শাসন-সংস্কার যেমন ভুয়া তেমনি অসার—এর দ্বারা দেশের লোকের হাতে সত্যিকারের কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয় নি। আর প্রত্যক্ষ করল দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার সমাধি। কাউন্সিল থেকে চলে আসার পূর্বে স্বরাজ্য দলপতি যতীন্দ্রমোহন এখানে তাঁর যে সর্বশেষ বক্তৃতাটি করেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন :

'মিঃ প্রেসিডেণ্ট, কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে এই কাউন্সিলের স্বরাজ্য দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণ আজ এইস্থান পরিত্যাগ করবেন। দু'বছর আগে যখন আমরা আইনসভায় প্রবেশ করি, তখন সরকার লোকমতের সাহায্যে শাসননীতি পরিচালনা করছিলেন বলে যে ভান করতেন তা দূর করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা দ্বৈতশাসন ধ্বংস করেছি।···কিন্তু যখন আমরা অধিকতর সংখ্যায় ও অধিকতর শক্তিলাভ করে এখানে প্রত্যাবর্তন করব, তখন যদি দেখি আমলাতন্ত্র পূর্বের মতোই অনমনীয় ও স্বেচ্ছাচারী এবং দেশবাসীর স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার বিরোধী, তাহলে জাতি অন্যপ্রকার ও অধিকতর ফলপ্রদ, অথচ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত পথ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না—এ আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। এই পথই নিরস্ত্র, পদদলিত ও নির্যাতিত জাতির শেষ পথ।'

॥ চৌদ্দ ॥

'জাতি অন্যপ্রকার ও অধিকতর ফলপ্রদ, অথচ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত পথ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না। এই পথই নিরস্ত্র, পদদলিত ও নির্যাতিত জাতির শেষ পথ।'

ক্রান্তদর্শী নেতা যতীন্দ্রমোহনের পক্ষেই এমন কথা বলা সম্ভব ছিল সেদিন।

সেই প্রত্যাশিত পথে জাতির পদক্ষেপ তখন ক্রমেই যেন অনিবার্য হয়ে উঠছিল এবং তার খুব বেশি বিলম্বও আর ছিল না। আমরা এইবার দেখতে পাব যে, সেই পথের বার্তা নিয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে গান্ধী যখন আবার একটি নতুন তরঙ্গ তুললেন, রচনা করলেন আর একটি নতুন আবর্তের, তখন সেই তরঙ্গের মধ্যে, সেই আবর্তের মধ্যে আর সকল মুক্তিসংগ্রামীদের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনও কেমন নির্ভীকভাবে ঝাঁপ দিলেন। এইবার আমরা তাঁর জীবনের সেই অধ্যায়ের কথা বলব। ইতিহাসের গতিপথ অনুসরণ করেই তা বলতে হবে। ইতিহাসের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেখতে হবে, জীবনের সঙ্গে ইতিহাসকে। যতীন্দ্রমোহনের জীবন গান্ধীযুগের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। বরং ছিল ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট—তাঁর চরিতালোচনার সময়ে এই কথাটি আমাদের বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে।

কৃষ্ণনগর কনফারেন্স। ১৯২৬, ২২শে মে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন বসল কৃষ্ণনগরে এই

তারিখে। সভাপতি—বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগেই দেখা গেল যে, সভাপতি তাঁর মুদ্রিত অভিভাষণটি সভায় বিলি করেছেন। তাঁর এই ভাষণে শাসমল একটি আপত্তি-জনক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, যাঁরা মনে-প্রাণে বিপ্লবী ও যাঁরা অহিংসায় বিশ্বাসী নন তাঁদের পক্ষে কংগ্রেসের সভ্য হওয়া সঙ্গত নয়, কারণ কংগ্রেস হলো স্বাধীনতা লাভের জন্য অহিংস কর্মীদের প্রতিষ্ঠান। শাসমলের এই অভিমত সভায় দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করল ও সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁর ভাষণ থেকে এই অংশটুকুর অপসারণ দাবি করলেন। তিনি তখন বললেন, এ তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত এবং কনফারেন্সের সভাপতি হিসাবে এমন কথা বলবার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে। সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে বহু বিপ্লবী ছিলেন; তাঁরা কিছুতেই শাসমলের এই উক্তি মেনে নিতে পারলেন না এবং বললেন, যদি ইহা প্রত্যাহৃত না হয়, তাহলে তাঁরা সভা পণ্ড করে দেবেন।

যতীন্দ্রমোহন এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সরোজিনী নাইডু, যিনি তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই দুই দলের মধ্যে একটা মীমাংসার চেষ্টা করলেন। শাসমল তখন তাঁর ভাষণ থেকে বিপ্লবীদের সম্পর্কিত ঐ অংশটুকু বাদ দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু ভাষণটি পাঠ করবার সময়ে যেইমাত্র তিনি বললেন যে, যদিও আপত্তিকর অংশটুকু তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত তথাপি এটা তাঁকে বাদ দেবার জন্য বলা হয়েছে, অমনি সভায় দেখা দিল তুমুল চাঞ্চল্য এবং শাসমলকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। তিনি তখন বললেন, যেহেতু সভাপতি হিসাবে তাঁর উপরে সভ্যদের বিশ্বাস নেই, সেইহেতু তিনি পদত্যাগ করছেন। এই বলে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে আসেন ও তাঁর জেলার প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসেন। তখন যতীন্দ্রমোহন সভাপতিকে তাঁর ভাষণটি শেষ করতে অনুরোধ করলেন এবং আরো

বললেন যে, সভাপতির অভিমতের সঙ্গে যদি সভ্যদের মতের অমিল থাকে তাহলে তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই সভায় এমন তুমুল বিশৃঙ্খলা দেখা দিল যে, যতীন্দ্রমোহনকে আসন পরিগ্রহ করতে হয়। তখন সরোজিনী নাইডু উঠে দাঁড়ালেন ও উত্তেজিত শ্রোতৃবৃন্দকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। তারপর তিনি বললেন যে, শাসমল তাঁর ভাষণ থেকে যখন আপত্তিকর অংশটুকু বাদ দিয়েছেন তখন তা ক্ষমা চাওয়ারই সামিল হয়েছে। আপনারা গণতন্ত্র-বিরোধী কাজ করবেন না কিংবা অসৌজন্য প্রকাশ করবেন না। অতঃপর তিনি নিজে গিয়ে শাসমলের হাত ধরে তাঁকে মঞ্চের উপরে এনে বসালেন ও তাঁর ভাষণটি শেষ করতে অনুরোধ করলেন। শৃঙ্খলার সঙ্গে সভার বাকী কাজ শেষ হলো ও সকলেই সন্তুষ্ট হলেন।

কিন্তু ব্যাপারটি মিটল না।

প্রতিনিধিদের চাপে পরের দিন বিষয়-নির্বাচনী সভায় যতীন্দ্র-মোহনকে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনতে হলো; সেই প্রস্তাবে বলা হলো যে, এই সম্মেলন সভাপতির সঙ্গে একমত নয়। তখন শাসমল যেন অপমানিত বোধ করেই সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যান। অবস্থার প্রতিকারের জন্য তখন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটা জরুরী সভা হয়, কিন্তু সেই সভায় সভ্যগণ কোনো সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারলেন না। ফলে সভার কাজ স্থগিত রাখতে হয়। ইতোমধ্যে বিরোধী দল শাসমলের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরিবর্তে অপর একজনকে কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সেইসঙ্গে তাঁরা আরো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই প্রস্তাবে তাঁরা ১৯২৫ সালে সম্পাদিত হিন্দু-মুসলিম চুক্তিটি বর্জন করেন।

বাংলার সমকালীন রাজনীতিতে এই কৃষ্ণনগর কনফারেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এখান থেকেই যে দলীয় ভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি

হয় তা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে ও যার পরিণতি শেষপর্যন্ত সুভাষ-সেনগুপ্ত বিরোধে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে-কাহিনী যথাস্থানে বলব। কৃষ্ণনগরের ঘটনার পরেই ১৩ই জুন তারিখে যতীন্দ্রমোহনকে বি. পি. সি. সি.-র একটা বিশেষ সভা ডাকতে হলো। দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলিম চুক্তির তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সমর্থক। তাই দেখা গেল যে, এই বিশেষ সভা ডাকার সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন সভ্যদের উদ্দেশে লিখিত এক পত্রে সুস্পষ্টভাবেই বললেন : 'Let me it make clear to you that in spite of the Hindu-Muslim trouble thc Hindu-Muslim Pact of 1925 has to be maintained and the B. P. C. C. cannot reject it.' কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য তখন এই চুক্তি ধ্বংস করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই বিশেষ সভায় কৃষ্ণনগর কনফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবগুলি সব বাতিল করে দেওয়া হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের এই বিশেষ সভা সেদিন যতীন্দ্রমোহনের রাজনৈতিক জীবনে দিক্-পরিবর্তন সূচিত করে দিয়েছিল। প্রদেশ কংগ্রেস তখন তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই তিনটি দলের মধ্যে প্রথমটি ছিল সেনগুপ্ত-সমর্থক, দ্বিতীয়টি সেনগুপ্ত-বিরোধী ও তৃতীয় দলটি ছিল নিরপেক্ষ। শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন ললিতমোহন দাস।

সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এক উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যেই সেদিন প্রদেশ কংগ্রেসের এই বিশেষ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিরণশঙ্কর রায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন যে, শাসমলের স্থলে যিনি কৃষ্ণনগর কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন তিনি কোনো প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন না, অতএব সম্মিলনীর কার্য পরিচালনায় তাঁর কোনো অধিকার ছিল না। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই সভায় হিন্দু-মুসলিম চুক্তির বিষয়টিও পুনরালোচিত হয় ও সকলেই এর অনুমোদন করেন। অপর একটি প্রস্তাবে প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান কার্যকরী সমিতি ভেঙে দেওয়া হয় ও নতুন সমিতি গঠনের

ক্ষমতা যতীন্দ্রমোহনকে দেওয়া হয়। তিনিই তখন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। তখন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিমত জ্ঞাপন করে শরৎচন্দ্র বসু ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যান। তদনুসারে একটি নতুন কমিটি গঠিত হয়। নবগঠিত এই নতুন কমিটিতে জিলা কংগ্রেস কমিটিসমূহ থেকে ত্রিশজন সদস্যকে নেওয়া হলো আর বাকী ত্রিশজন সদস্য মনোনীত করার ক্ষমতা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিকে দেওয়া হলো।

প্রদেশ কংগ্রেসের এই বিশেষ সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী (স্বনামধন্য সাংবাদিক পি. কে. চক্রবর্তী) 'Contraband carriers' এই শিরোনামায় একটি সম্পাদকীয় রচনা করেন। 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার কর্ণধার তখন ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু এবং তাঁরই নির্দেশক্রমে গভীর রাত্রিতে ঐ সম্পাদকীয়টি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ঘটনার শেষ এখানেই ছিল না। জনশ্রুতি ছিল যে, 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক যতীন্দ্রমোহনের একজন বিশেষ সমর্থক। অতএব পরের দিনই পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর এক সভায় প্রফুল্লকুমার অপসৃত হন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন শ্যামসুন্দরের 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল না এবং 'সার্ভেণ্ট' উঠে যাওয়ার মূলে যে ইতিহাস তা যেমন বেদনাদায়ক তেমনি লজ্জাকর। নো-চেঞ্জার দলের নেতা শ্যামসুন্দরের প্রতিপত্তি বিনষ্ট করতে ও তাঁর 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকা বিনষ্ট করতে প্রো-চেঞ্জার দলের নেতা ও তাঁর অনুগামীরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। প্রখ্যাত সাংবাদিক মৃণালকান্তি বসুর মুখে শুনেছি যে, 'সার্ভেণ্টে'র উপর দেশবন্ধুর বিশেষ রাগ ছিল, তাই এই কাগজের বহু যোগ্য কর্মচারীকে তিনি ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় স্থান দিয়েছিলেন। 'সার্ভেণ্ট' উঠে গেলে বসুমতীর স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ইনি শ্যামসুন্দরের ছাত্র ছিলেন) তাঁর মাস্টারমশাইকে সম্পাদক করে 'দি ডেলী বসুমতী' নামে একটি ইংরেজী দৈনিক বের

করেছিলেন সেইসময়ে। পি. কে. চক্রবর্তীর সেই সম্পাদকীয়টি এই ইংরেজী বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

দেশবন্ধুর জীবিতকালেই বাংলার রাজনীতিতে ভাগ্যবান যে পাঁচজন 'পঞ্চবীর' ('Big Five') বা 'পঞ্চপ্রধান' নামে খ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের নাম হলো: বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও নলিনীরঞ্জন সরকার। যতীন্দ্রমোহন যখন প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন কমিটি গঠন করলেন তখন এই পঞ্চবীরের মধ্যে চারজন ও সুরেশচন্দ্র দাস একযোগে পদত্যাগ করেন। বাংলার রাজনীতিতে এটাই ছিল সেদিন দলগত কলহের প্রত্যাশিত পরিণতি। তারপর পঞ্চবীরের স্বাক্ষরিত একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। এই ইস্তাহারটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে যতীন্দ্রমোহনের কার্যনীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। তখন যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে নীরব থাকা অসম্ভব ছিল। তিনিও একটি পাণ্টা ইস্তাহার প্রকাশ করলেন ও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত প্রত্যেকটি অভিযোগ খণ্ডন করলেন। অতএব যতীন্দ্রমোহন ও পঞ্চবীরের বিরোধ বিভিন্ন সংবাদপত্রের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। এই প্রসঙ্গে সেদিন (২৬ জুন, ১৯২৬) 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় দেশপ্রিয়কে যেরকম জঘন্যভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল তা হয়ত অনেকের স্মরণ থাকতে পারে। দুই দলের মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। আজ, এই সুদূরকালের ব্যবধানে, সেই ইস্তাহার দুটি আমরা যখন পাঠ করি তখন দেখতে পাই যে, দুই দলের মধ্যে আদর্শগত কোনো বিভেদ ছিল না। কিন্তু অনৈক্যের বিষক্রিয়া বড়ো সাংঘাতিক, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের মধ্যে। সেই অনৈক্যের ফলেই দুই দল পরস্পারের দোষ দেখাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। এই অনৈক্যের মূলে ছিল হিন্দু-মুসলিম চুক্তি। এখানে উল্লেখ্য যে, হাঙ্গামা সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহন এই চুক্তিতে আস্থাবান ছিলেন।

যতীন্দ্রমোহনের জীবিতকাল পর্যন্ত প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনীতিতে

এই অনৈক্য, কলহ ও বিরোধ সমানভাবেই বিদ্যমান ছিল। আজ এই কথা বলবার দিন এসেছে যে, দেশপ্রিয়ের শোচনীয় অকালমৃত্যুর কারণই ছিল এই দলীয় বিরোধ ও কলহ। তথাপি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বিপক্ষ দলের সঙ্গে একাধিকবার মীমাংসা করলেও যতীন্দ্রমোহন কখনো তাঁর বিবেক বিসর্জন দেন নি বা ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে আপোস করেন নি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ ও সরল প্রকৃতিই ছিল এর প্রতিবন্ধক। বলতে গেলে তখন থেকেই বাংলার রাজনীতিতে দেশপ্রিয়কে একরকম নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল। তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি এইখানেই।

১৯২৮।

ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর।

দেশপ্রিয়ের জীবনেও এটি কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

দেশের সর্বত্রই নতুন উৎসাহ ও নতুন উদ্দীপনা।

জনসাধারণের মধ্যেও দেখা গেল এগিয়ে চলার আকাঙ্ক্ষা।

দু'বছর আগে যে ভারতবর্ষ ছিল নির্জীব ও অবসন্ন, এখন সেই ভারতবর্ষ হয়ে উঠল সজীব ও সক্রিয়—এক অবরুদ্ধ শক্তির চেতনায় জাগ্রত, স্পন্দিত। শ্রমিক আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছে। সাত-আট বছর আগে স্থাপিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এরই মধ্যে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এর সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কৃষকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে প্রাণচাঞ্চল্য। উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলে নতুন প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে কৃষকরা একের পর এক প্রতিবাদ-সভা করতে লাগল। ওদিকে গুজরাটে ভূমিকর বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে সরকারের সঙ্গে কৃষকদের ব্যাপক সংঘর্ষ দেখা দিল। এই সংঘর্ষই পরবর্তীকালে ভারতের 'লৌহমানব' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে

বারদৌলি সত্যাগ্রহরূপে দেখা দিয়েছিল। প্রচণ্ড দমননীতির মুখে কংগ্রেসের আদর্শে পরিচালিত সেই সত্যাগ্রহের ফলে সরকার জমির খাজনা কমাতে বাধ্য হয়েছিলেন। বারদৌলিতে কৃষকের জয় ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামে এক তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল সেদিন। বারদৌলিতে সর্দার প্যাটেল সত্যিই ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন যা দেখে স্বয়ং গান্ধী পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন এবং এজন্য তাঁকে তিনি অভিনন্দিত করেছিলেন। এক কথায় বারদৌলির কৃষকদের সাফল্য-মণ্ডিত এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন কংগ্রেসের মধ্যে এক নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছিল।

শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনের সঙ্গে দেখা দিয়েছে যুব-আন্দোলন। দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কংগ্রেস ইয়ুথ লীগ বা কংগ্রেস যুব-সমিতি। দেশের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হয় যুব-সম্মিলন; এই সম্মিলনগুলিতে সর্বত্রই তখনকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা আলোচিত হতো। দেশের যুবশক্তি বলিষ্ঠকণ্ঠে দাবী জানাল—বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই।

তবে উনিশশো আটাশের প্রধান ঘটনা ছিল দুটি :

সাইমন কমিশন বয়কট আর সর্বদলীয় সম্মিলন।

এই ঘটনা দুটির আবর্তে পড়ে ভারতের অবরুদ্ধ শক্তি যেন এক নতুন উন্মাদনায় দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, মহাদেবের জটা-জালের মধ্যে অবরুদ্ধ গঙ্গার ধারা যেমনভাবে একদিন ছড়িয়ে পড়েছিল ঠিক সেইভাবে। প্রথমটার কথা আগে বলি। ১৯১৯ সালে ভারতে প্রবর্তিত হয় নতুন শাসন-সংস্কার—মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মস। এতে তখন বলা হয়েছিল, দশ বছর পরে নতুন শাসনতন্ত্রের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা নির্ধারণ ও প্রয়োজনানুরূপ ভারতবাসীর হাতে আরো ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টি অনুসন্ধান করবার জন্য পার্লামেণ্ট থেকে একটি কমিশন নিযুক্ত করা হবে। কংগ্রেস নতুন শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করেছিল, কাজেই গান্ধী প্রমুখ নেতৃবর্গ এই

কমিশন সম্পর্কে বিশেষ কোনো উৎসাহ বোধ করেন নি, কিংবা এর প্রয়োজনীয়তা বা প্রচলিত শাসনতন্ত্রের উপযোগিতা নির্ধারণের ক্ষমতাও স্বীকার করেন নি। লর্ড আরউইন তখন ভারতের বড়লাট। ১৯২৭ সালের ৮ই নভেম্বর পার্লামেন্টের নির্দেশে লর্ড আরউইন এই কমিশন নিয়োগ ঘোষণা করলেন। দেখা গেল একজন ভারত-বাসীকেও এই কমিশনের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় নি। স্যর জন সাইমন ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি।

এই ঘোষণার ফল যা হবার তাই হলো। কংগ্রেস এই কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত করল এবং ভারতের সর্বত্র নির্দেশ চলে গেল 'বয়কট সাইমন কমিশন,'—সাইমন কমিশন বর্জন কর। ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮। সাইমন কমিশন এসে পৌঁছলেন বোম্বাইতে। প্রতিপালিত হয় ভারতব্যাপী হরতাল। সর্বত্র ধ্বনি ওঠে—'গো ব্যাক সাইমন কমিশন'—সাইমন কমিশন ফিরে যাও। এখানে উল্লেখ্য যে, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে সেদিন দেশব্যাপী যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে সর্বপ্রধান অংশ গ্রহণ করেন য়ুরোপ থেকে সদ্য প্রত্যাগত সুভাষচন্দ্র বসু। কাজ-কারবার সব অচল। দোকানপাট বন্ধ। মাদ্রাজে গুলী চলল। কলকাতায় পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ হলো। রাজধানী দিল্লীতেও তুমুল ছাত্র-বিক্ষোভ। বিক্ষোভ চরমে উঠল লাহোরে। সেখানে এক বিরাট জনতার (সে জনতা শান্তিপূর্ণ ছিল) পুরোভাগে ছিলেন লাজপৎ রায় ও মদনমোহন মালব্য। এক ইংরেজ পুলিশের বেটনের আঘাত লাগে লাজপৎ রায়ের বুকের উপরে। মারাত্মক সেই আঘাতের ফলে সতেরো দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সারা ভারত। বিক্ষুব্ধ হয় ভারতের বিশাল জনসঙ্ঘ। বিহার, উত্তরপ্রদেশ সর্বত্রই কমিশনকে বয়কট করা হয়। বিশেষ করে লাহোরের শোচনীয় ঘটনার পর বিরূপ অভ্যর্থনা যেন আরো বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল। অবশেষে তদন্তকার্যে ব্যর্থ হয়ে কমিশন ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। উদ্ধত ব্রিটিশ রাজশক্তির মহিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এই বছরের দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল লক্ষ্ণৌতে All Parties Conference বা সর্বদল সম্মিলন। উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও এই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান জননায়ক মতিলাল নেহেরু। গান্ধী উপস্থিত ছিলেন না। এইখানেই ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের একটি শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করার দায়িত্ব অর্পিত হয় একটি কমিটির উপর। মতিলাল নেহেরু ছিলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের উপায় নিবারণ করাই ছিল এই সর্বদল সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৯২৮, ৭ই এপ্রিল।

বসিরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন।

দেশবাসী দেশপ্রিয়কে এই সম্মিলনের সভাপতির পদে নির্বাচিত করল। সভাপতির ভাষণে যতীন্দ্রমোহন দুটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করলেন, যথা—হিন্দু-মুসলিম সমস্যা ও সাইমন কমিশন। তাঁর সেই অভিভাষণ থেকে কিছু অংশ এখানে উৎকলিত হলো। তিনি বলেছিলেন :

'যদিও হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি এবং যদিও জাতির এই সন্ধিক্ষণে ইহা অতীতের বিষয়ীভূত হয়েছে, তথাপি এর ফলে সরকার যথেষ্টই সুযোগ লাভ করেছেন। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের ফলে ইংরেজরা ভারতে প্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন এবং কঠোরহস্তেই শাসন দণ্ড পরিচালনা করছেন। সেই উদ্দেশ্যে সাইমন কমিশন অসময়ে ভারতে প্রেরিত হয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে সাইমন কমিশন যেন ভারতের শাসন-শৃঙ্খল আরো কঠিনতর করবার সুযোগ লাভ করেন—এত তাড়াতাড়ি কমিশন পাঠাবার কারণ ইহাই।

'একটি তৃতীয় পক্ষ আমাদের জন্মভূমির শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ

করবেন কেন? আমাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করবার এই প্রগল্‌ভ দাবি আমরা সহ্য করব কেন?···আমরা আমাদের জন্মগত অধিকারে কারো হস্তক্ষেপ সহ্য করব না। আমরা এই দাম্ভিক জাতিকে জানাতে চাই যে, আমরা তাঁদেরকে উপেক্ষা করছি। দেশের সর্বত্র কমিশন-বর্জনের জন্য কংগ্রেসের আদেশ, অন্য সব রাজনৈতিক দলের আদেশ প্রতিধ্বনিত হোক।'

এই পটভূমিকাতেই ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসল। এখানে দীর্ঘকাল কংগ্রেসের কোনো অধিবেশন হয় নি। সেই ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়েছিল। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদান করতে গিয়ে যতীন্দ্রমোহন ওয়ার্কিং কমিটির কাছে বাংলার পক্ষ থেকে এই অধিবেশনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন। সেই সময়ে তিনি মাদ্রাজে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশ কংগ্রেস তাঁকে বাংলার জননায়ক হিসাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে অনুরোধ করে তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। তেমনি স্থানীয় পৌরসভাও তাঁকে কলকাতার মেয়র হিসাবে সম্বর্ধিত করেন ও রৌপ্যাধারে একটি মানপত্র তাঁর হাতে অর্পণ করেন।

সুখের বিষয় কলকাতা কংগ্রেসের সময়ে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে কোনোরকম অনৈক্য বা মতবিরোধ ছিল না। সকলেই একযোগে যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে কংগ্রেসের এই অধিবেশন যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস নানাভাবেই স্মরণীয় হয়ে আছে। সভাপতি—মতিলাল নেহেরু; অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত; প্রধান সম্পাদক—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়; প্রদর্শনী সম্পাদক—নলিনী-রঞ্জন সরকার; আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক—সুভাষচন্দ্র বসু।

এ যেন অষ্টবজ্র সম্মেলন। এ ছাড়া, নেতৃস্থানীয় আরো অনেকেই কোনো না কোনোরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করে কংগ্রেসের এই অধিবেশনকে এমনভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন যা সমাগত প্রতিনিধিদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মহানগরী কলকাতায় এই উপলক্ষে যেন একটা নতুন প্রাণোন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়েছিল।

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বাংলাদেশে কী গভীর শোকের ছায়াপাত হয়েছে এবং সেই শোকের ক্ষত যে আজও শুকায় নি, তা মতিলাল নেহেরু বিশেষভাবেই অবগত ছিলেন। তাই তিনি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানকে বিশেষভাবেই অনুরোধ করে পাঠালেন যেন তাঁর আগমনের পর তাঁকে অভ্যর্থনা করার কিছুমাত্র সমারোহ প্রদর্শিত না হয়। কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত সভাপতিকে রাজোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন—সমগ্র বাঙালি জাতিই সেদিন জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতিকে তাঁর যোগ্য অভ্যর্থনা জানাতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল বললেই হয়। শেষ পর্যন্ত সভাপতিকে সম্মত হতে হয়। পার্ক সার্কাস ময়দানের বিস্তৃত স্থানে কংগ্রেসের এই স্মরণীয় অধিবেশন বসেছিল। ব্যবস্থার নিপুণতা, শিল্প-প্রদর্শনীর বিরাটত্ব, সুউচ্চ ও প্রশস্ত কংগ্রেস-প্যাণ্ডাল, বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আর সামরিক কায়দায় তাদের কুচকাওয়াজ এবং পরিপূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত সেই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (G.O.C.) সুভাষচন্দ্র বসু—সবকিছু মিলিয়ে কলকাতা কংগ্রেস ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন বিরাট ও বর্ণাঢ্য অধিবেশনে এর আগে দেখা যায় নি। পরেও নয়।

কিন্তু বিরাটত্বই শুধু এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না। কংগ্রেসের এই অধিবেশন স্মরণীয় হয়ে আছে একটি বিশেষ প্রস্তাবের জন্য। 'কংগ্রেসের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা'—এই মর্মে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সে-প্রস্তাব অনেকের মনে সেদিন রীতিমতো চমকের সৃষ্টি করেছিল। সুভাষচন্দ্রের এই

প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছিলেন জওহরলাল নেহেরু। তখন থেকেই ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে জাগ্রত যৌবনশক্তির প্রতীক হিসাবে দুটি নাম—সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল— ভারতের জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

এই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি নিয়ে কলকাতা কংগ্রেসে প্রবল মতভেদ দেখা দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল তাঁর আত্মকথাতে লিখেছেন : 'অবশেষে কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব এইভাবে রচনা করা হলো যে, কংগ্রেস সর্বদল সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে জানিয়ে দেবেন, এক বছরের মধ্যে নেহেরু কমিটি-রচিত শাসনতন্ত্র গৃহীত না হলে কংগ্রেস আবার স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করবে। সরকারকে দেওয়া হলো সৌজন্যপূর্ণ একটি চরমপত্র। আমি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছিলাম।'

কলকাতা কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানরূপে যতীন্দ্রমোহন একটি চমৎকার ভাষণ দিয়েছিলেন। নানা দিক দিয়েই তাঁর এই ভাষণটি উল্লেখযোগ্য ছিল—এর ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল দেশপ্রেমের মহান আদর্শ। দেশাত্মবোধ যেন শতধারায় প্রবাহিত হয়েছিল দেশপ্রিয়ের এই বক্তৃতাটির মধ্য দিয়ে এবং উপস্থিত সকলের অন্তরকেই তা গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। দেশাত্মবোধের সেই প্রাণমন্ত্র আজো যেন কালের প্রান্তর অতিক্রম করে আমাদের কানে ঝঙ্কৃত হয়। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে বাঙালি বহুদিন এমন জীবন্ত, এমন প্রাণবন্ত বক্তৃতা শোনে নি যেমন তারা সেদিন শুনেছিল, ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা কংগ্রেসের সেই স্মরণীয় অধিবেশনে। যতীন্দ্রমোহনের এই বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছিলেন :

'India's freedom must be wrought within her own borders by her own children. The first condition therefore is self-assertion of the nation as a

whole, united action with a unity of purpose. We have got to mobilise our own forces, close our ranks, stand on our own legs. For this, radical transformation of our national life is indispensable. And to begin with, there should be a thorough self-examination.

'Be earnest. Let freedom be the thought of your day and the dream of your night. Let the sons and daughters of India gather under her national standard, and with 'Equality and Fraternity' as their battle-cry. March onward, unceasingly, tirelessly, towards the freer life of a Free India; undaunted by calamity, unmoved by the wrath and repression of the powers that be. Do not despair. Marshall all your forces, and no power on earth can resist your triumphant march to the promised land of the Great India of the future, an India welded and federated into a powerful nation.'

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে এমন উদ্দীপনাময়ী ভাষণ, এমন আবেগ-উত্তপ্ত কথা বাঙালি শোনে নি। নেতা তাঁকেই বলে যিনি স্বজাতির প্রাণ-স্পন্দন তাঁর নিজের হৃদয়ে অনুভব করে তাকে উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন এবং যিনি তাদের হৃদয়ে অগ্নিময় প্রেরণার সঞ্চার করতে পারেন। দেশপ্রিয় এই শ্রেণীর নেতাই ছিলেন।

সেদিন তাঁর ভাষণের মধ্যে আত্ম-সমীক্ষার প্রশ্নটি তুলে দেশপ্রিয় সমকালীন রাজনীতিতে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন দূরদর্শী নেতা ছিলেন। এইখানেই ছিল তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

পনেরো

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে বাংলার রাজনীতিতে যে দলীয় কলহ ও বিরোধের সূচনা হয়েছিল তার প্রভাব থেকে এই প্রদেশের নেতৃবর্গ কোনোদিন মুক্ত হতে পারেন নি এবং এর ফলেই সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলার সুনাম অনেকদিন হ্রাস পেয়েছিল ও বাঙালির প্রাধান্য অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। এটা বাংলার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে এবং বাঙালির পক্ষে কম অগৌরবের কথা নয়। তাই দেখা গেল যে, কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই এর আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্রকে কেন্দ্র করে সেই পুরাতন দলীয় কলহ ও বিরোধ আবার আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই সময়ে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা উঠে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বসুগোষ্ঠীর নতুন ইংরেজি কাগজ 'লিবার্টি'। সেই কাগজে যতীন্দ্রমোহনকে পুনরায় তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়।

ঠিক এই সময়ে (১৯২৯) তিনি তাঁর একখানি নিজস্ব পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করলেন। প্রকাশিত হলো দেশপ্রিয়ের নিজস্ব ইংরেজি দৈনিক 'য়্যাড্‌ভান্‌স্‌'। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই বছরে বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, দলীয় ভেদ-বিভেদ যেন ভীষণভাবে আত্মপ্রকাশ করে জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি পর্যন্ত বাংলার এই গ্লানিময় রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে এই

বিষয়টি তদন্ত করবার জন্য একজন প্রতিনিধিকে বাংলায় প্রেরণ করা হয়েছিল। এখানকার একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠিকর্তৃক তিনি অপমানিত হয়ে ফিরে গেলে পরে ওয়ার্কিং কমিটি আবার পাঠালেন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা এম. এস. য়্যানেকে। তিনি এসে প্রথমে রাজনৈতিক কলহের মীমাংসার সূত্র খুঁজে বের করবার চেষ্টা করলেন। তাঁর সেই চেষ্টা যখন ফলবতী হলো না তখন তিনি বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করেন ও ওয়ার্কিং কমিটির কাছে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যে রূপায়িত হওয়ার আগে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নব পর্যায়ের আন্দোলন—আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এই আন্দোলনের ফলে আত্মকলহ কিছুদিনের মতো স্তিমিত থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই সময়ে প্রদেশ কংগ্রেস দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদে আসীন ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সেক্রেটারি হিসাবে কিরণশঙ্কর রায় তখন সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হয়ে উঠেছেন। ইনি পূর্বে ছিলেন দেশপ্রিয়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে অন্যতম এবং অনেক বিষয়ে তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ। তখন থেকেই সুভাষ-সেনগুপ্ত বিরোধের সূত্রপাত। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব লাভ করে সুভাষচন্দ্র তখন কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন। এই বিরোধের কথা পরে আরো আলোচনা করা হবে।

বিপক্ষ দল যতই দেশপ্রিয়-বিরোধী হোক না কেন, ১৯২৯ সালের মেয়র নির্বাচনের সময়ে যতীন্দ্রমোহনের জনপ্রিয়তা নতুন করে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভিন্ন কংগ্রেস পক্ষ থেকে যদি আর কাউকেপ্রার্থী দাঁড় করান যায়, অনেকের মনে আশঙ্কা হলো তাহলে ১৯২৮ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া বিচিত্র ছিল না। সে বছর কংগ্রেস প্রার্থী সুভাষচন্দ্র পরাজিত হয়েছিলেন। একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯২৯ সালের এপ্রিলের শেষভাগে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই চট্টগ্রামে জিলা সম্মেলনের অধিবেশন হওয়ার কথা প্রচারিত হলো। জিলা কংগ্রেসের সভাপতি তখন ছিলেন যতীন্দ্রমোহন আর সহ-সভাপতি ছিলেন তাঁরই সহকর্মী মহিমচন্দ্র দাস ও ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী: কিন্তু প্রকৃত কর্তৃত্ব তখন ছিল স্থানীয় যুবকদের হাতে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক সূর্যকুমার সেন (মাস্টারদা) ছিলেন তখন জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আর কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রভৃতি। জিলা সম্মিলনীতে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি করার জন্য এঁরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। কলকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করে সুভাষচন্দ্র তখন দেশের যুব-সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছেন। জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তখন যতীন্দ্রমোহন। একরকম তাঁর অজ্ঞাতসারেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এমন কি এ বিষয়ে তাঁর কোনো পরামর্শ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় নি। গ্রহণ করলে তিনি নিশ্চয়ই আপত্তি করতেন না—এই কথাটা চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের তরুণ কর্তাব্যক্তিগণ যদি বুঝতেন তাহলে এমন একটা অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা হতো কিনা সন্দেহ।

একদিন সকালবেলা।

এলগিন রোডের বাড়িতে দেশপ্রিয়ের অনুগত দু'জন কংগ্রেস কর্মী এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।—কী ব্যাপার? এত সকালে তোমরা কি মনে করে? জিজ্ঞাসা করেন যতীন্দ্রমোহন।

—চিটাগং কনফারেন্সের সভাপতি কে হয়েছে, শুনেছেন?

—কই, না তো, কে হলেন?

—সুভাষবাবু।

—কই, মহিমবাবু তো আমাকে কিছু জানান নি!

—জানান নি এইজন্য যদি আপনি এতে আপত্তি করেন।

—আমি আপত্তি করব? ওরা আমাকে ভুল বুঝেছে। সুভাষবাবু সভাপতি হলে আমি আপত্তি করব কেন?

—সূর্যবাবুরা ওঁকেই চান, তাই—

—থাক, এ বিষয়ে আর আলোচনার দরকার নেই।

এইভাবে তাঁকে না জানিয়ে চট্টগ্রাম জিলা সম্মিলনীতে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি-পদে নির্বাচিত করার ফলে কলকাতার কংগ্রেস মহলে দেশপ্রিয়কে যে সেদিন একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে বলতে হয় যে, চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যখন সুভাষচন্দ্রকে সম্মিলনের সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল তখন তাঁর কি উচিত ছিল না এই বিষয়ে একবার যতীন্দ্রমোহনকে কিছু জিজ্ঞাসা করা? সেদিন দেশপ্রিয় যে মনোবেদনা বোধ করেছিলেন তা অনুভব করবার মতো লোক খুব কমই ছিল।

সম্মিলনের কিছু পূর্বে একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রামে এলেন। সম্মিলনে যোগদানের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এসেছেন কিনা তা অনেকেই যখন অনুমান করতে পারলেন না তখন মহিমচন্দ্র ও ত্রিপুরাচরণ একদিন এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁদের মুখে সব কথা শুনে যতীন্দ্রমোহন শুধু একটি কথাই সেদিন বলেছিলেন—'সেনগুপ্ত লোকটা অত ছোট নয়। সুভাষবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বিরোধ নেই: থাকলেও তিনি যখন আমারই জেলায় আসছেন তাতে আমার আনন্দিত হওয়ারই কথা। এতকাল আপনারা আমার সঙ্গে কাজ করলেন, আমাকে আপনারা পর্যন্ত ভুল বুঝলেন।' মোকদ্দমার কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। সম্মিলন আরম্ভ হওয়ার তখনো ছু'দিন বাকী ছিল। কিন্তু তাঁর পক্ষে ঐ সম্মিলনে যোগদান অসম্ভব ছিল, অসম্মানজনকও ছিল।

১৯২৯। সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখ।

লাহোর জেলে অনশনব্রতী যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু হলো। যতীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং কলকাতা কংগ্রেসের সময়ে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর মেজর ছিলেন। গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে ভাঁটা পড়তেই বাংলাদেশে বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস যখন পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে তখন থেকেই যতীন্দ্রনাথ ঐ পথের পথিক হন এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়ে লাহোর জেলেই অবরুদ্ধ থাকেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য জেলের মধ্যে কোনোপ্রকার শ্রেণীবিভাগ (classification) ছিল না এবং সেজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষিত রাজনৈতিক বন্দীকে সাধারণ কয়েদীর মতো বন্দিজীবন যাপন করতে হতো। শুধু যে দণ্ডিত আসামী তা নয়, বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীদেরও সাধারণ কয়েদীর মতো বহুবিধ দুঃখভোগ করতে হতো।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য যতীন্দ্রনাথ অনশন-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘ তেষট্টি দিন পরে তাঁর মৃত্যুতে উদ্‌যাপিত হয় বীরের এই ঐতিহাসিক অনশনব্রত। সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি সেদিন নিবদ্ধ হয়েছিল লাহোর জেলে, যেখানে দিনের পর দিন তিলে তিলে মৃত্যুর পথে চলেছেন বাংলার এক বীর বিপ্লবীসন্তান। গান্ধী-প্রমুখ বহু খ্যাতনামা নেতাদের রাজনৈতিক জীবনে বহু অনশনের কাহিনী আছে, কিন্তু এমন অনশন বোধ করি তাঁদের কল্পনার বাইরে এবং সাধ্যের বাইরে ছিল। সুভাষচন্দ্র তখন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যতীন্দ্রনাথের মৃতদেহ বাংলাদেশে পাঠাবার জন্য দাবি করে পাঠালেন। কলকাতায় তাঁর মৃতদেহ পৌঁছলে, হাওড়া স্টেশনে এক বিরাট জনতা সমবেত হয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল এই বীরের প্রতি। হাওড়া স্টেশনে সেদিন নেতৃ-

স্থানীয় যাঁরা উপস্থিত থেকে এই শহীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র, বিধানচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বীর যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ যখন কলকাতায় পৌঁছল তখন ঠিক সেই মুহূর্তে পৌরসভার একটা বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাউন্সিলরগণ সকলেই একযোগে জেলের মধ্যে যতীন দাসের এইরকম আত্মদানে গভীর শোক প্রকাশ করলেন। সেদিন সেই সভায় মেয়র হিসাবে যতীন্দ্রমোহন একটি আবেগময়ী বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

'যতীন্দ্রনাথ এখন জীবিত নেই। আমি তাঁকে ভালোরকম জানতাম—সকলেই তাঁকে ভালোরকম চিনত।···তিনি লাহোর জেলে রাজনৈতিক বন্দিগণের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য অনশন করছিলেন। এই কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনেকেই অনশন করেছেন ও প্রাণদান করেছেন, এ আমরা জানি। এই যুবক গত দু'মাস যাবৎ আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ-স্বরূপ হয়েছিলেন। যে মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি প্রাণ-দান করেছেন, তা নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবে।'

এছাড়া ঐসময়ে যতীন দাসের অনশনজনিত মৃত্যুতে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের উদ্যোগে কয়েকটি জনসভা হয়েছিল। তার একটিতে সভাপতি হিসাবে যতীন্দ্রমোহন তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই স্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন : 'However much the Government of the country might imprison our body, our soul is beyond its control.' পরাধীন জাতির মর্মবেদনাকে সেদিন তিনি এইভাবেই ভাষা দিয়েছিলেন।

১৯২৯ সাল। নভেম্বর মাস।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক অধিবেশনে নতুন সভাপতি

নির্বাচন করা হবে। প্রার্থী ছিলেন দু'জন—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন আর সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র তখন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই নির্বাচনে যতীন্দ্রমোহনের পরাজয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা। এই পরাজয়ের পিছনে ছিল সেই দলীয় স্বার্থ ও কলহ, যা কলকাতা কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে আত্মপ্রকাশ করে ধীরে ধীরে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে একটি রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে তুলেছিল সেদিন। সেদিনকার বাংলার রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের অনেকেরই মনের আকাশ আত্মকলহের বিষবাষ্পে কি রকম সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল, সে-কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। প্রদেশ কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা যা ঘটতে দেখলাম, চট্টগ্রাম জিলা সম্মিলনের লজ্জাকর ঘটনাটি ছিল এরই পূর্বাভাস মাত্র। তখন বিপক্ষ দল যেন উঠে-পড়ে লেগেছেন যতীন্দ্রমোহনকে বাংলার রাজনীতি থেকে অপসৃত করবার জন্য। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রতিষ্ঠা সেদিন নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেককেই তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল। যতীন্দ্রমোহনের অপরাধ তিনি কলকাতার লোক ছিলেন না---ছিলেন বহিরাগত, অর্থাৎ চট্টগ্রামের লোক। কলকাতার রাজনীতির একটা প্যাটার্নই এই ছিল যে, বাইরের কোনো নেতা এখানে এসে প্রাধান্য লাভ করেন, এটা এখানকার রাজনীতিওয়ালাদের কাছে একরকম অসহ্য ছিল বললেই হয়। দলগত স্বার্থ রাজনীতিকে যে কতখানি নীচে নামিয়ে আনতে পারে, ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রদেশ কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টা তা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত করে দিয়েছিল।

এই নির্বাচনের আনুপূর্বিক বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। অতীতের সেই গ্লানিময় ও ক্লেদাক্ত ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করে এখন লাভই বা কী? কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের

ভাষণের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। তিনি অনেক দুঃখের সঙ্গেই বলেছিলেন: 'মীরজাফর ও উমিচাঁদের দল মরে নি—তারা আজো বাংলাদেশে অনেক মানুষের মধ্যে বেঁচে রয়েছে।' কত দুঃখেই যে তিনি এই কথা বলেছিলেন তা যদি আমরা বুঝতাম তাহলে বাংলার রাজনীতিতে 'সুভাষ-সেনগুপ্ত' বিরোধের মতো একটি লজ্জাকর অধ্যায় রচিত হতো কিনা সন্দেহ। এই নির্বাচনের পর দেখা গেল যে, তাঁর নিজের জেলা চট্টগ্রাম যতীন্দ্রমোহনের হস্তচ্যুত হয়ে গিয়েছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বৌবাজার স্ট্রীটের একটা দোতলা বাড়িতে প্রদেশ কংগ্রেসের অফিস ছিল। এই বাড়ির ছাদে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শহরে তুমুল উত্তেজনা, বাইরে অপেক্ষমান উত্তেজিত জনমণ্ডলী ও ছাত্রসমাজ। দুই প্রার্থীই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গাড়ি ও রিক্সায় আশপাশের স্থান ভরে গেছে। সভ্যগণ ও রিপোর্টার ব্যতীত অন্য কারো ভিতরে যাওয়া নিষেধ। ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর দেখা গেল, 'দেশপ্রিয় পরাজিত হইয়াও তাঁহার স্বভাবসুলভ হাসিভরা মুখে অবতরণ করিয়া মোটরে আরোহণ করিলেন।' যতীন্দ্রমোহন, অনেকেই জানেন, একজন উঁচুদরের স্পোর্টসম্যান ছিলেন। তাই জীবনে জয়-পরাজয়কে সমানভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা ও উদারতা তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এই কলকাতায় রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহনের বহু ইংরেজ-বন্ধু ছিলেন। এঁদেরই একজন—Mr. Theo H. Thorne—দেশপ্রিয়ের মৃত্যুর পরে লিখেছিলেন: 'He never lost his balance. He was a democratic general in the battle for freedom'. দেশপ্রিয়কে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরাই এই উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করবেন।

নির্বাচন হয়ে গেল।

ফলাফল ঘোষিত হলো।

দ্বিতল বাড়িটি থেকে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—সুভাষচন্দ্র জিতেছেন।—দু'জনের মধ্যে ভোটের ব্যবধান কত ?—উৎসুক জনতার জিজ্ঞাসা। চার—মাত্র চার ভোটে তিনি জয়লাভ করেছেন। এত কষ্টের পর মাত্র চার ভোটের ব্যবধানে জিতলেন সুভাষবাবু—বাইরে অপেক্ষমান ছাত্রদের মধ্যে একদল বলাবলি করে। সুভাষবাবু প্রেসিডেণ্ট ছিলেন বলে জেলার ভোটগুলো তিনি ম্যানেজ করতে পেরেছেন, এমন সমালোচনাও কেউ কেউ করলেন। যতীন্দ্রমোহন উপর থেকে নেমে এলেন। গাড়িতে উঠলেন। ছাত্রদের একদল তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল—দাঁড়াল বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ। দেশপ্রিয়ের জয়লাভ সম্পর্কে তাঁরা সবাই সুনিশ্চিত ছিলেন। সকলেরই চোখে-মুখে জ্বলজ্বল্ করছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। হাসিমুখে তিনি সেগুলি শুনে যাচ্ছেন। তাঁর প্রশান্ত মুখে পরাজয়ের গ্লানিমাত্র কোথাও দেখা গেল না।

—স্যর, এ নির্বাচন অসিদ্ধ।

—এ নির্বাচন রীতিমত বেআইনী।

—আপনি এ. আই. সি. সি.-তে আপীল করুন এই নির্বাচন রহিত করবার জন্য।

—তোমরা যখন একথা বলছ তখন ভেবে দেখব।

—না স্যর, ভেবে দেখা নয়, আপনি আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিন যে, আপনি কংগ্রেসের সদর দপ্তরে এটা জানাবেন।

—আচ্ছা, ভেবে দেখব।

এর বেশি যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। নেতৃত্বের মোহ তাঁর মধ্যে কোনোদিনই ছিল না, দেশের স্বার্থকে সর্বদা দলীয় স্বার্থের উপরে স্থান দিয়েছেন। তাই তাঁর মতো গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একজন নেতার পক্ষে জনতার কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না তিনি। কিন্তু বুঝলেন পরাজিত হলেও বাংলার জনসাধারণের হৃদয়ে তাঁর আসন ঠিকই

আছে। দেশপ্রিয় দেশপ্রিয়ই আছেন। সেদিন এটা উপলব্ধি করে যতীন্দ্রমোহনের অন্তর যে আনন্দে ও আশায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। ঘটনার পরিসমাপ্তি কিন্তু এখানেই ছিল না।

পরের দিন সকালে দেশপ্রিয়ের এলগিন রোডের বাড়িতে আর একটি চমকপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা হলো। তাঁর দলের লোকজন দলে দলে এসে হাজির। বিনিদ্র রজনীর ছাপ তাঁদের মুখে-চোখে সুস্পষ্ট—তেমনি সুস্পষ্ট ছিল একটা গভীর নিরুৎসাহের ভাব। সকলের মুখে সেই একই কথা—এই নির্বাচন অসিদ্ধ এবং এটা রহিত করবার জন্য এ. আই. সি. সি.-র কাছে আবেদন করতেই হবে। একজন প্রত্যক্ষ-দর্শীর বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে সকলের যুক্তি-তর্ক শ্রবণ করিতেছিলেন। একান্ত প্রয়োজন বোধ না করিলে কোনরূপ অভিমত দিতেছিলেন না। দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল। এই সময়ে দেশবন্ধুর জামাতা ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত সুধীর রায়ের (পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পিতা) মধ্যস্থতায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু দেশপ্রিয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দেশপ্রিয় তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি একাকীই আসিয়াছিলেন। সুভাষবাবুকে নানা দিক হইতে নানারূপ প্রশ্ন করা হইতেছিল এবং তিনিও যথাশক্তি সে-সব প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন ··· প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এইভাবে অতি-বাহিত করিয়া সুভাষবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।'

প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের এই ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি পর্যন্ত গড়িয়েছিল। পরের দিন এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটা সভা ছিল। যতীন্দ্র-মোহন তখন বাংলার পক্ষ থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি এলাহাবাদ গিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির হাতে একটি আবেদন দাখিল

করেন। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর কথা শুনতে চাইলেন না; তাঁরা কমিটির সভাপতি মতিলাল নেহেরুর উপরে এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দিলেন। যতীন্দ্রমোহন কমিটির এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন ও কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে গান্ধীকে তারযোগে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। গান্ধীর অনুরোধে তিনি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করতে বিরত থাকেন। এই ঘটনার পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর নিজস্ব সংবাদপত্র 'য়্যাড্ভান্স্' (*Advance*)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ড' অথবা দেশপ্রিয়ের 'য়্যাড্-ভান্স্'—দুটি কাগজেই দেশের রাজনৈতিক প্রগতির সুরটা স্পষ্টভাবেই ধ্বনিত হয়েছিল।

লাহোর কংগ্রেসের প্রাক্কালে যতীন্দ্রমোহন তাঁর একান্ত অনুগত সহকর্মীদের সঙ্গে বহু জল্পনা-কল্পনার পর 'য়্যাড্ভান্স্' নামে নতুন একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশ করলেন। প্রধানত বিপক্ষদলের আক্রমণ থেকে নিজের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই তাঁর নিজস্ব একটি কাগজের প্রয়োজন হয়েছিল, একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল দেশের মধ্যে একটি সুস্থ ও সর্ববিধ গ্লানিমুক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা এবং তা করতে হলে নিজস্ব একটি কাগজ দরকার। অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাকাল থেকে বাংলাদেশের তিনজন্ নেতা তাঁদের স্বজাতিকে তিনখানি নতুন ইংরেজি পত্রিকা উপহার দিয়েছিলেন। আমরা প্রথমে পেলাম শ্যামসুন্দরের 'সার্ভেন্ট', তারপর দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ড' আর সবশেষে দেশপ্রিয়ের 'য়্যাড্ভান্স্'। শেষোক্ত পত্রিকাখানি যখন প্রকাশিত হয় তখন 'সার্ভেন্ট' ও 'ফরোয়ার্ড' দুই-ই উঠে গিয়েছে। এই পত্রিকা তিনখানি ব্যতীত চতুর্থ আর একখানি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাও—'দি ডেলী বসুমতী' প্রকাশিত হয়েছিল। এই চারটি

কাগজের মধ্যে একটিরও পরমায়ু দীর্ঘ ছিল না, থাকবার কথাও নয়। দলীয় কাগজ বেশিদিন টেকে না; দলের দাপট বা দলীয় নেতার প্রভাব-প্রতিপত্তি যতদিন, কাগজের পরমায়ু ও প্রয়োজনীয়তাও ঠিক ততদিন থাকে। তবে এই নতুন চারখানি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার ফলে সেই যুগে একটি নবীন ও শক্তিশালী সাংবাদিক-গোষ্ঠির সৃষ্টি হয়েছিল। লাভের মধ্যে ছিল এটাই।

কাগজ করার পক্ষে প্রথম বাধা ছিল অর্থের। দৈনিক পত্রিকা করতে হলে বহু টাকার দরকার। প্রখ্যাত ব্যারিস্টার জে. সি. গুপ্ত প্রমুখ তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহযোগে যতীন্দ্রমোহন একটি যৌথ কোম্পানী স্থাপন করলেন। এর নাম দিলেন 'দেশবন্ধু পাব্লিশিং কোম্পানী লিমিটেড।' প্রথমে পত্রিকার অফিস ছিল হেয়ার স্ট্রীটে, তারপর উঠে আসে ধর্মতলা স্ট্রীটে তালতলায়। যতীন্দ্রমোহনই এর প্রধান সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন এবং প্রফুল্ল চক্রবর্তী সম্পাদকরূপে এখানে যোগদান করেন। নাগপুর কংগ্রেসে যেমন 'সার্ভেন্ট' বিতরিত হয়েছিল তেমনি লাহোর কংগ্রেসে 'য়্যাড্‌ভান্স্‌' কাগজ বিতরিত হতে এই লেখক দেখেছিলেন। খুব অল্পদিনের মধ্যে এই ইংরেজি দৈনিকটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পরবর্তীকালে লেখক এই পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেছিলেন। তখন এখানে তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর ধীরেন সেন, প্রমোদকুমার সেন প্রমুখ খ্যাতনামা সাংবাদিকগণ। 'য়্যাড্‌ভান্সের' গৌরবময় যুগে কয়েকবার রাজদ্রোহের অপরাধে এর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ থেকে মামলা আনা হয়েছিল এবং এর সম্পাদক অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। দেশপ্রিয় গোড়ার দিকে মাত্র তিন-চার মাস কাল প্রধান সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর বারবার রাজনৈতিক অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড হওয়াতে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। কাগজটি পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল দেশপ্রিয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রণেন্দ্রমোহনের উপর।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসল। সভাপতি জওহরলাল নেহেরু। লাহোর কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঝঙ্কৃত হলো। শুধু দাবি নয় ---আন্দোলনের কথাও ঘোষিত হলো। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর দেওয়া হলো সেই আন্দোলন চালাবার ভার। এই কংগ্রেসেই সভাপতি হিসাবে জওহরলাল সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : 'কলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবানুসারে এখন আমাদের সম্মুখে কেবল একটিমাত্র লক্ষ্যই আছে—তাহা হইতেছে পূর্ণ স্বাধীনতা। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে অবিলম্বে আপনাদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। ভবিষ্যতে যদি কংগ্রেস অথবা জনসাধারণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হিংসার আশ্রয়েই আমরা আমাদের দাসত্ব মোচন করতে সমর্থ হব, সেদিন আমরা নিঃসন্দেহে হিংসার পথ বেছে নিতে আদৌ কুণ্ঠিত হব না। হিংসা মন্দ হতে পারে, কিন্তু পরাধীনতা অধিকতর মন্দ।'

॥ ষোলো ॥

বাইরে থেকে দেখতে যতীন্দ্রমোহন বলিষ্ঠদেহী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ সালের সূচনা থেকেই দেখা গেল তাঁর শরীরে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সেটা তাঁর পরিবারের সকলের বিশেষ করে তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার কাছে বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে। রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য তাঁকে সেই সময়ে কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে হতো। কর্মীপুরুষ যতীন্দ্রমোহন, তাই শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকা তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হতো। যৌবনকাল থেকেই তিনি দেশসেবার প্রেরণা ও উন্মাদনার মধ্য দিয়ে এতকাল অতিবাহিত করে এসেছেন এবং বহু ঝড়ঝাপ্‌টা শরীরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। তারই ফলে শরীরের মধ্যে এই রক্তচাপের ব্যাধি যে কবে থেকে আশ্রয় নিয়েছে তা তিনি জানতেই পারেন নি।

জানতে পারলেন উনিশশো ত্রিশ সালের সূচনায়। তিনি তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। সামনেই ২৬শে জানুয়ারি, 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপিত হবে এবং বাংলাদেশের সকল দায়িত্বভার তাঁকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল। চিকিৎসকগণ ব্যবস্থা দিলেন দীর্ঘ-কাল সমুদ্র-ভ্রমণ প্রয়োজন, নতুবা এই ব্যাধির উপশম হবে না। ঠিক হলো তিনি সিঙ্গাপুর যাবেন। কিন্তু যাওয়ার আগে কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী কলকাতায় 'স্বাধীনতা দিবস' প্রতিপালন করতেই হবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, লাহোর কংগ্রেসে যখন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তখন দেশবাসী কিভাবে এতে সাড়া দেয় তা

জানবার জন্য কংগ্রেস থেকে ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখটি 'স্বাধীনতা দিবস' হিসাবে সর্বত্র প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৯৩০ সালটি ছিল ভারতবাসীর জীবনে এক অপূর্ব বৎসর।

যতীন্দ্রমোহনের জীবনেও ঠিক তাই।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে এই উনিশশো ত্রিশ সালটি। জাতির জীবনেও চিহ্নিত হয়ে আছে এই সালটি ঠিক তেমনিভাবে। এই বছরের অবিস্মরণীয় ঘটনা আইন-অমান্য আন্দোলন, যা শুরু হয়েছিল লবণ সত্যাগ্রহ হিসাবে। গান্ধীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডাণ্ডী অভিযান এই বছরেরই ঘটনা। আবার এই বছরেই আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এই বছরেই যতীন্দ্রমোহন একাধিকবার ধৃত, অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতির পদে মনোনীত হয়েছেন আর, সকলের উপর, কারান্তরালে থাকার সময়ে পঞ্চমবারের মতো কলকাতা পৌরসভার মেয়র-পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তাই বলছিলাম, উনিশশো ত্রিশ জাতির জীবনে যেমন, ঠিক তেমনি জাতির অন্যতম নেতা দেশপ্রিয়ের জীবনেও একটি অপূর্ব বৎসর ছিল। ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসের উৎসব দিয়ে ঘটনাবহুল এই বৎসরটির উদ্বোধন হয়েছিল।

পৌরসভা কংগ্রেসের দখলে। 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে ২৬শে জানুয়ারি পৌরসভার শীর্ষদেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। যতীন্দ্রমোহন তখন মেয়র। পতাকা উত্তোলন করতে হলে পৌরসভার নির্দেশ লাভ করা দরকার। এজন্য ২৫শে জানুয়ারি কর্পোরেশনের একটা বিশেষ সভা আহূত হলো। যতীন্দ্রমোহন তখন অসুস্থ—মাথার অসুখটাই বেশি, চিকিৎসকগণ পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন, ওঠা, চলা বা হাঁটা সব বন্ধ। তবু কর্পোরেশনের সেই সভায় চিকিৎসকদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই তিনি যোগদান করেছিলেন। ডেপুটি মেয়র মিঃ

রেজ্জাক ও অল্ডারম্যান শ্রীসন্তোষকুমার বসুর সাহায্যে যতীন্দ্রমোহন অতিকষ্টে মেয়রের আসনে গিয়ে বসলেন। তাঁর চোখে-মুখে ব্যাধির বেদনা যেন সুস্পষ্ট। ডেপুটি মেয়র তাঁর বক্তৃতা পাঠ করলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন :

'As the Mayor of this city, I feel, it is my duty above all others to attend today's meeting of the Corporation and express my views on the proposal which is about to be placed before you. I have, therefore, come in spite of the protests of my medical advisers···The resolution before you is of the utmost gravity. It is not to be treated lightly. We have staked our existence on it···I put my country's flag above every other flag. The Corporation of Calcutta is an Indian Institution. It stands on Indian soil. It is owned by Indians. It is managed by Indians and run in the interest of Indians. It is our duty—a solemn duty—to hoist the National flag here.'

সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে।

২৬শে জানুয়ারি পৌরসভার সকল অফিসে ও প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। উত্তর কলকাতায় দেশবন্ধু পার্কে পতাকা উত্তোলনের জন্য দেশপ্রিয় আহূত হলেন। কিন্তু তিনি পীড়িত এবং চিকিৎসকের নিষেধ ছিল। তথাপি দেশসেবার আহ্বান উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল এবং তাঁর চিকিৎসকদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি এলেন দেশবন্ধু পার্কে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী। সেদিন এই উপলক্ষে পার্কে বহু জনসমাগম হয়েছিল। অসুস্থতা সত্ত্বেও যতীন্দ্রমোহন এখানে একটি মর্মস্পর্শী

বক্তৃতা করেছিলেন। সেই বক্তৃতার অক্ষরে অক্ষরে ছিল দেশপ্রেমের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

সেদিন ভারতের সর্বত্রই তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতি-পালিত হয়েছিল স্বাধীনতা দিবস। সর্বত্রই জনতা উচ্চারণ করেছিল স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য। যেন বাঁধ ভেঙে অকস্মাৎ বন্যার জল দু'কূল ছাপিয়ে উঠল। গান্ধী বুঝলেন, লগ্ন উপস্থিত। স্বাধীনতালাভের জন্য এবার শুরু হবে নব পর্যায়ের আন্দোলন—আইন-অমান্য আন্দোলন। অহিংস-অসহযোগের পর একে একে অতিক্রান্ত হয়েছে দশটি বছর। উনিশশো ত্রিশের ২৬শে জানুয়ারি ভারতব্যাপী উৎসাহ-উদ্দীপনা অনুধাবন করে গান্ধীর মনে হলো লগ্ন উপস্থিত; জাতির মনে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা যেন আগের চেয়ে আরো প্রবল, আরো দুর্বার হয়ে উঠেছে।

২৬শে জানুয়ারি দেশবন্ধু পার্কে অনুষ্ঠান শেষ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন যতীন্দ্রমোহন। ফিরলেন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে। বৃদ্ধি পেল রক্তের চাপ। মাথায় অসহ্য বেদনা। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগেই ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর কাল-বিলম্ব না করে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে তিনি সপরিবারে ১লা ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর যাত্রা করলেন। ওরা রেঙ্গুনে এসে পৌঁছলেন। সেখানকার স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁকে বক্তৃতা করবার জন্য অনুরোধ করলেন। বিনম্রভাবে তিনি তাঁদের বললেন যে, ফিরবার সময়ে তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করবেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখনো ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি, হওয়ার প্রস্তাব হয়েছে সবেমাত্র। ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতীয়গণ এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলেন। বেঙ্গল-বার্মা স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটার আব্দুল বারি চৌধুরী স্টিমারে এসে যতীন্দ্র-মোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং ফিরবার পথে বক্তৃতায় তিনি যেন ভারত-ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি অতি অবশ্য উল্লেখ

করেন, এই মর্মে চৌধুরীসাহেব দেশপ্রিয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

এই বিষয়টি নিয়ে ব্রহ্মদেশের, বিশেষ করে রেঙ্গুনের পরিবেশ তখন খুবই উত্তপ্ত ও অশান্তিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন সারা ব্রহ্মদেশেই দেখা দিয়েছিল প্রচণ্ড ভারত-বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষের ফলে ঐ সময়ে প্রবাসী ভারতীয়দের উপর এখানে খুবই নির্যাতন হয়। সিঙ্গাপুর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ে যতীন্দ্রমোহন তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রেঙ্গুনে থামলেন। যেদিন তিনি রেঙ্গুনে উপনীত হন সেদিন ছিল ১৮ই ফেব্রুয়ারি। এখানে তিনি তিন-চারদিন অবস্থান করেছিলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারি জাহাজ থেকেই তাঁকে ও শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তাকে শোভাযাত্রা সহকারে সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। রেঙ্গুনে তিনি দুটি বক্তৃতা করেন, ২০শে একটি ও ২১শে আর একটি।

কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করামাত্র যতীন্দ্রমোহনকে একটি জঘন্য চক্রান্তের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যার ফলে তাঁর রাজনৈতিক জীবন, এমন কি তাঁর নেতৃত্ব পর্যন্ত চিরকালের জন্য কলঙ্কমলিন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেই চক্রান্তের কথা পরে বলছি, আপাতত তাঁর রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার কাহিনী উল্লেখ করি। ১১ই মার্চ প্রভাতী সংবাদপত্রগুলিতে জানা গেল যে, রেঙ্গুনের পুলিশ কমিশনার দেশপ্রিয়ের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনেছেন। এর দু'দিন পরেই রেঙ্গুন থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ কর্মচারী কলকাতায় এসে হাজির। ১৩ই মার্চ দক্ষিণ কলকাতার সহকারী পুলিশ কমিশনার একটি ওয়ারেণ্ট হাতে দেশপ্রিয়ের এলগিন রোডের বাড়িতে এলেন। এই ওয়ারেণ্ট issue করেছিলেন রেঙ্গুনের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ওয়ারেণ্টে অবশ্য জামিনে ছেড়ে দেওয়ার কথা উল্লিখিত ছিল। যতীন্দ্র-মোহন কিন্তু জামিনে মুক্ত হতে সম্মত হলেন না। ১৪ই মার্চ বিচারার্থ তাঁকে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতার মেয়রকে গ্রেপ্তার করা

হয়েছে, এই সংবাদে ঐদিন বিকালে পৌরসভা বন্ধ হয়ে যায় এবং শহরে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই উপলক্ষে সেদিন কয়েকটি সংবাদপত্র সন্ধ্যাবেলায় একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন, আর প্রদেশ কংগ্রেসে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আউটবাম ঘাট থেকে যখন জাহাজ ছাড়ে তখন যেভাবে যতীন্দ্রমোহনকে বিদায়-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল তা অভূতপূর্ব বললেই হয়। ডেকের উপরে আপাদমস্তক পুষ্পমাল্য বিভূষিত হয়ে সহাস্যবদনে দাঁড়িয়ে আছেন সস্ত্রীক যতীন্দ্রমোহন, আর গঙ্গার ধারে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছে জনতা অশ্রুসিক্ত নয়নে। মুহুর্মুহুঃ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে গঙ্গার তীর মুখরিত। সে দৃশ্য ভুলবার নয়। দেশপ্রিয়ের গ্রেপ্তারের পরদিন শহরের সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিচারার্থ রেঙ্গুনে নীত হওয়ার পূর্বে জাতির উদ্দেশে দেশপ্রিয় একটি বিদায়বাণী রেখে গিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন : 'মাতৃভূমির আহ্বান এসেছে। আজ আমি মুক্তিসংগ্রামে শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছি। একমাত্র বন্দী ছাড়া এ আনন্দ অপর কেউ উপভোগ করতে পারে না। আজ মাতৃপূজার বোধন-শঙ্খ সমস্ত ভারতকে উদ্বুদ্ধ করছে। মাতৃ-যজ্ঞের মন্ত্র-ঋষি অহিংস-বাহিনী সঙ্গে নিয়ে জয়যাত্রা করেছেন।...বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ মহাত্মা গান্ধীর পতাকাতলে সমবেত হও।'

যতীন্দ্রমোহনকে গ্রেপ্তার করে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়া হয় ১৪ই মার্চ আর ঠিক তার দু'দিন আগে, ১২ই মার্চ, সবরমতী আশ্রম থেকে গান্ধীর ডাণ্ডী অভিযান শুরু হয়। তাঁর বিদায়বাণীতে যতীন্দ্রমোহন তারই উল্লেখ করে বলেছিলেন : 'মাতৃ-যজ্ঞের মন্ত্র-ঋষি অহিংস-বাহিনী সঙ্গে নিয়ে জয়যাত্রা করেছেন।' এইভাবেই সেদিন শুরু হয়েছিল লবণ সত্যাগ্রহ।

১৮ই মার্চ রেঙ্গুনের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার মরিস্ কালিসের এজলাসে যতীন্দ্রমোহনের বিচার আরম্ভ হয়। বিচারগৃহের বাইরে

সেদিন প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন বিচারে কোনো অংশ গ্রহণ করেন নি, কোনো সাক্ষীকেও জেরা করেন নি। ২২শে মার্চ বিচার শেষ হলো। তাঁর প্রতি দশদিন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলো। দশদিন কারাদণ্ড ভোগ করে ৩১শে মার্চ তিনি মুক্তিলাভ করলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মিস্টার কলিস যতীন্দ্রমোহনের পূর্ব-পরিচিত বন্ধু ছিলেন এবং তিনি তাঁর 'Trials in Burma' শীর্ষক গ্রন্থে রেঙ্গুনে দেশপ্রিয়ের এই বিচার-বিবরণ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কৌতূহলী পাঠক বইটি পড়তে পারেন।

মেয়রের বিরুদ্ধে চক্রান্তের বিষয়টি এবার বলি।

১৯২৯ সালে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের পর থেকেই সেনগুপ্ত-বিরোধী দল কর্পোরেশনে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করার কাজে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এরই পরিণতি ছিল সেই 'জাল চিঠি', যেটিকে কেন্দ্র করে সেদিন যে নাটকের অবতারণা হয়েছিল তার আনুপূর্বিক বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে ঘটনাটি ছিল এই: যতীন্দ্রমোহন যখন সিঙ্গাপুর যান তখন কলকাতায় তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যতীন্দ্রমোহনের বিরোধীপক্ষ তাঁকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য একটি জাল চিঠি উদ্ভাবন করে। জে. সি. মুখার্জি তখন চীফ একজিকিউটিভ অফিসার। তাঁর মাধ্যমে যতীন্দ্রমোহন এস. এন. মুখার্জি নামক এক ধনী ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে ঋণস্বরূপ কয়েক হাজার টাকা চেয়েছিলেন এবং যতীন্দ্রমোহন তাঁকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এই উপকারের বিনিময়ে তিনি মিঃ মুখার্জিকে কর্পোরেশন থেকে ভালোরকমের কনট্রাক্ট পাইয়ে দেবেন। ইঞ্জিনিয়ার মুখার্জি মেয়রের এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে চীফ একজিকিউটিভ অফিসারকে একটি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রটি দেশপ্রিয়ের বিরোধীদলের হস্তগত হয় এবং শরৎচন্দ্র বসু কর্পোরেশনের

এক সভায় কাউন্সিলরদের সামনে সেটি দাখিল করেন; এর ফলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। চিঠিখানির প্রতিলিপি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে পরে জনসাধারণের মনে চাঞ্চল্য ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। সকলের মুখেই বিস্মিত প্রশ্ন— দেশপ্রিয় এই কাজ করেছেন! নানাজনে নানাকথা বলে। কেউ বলে এ হতেই পারে না। এ চিঠি জাল।

যাই হোক, এই চিঠিটিকে মূলধন করে দেশপ্রিয়কে মেয়রের পদ থেকে অপসারণের জন্য বিরোধীপক্ষ উঠে-পড়ে লাগলেন এবং এজন্য সংবাদপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে একটা জনমতও গড়ে উঠতে থাকে। সিঙ্গাপুরে বসে যতীন্দ্রমোহন যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন তখন তিনি যারপরনাই বিচলিত বোধ করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। আরো কিছুকাল সিঙ্গাপুরে থাকবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি এতখানি উতলা হয়ে উঠলেন যে, অবিলম্বে কলকাতায় ফিরবার ইচ্ছা করলেন। কলকাতায় এসে শুনলেন ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার মখার্জি ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে আদালতে এক মানহানির মামলা দায়ের করেছেন। বাদীর চেয়ে, আমাদের মনে হয়, দেশপ্রিয়ের মানমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা সবকিছু যেন একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল সেদিন এই চিঠির জন্য। শেষপর্যন্ত আদালতে প্রমাণিত হয় যে, বিতর্কিত পত্রখানি সর্বৈব জাল ও মিথ্যা। এই মামলায় বাদীর পক্ষ থেকে যতীন্দ্রমোহনকে সাক্ষ্য মানা হয়েছিল। সেদিন অনেকেই ভেবেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য এই প্রকার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন সেই শরৎচন্দ্র বসু যে নিতান্ত বিদ্বেষবশতঃ এই কাজটা করেছেন, আদালতে দাঁড়িয়ে যতীন্দ্রমোহন বুঝি সেই কথা বলবেন। কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে যতীন্দ্রমোহন আদালতে বাদীপক্ষের সাক্ষী হিসাবে বলেছিলেন : 'Mr. Bose is as good a party-man as any other.' সকলেই স্তম্ভিত হলো এই কথা শুনে। বিস্মিত হলো তাঁর বিপক্ষ দল।

দেশপ্রিয়ের মহত্ত্বের এর চেয়ে বড়ো পরিচায়ক আর কী হতে পারে? আদালতে যখন প্রমাণিত হলো যে, শরৎচন্দ্র বসুর অভিযোগ ভিত্তিহীন, তখন অনেকেই বাদীকে মামলা তুলে নিতে অনুরোধ করেন। মিস্টার মুখার্জি এতে সম্মত তো হলেনই না বরং তিনি প্রকাশ্য আদালতে শরৎচন্দ্র বসুকে ঐ চিঠি জাল বলে স্বীকার করতে ও ক্ষমা চাইতে দাবি করলেন। শরৎচন্দ্র বসুকে আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন বলতে হয়েছিল, তিনি জানতেন না যে, এটি একটি জাল চিঠি এবং তাঁর কৃতকার্যের জন্য তাঁকে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছিল। অতঃপর মামলাটি প্রত্যাহৃত হয় এবং তখন রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় দেশপ্রিয়ের মান-মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা জনসাধারণের সামনে আবার শতগুণে উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনাটি তাঁর সরল প্রাণে এমনই আঘাত করেছিল যে, উত্তরকালে যতীন্দ্রমোহন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে এটির উল্লেখ করে বলতেন, 'বার্ণার্ড শ মিথ্যা বলেন নি যে, 'Politics is a scoundrel's business and a dirty business, too.' আরো বলতেন, 'বাংলাদেশে যেন আর জন্মাতে না হয়।' আজ আমরা অনুমান করতে পারি হতভাগ্য এই দেশের নোংরা রাজনীতি এই সহজ, সরল ও উদার মানুষটিকে কতদূর ব্যথিত করে তুলেছিল সেদিন।

॥ সতেরো ॥

উনিশশো ত্রিশের ১২ই মার্চ শুরু হয়েছিল গান্ধীর ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযান ও লবণ সত্যাগ্রহ। লবণ করের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করে তিনি সূচনা করেছিলেন দেশব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলন। তাঁর অনেক সহকর্মী, বিশেষ করে জওহরলাল, সেদিন রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলেন আন্দোলনের অধিনায়কের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে। লবণ কর উঠিয়ে দেওয়ার সঙ্গে আইন-অমান্যের মিল কোথায়?—এই প্রশ্ন সেদিন অনেকেই তুলেছিলেন। গান্ধী কিন্তু এই লবণ আইনকে একটা বে-আইনী আইন বলে মনে করতেন; সেই কথাটাই তিনি পরিষ্কারভাবে ২রা মার্চ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে লর্ড আরউইনকে জানিয়ে দিয়ে বলেছিলেন: 'I want to break this Salt Act'.—আমি এই লবণ আইন ভাঙতে চাই।

সহকর্মীরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, স্বাধীনতার পরিপন্থী এত আইন থাকতে নিতান্ত নিরামিষ এই লবণ আইন ভঙ্গ করে লাভটা কি হবে?—তখন এর উত্তরে গান্ধীজি বলেছিলেন: 'By breaking the Salt laws Indians will be able to develop strength to get other things done by the Government according to their wishes.' নিঃসন্দেহে তাঁর এই যুক্তি অমোঘ ছিল। লবণ আইনটা কি? আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এই দেশ থেকে যে পরিমাণ জিনিস রপ্তানী হতো, তার চেয়ে অনেক কম জিনিস ইংল্যাণ্ড থেকে আসত। কম জিনিস

আসত বলে জাহাজগুলি প্রায়ই খালি আসত। ফলে জাহাজ চলাচলে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হতো। সেই খালি জায়গা পূর্ণ করার জন্য ওদেশ থেকে লবণ আনা হতো। বিলিতি লবণ সস্তায় বিক্রী করার জন্য দেশী লবণের ওপর ট্যাক্স বা খাজনা বসানো হলো। ফলে দেশী লবণের দাম বৃদ্ধি পেল আর সস্তাদরের বিলিতি লবণ ভারতের বাজারে প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হতে লাগল। এরই বিরুদ্ধে গান্ধীজি শুরু করেছিলেন সেদিন তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন যা আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন বা শুধু লবণ সত্যাগ্রহ নামে অভিহিত হয়েছে।

গান্ধী তখন থাকতেন তাঁর সবরমতী আশ্রমে।

সেখান থেকে দু'শো মাইল দূরে সমুদ্রের তীরে ডাণ্ডী। সেইখানে আশীজন সহকর্মী সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে গিয়েছিলেন তিনি। এই অভিযান শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ তারিখে। চব্বিশ দিন পায়ে হেঁটে চলেছিলেন তিনি—চলেছিল তাঁর সঙ্গে যেন সমগ্র ভারত। ৫ই এপ্রিল গান্ধী এসে পৌঁছলেন ডাণ্ডীতে। পরের দিন সকালে প্রভাতী প্রার্থনার পরে তিনি লবণ তৈরি করলেন সমুদ্রের জল দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা বৈদ্যুতিক স্পন্দন দেখা দিল সমগ্র জাতির মধ্যে। সারাদেশে দেখা দেয় প্রাণচাঞ্চল্য। বাংলায় কাঁথিতে লবণ তৈরি করতে গিয়ে কর্মী ও নেতারা আইন অমান্য করলেন। যাঁরা তা করলেন না, তাঁরা বিলিতি কাপড় ও মদ-গাঁজার দোকানে দোকানে পিকেটিং করতে লাগলেন। কেউ-বা প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ পুস্তক থেকে জনতার সামনে অংশবিশেষ পাঠ করে আইন অমান্য করতে লাগলেন। সমস্ত দেশে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য সুশৃঙ্খল সৈনিকের মতো সকলে সেদিন সর্বস্ব পণ করে কাজ করেছিলেন।

দেশপ্রিয়ও সেদিন এই আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন না। রেঙ্গুনে কারাদণ্ড ভোগের পর তাঁর প্রত্যাগমনে সর্বত্র আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সেদিন ছিল ৩রা এপ্রিল যেদিন তাঁকে নিয়ে জাহাজ আউটরাম

ঘাটে এসে পৌঁছল। কারামুক্ত জননায়ককে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আউটরাম ঘাটে এক বিশাল জনতার সমাবেশ হয়েছিল। ঐ দিনই বিকালে তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি বিশেষ জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। লেখক সেই মহতী সভায় উপস্থিত ছিলেন সংবাদপত্রের রিপোর্টার হিসাবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। ঐ দিনের বক্তৃতায় দেশপ্রিয়ের ত্যাগমণ্ডিত জীবনের প্রশংসা করে আচার্যদেব সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন: 'যতীন শুধু নিখাদ সোনা নয়, ওকে ঘষলে চন্দনের গন্ধ পাওয়া যায়।' তিনি আরো বলেছিলেন: 'যে জাতি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের ন্যায় ত্যাগবীরকে রাষ্ট্রনেতারূপে লাভ করতে পারে, সে জাতি সৌভাগ্যবান—সে জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ অনিবার্য।···বাঙালি জাতি এমন একজন ত্যাগপূত রাষ্ট্রনেতাকে তাদের সশ্রদ্ধ সংবর্ধনা না জানিয়ে পারে না।'

আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সব জায়গায় তো নিষিদ্ধ লবণ তৈরি করা সম্ভবপর ছিল না। তখন নেতারা অন্যান্য আইন ভঙ্গের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তবে বাংলাদেশে যে-সব স্থান সমুদ্রের উপকূলবর্তী, যেমন মেদিনীপুর, ডায়মণ্ডহারবার, চট্টগ্রাম প্রভৃতি, সে-সব স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল। নাগপুরে ভঙ্গ করা হয়েছিল বন-আইন ও অস্ত্র-আইন। কিন্তু শহর কলকাতায় কী করা যায়?

—আমরা এখানে কিভাবে এই আন্দোলন করব?—রেঙ্গুন থেকে কারামুক্ত হয়ে ফিরে আসার পরের দিন যখন দেশপ্রিয়ের এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এসে তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তার উত্তরে দেশপ্রিয় বলেছিলেন: 'কেন, গান্ধীজি তো বলেছেন, Civil disobedience in any form will be the basi of this movement. তবে আর চিন্তা কি?'

—কিন্তু কিভাবে কোন্ আইনটা এখানে অমান্য করা যায়?

—By reading out proscribed literature in public places.

দেশপ্রিয়ের এই প্রস্তাব সকলের মনে লাগল। ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি যাঁরা এসেছিলেন তাঁর কাছে নির্দেশের জন্য, তাঁরাও প্রকাশ্য স্থানে নিষিদ্ধ পুস্তক-পাঠের প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। কলকাতায় এই আন্দোলনে সেদিন ছাত্ররাই অগ্রণী হয়েছিলেন। ১১ই এপ্রিল, শুক্রবার। ঐ দিন কলেজ স্কোয়ারে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল লেখক তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। ঐ দিন কলেজ স্কোয়ারে নিষিদ্ধ পুস্তক-পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। বহু লোকের সমাবেশে এক প্রাণ-চঞ্চল দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল সেখানে। পুলিশবাহিনীও মোতায়েন ছিল। বক্তাদের মধ্যে ছাত্রই ছিল বেশি। নিষিদ্ধ পুস্তক-পাঠ আরম্ভ হতেই বক্তার পর বক্তা গ্রেপ্তার হতে থাকেন। তাই দেখে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং পুলিশের সঙ্গে বাধে তাদের সংঘর্ষ। ফলে উভয়পক্ষে অনেক লোক আহত হয়। অবস্থা সঙ্গীন হলে সঙ্গীনধারী সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। সেদিন কলেজ স্কোয়ারে বহু লোক গ্রেপ্তার হয়েছিল।

ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের এই সংবাদ পেয়ে দেশপ্রিয় তাদের ডেকে বললেন, তারা যেন নিরুপদ্রবভাবে আইন অমান্য করে, নতুবা আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। কলকাতায় সেদিন এই আন্দোলন প্রধানত ছাত্ররাই করেছিলেন। নেতারা তখনো পর্যন্ত আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। যতীন্দ্রমোহনকে এই আন্দোলন থেকে নিরস্ত থাকতে তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই পরামর্শ দিলেন। 'আপনি এতে যোগদান করলে আপনার গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড অনিবার্য। এবং এর ফলে আপনার স্বাস্থ্যের হানি হবে।' এই কথা সেদিন তাঁরা তাঁকে বুঝিয়েছিলেন।

—কিন্তু আমার কথায় ছেলেরা আন্দোলন করছে, জেলে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় আমি কি করে নিষ্ক্রিয় থাকি?

এই ছিল সেদিন দেশপ্রিয়ের উত্তর এবং এই উত্তর সর্বাংশে তাঁর মতো একজন নেতারই উপযুক্ত ছিল।

তারিখ—১২ই এপ্রিল, ১৯৩০ ; সময়—অপরাহ্ণ।

স্থান—কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার।

আজ এইখানে নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করা হবে। আগের চেয়ে দ্বিগুণ লোক আজ এখানে সমবেত হয়েছে। যথাযথ নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ আরম্ভ হলে একের পর এক বক্তা গ্রেপ্তার হতে লাগলেন। এলগিন রোডে যতীন্দ্রমোহনের কাছে যখন এই সংবাদ পৌছল তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে মোটরে উঠলেন—সোজা চলে এলেন কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে। দেশপ্রিয় আসছেন—এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র জনতার মধ্যে সে কী উত্তেজনা! তিনি আসছেন শুনে লালবাজার থেকে আরো সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এসে হাজির হলো। সেই বাহিনীর পুরোভাগে ছিলেন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার গর্ডন সাহেব। খাঁটি লাল মুখ। লেখক ঐ দিনও এখানে উপস্থিত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন এসে পতাকা উত্তোলন করলেন এবং যখন তিনি জনতার সম্মুখে নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করতে উদ্যত হলেন তখন মিস্টার গর্ডন তাঁর সামনে এসে তাঁর হাতে একটি সংবাদপত্র দিয়ে বললেন, 'দেখুন স্যার, কাল কলেজ স্কোয়ারে কী হাঙ্গামা হয়েছে! আপনি কি এখানে সভা করবেন?'

—হ্যাঁ।

—আপনি কি এখন নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করবেন?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

তারপর উভয়ের মধ্যে বহু কথা-কাটাকাটি হয়। যতীন্দ্রমোহন তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সখারাম গণেশ দেউস্করের লেখা 'দেশের কথা' বইটি। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে মারাঠী স্বদেশপ্রেমিক এই বিখ্যাত বইটি লিখেছিলেন। বইটি তখন সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। প্রথমে পুলিশের লোক দেশপ্রিয়ের হাত

থেকে বইটি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে এবং তাতে কৃতকার্য না হতে পেরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর আরো কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মিস্টার টি. টি. রকস্‌বার্গ তখন ছিলেন কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁরই এজলাসে ১৪ই এপ্রিল যতীন্দ্রমোহন ও আরো কয়েকজনের বিচার হয়। বিচারে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অসম্মত হন এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ধৃত ছাত্রদের মধ্যে কেউই আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। সেদিন আদালতের ভিতরে ও বাইরে এই বিচার দেখবার জন্য প্রচুর জনসমাবেশ হয়েছিল। লেখক সেই বিচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বিচারে যতীন্দ্রমোহন ও ধৃত ছাত্রদের ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা অনুসারে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই ছয়মাস কাল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে যতীন্দ্রমোহন বন্দীজীবন যাপন করেছিলেন। এই সময়েই তিনি তাঁর বিপক্ষ দলের বিরোধিতা ও চক্রান্ত সত্ত্বেও পঞ্চমবারের মতো কর্পোরেশনের মেয়র-পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তার এর চেয়ে বড়ো নিদর্শন আর কি হতে পারে? শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এই সময়ে ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যতীন্দ্রমোহনের মেয়র থাকাকালীন সময়ে পৌরসভার কি কি উন্নতি সাধিত হয়েছিল সেই কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন কর্পোরেশনের ইংরেজ কাউন্সিলর মিঃ ফেলপস। 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় এই সম্পর্কে তিনি যে সুদীর্ঘ পত্রটি প্রকাশ করেন তাতে তিনি বলেছিলেন: 'The Swarajists, under the leadership of Mr. Sengupta have done three things, which had not been done by the Corporation under the old Act: better hospital facilities, free primary education and cheaper milk supply.' এই নিরপেক্ষ অভিমত থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, দেশপ্রিয়ের নেতৃত্বে পৌরসভা এর

প্রথম মেয়রের পরিকল্পনা বাস্তবে অনেকখানি রূপায়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মেয়র হিসাবে যতীন্দ্রমোহনের জনপ্রিয়তা শুধু যে তাঁর দলের লোকের কাছেই ছিল তা নয়, দলমত নির্বিশেষেই তিনি এই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁর মৃত্যুর পরে পৌরসভার নিজস্ব মুখপত্র 'দি ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট'-এর একটি বিশেষ সংখ্যায় যে সম্পাদকীয়টি লেখা হয়েছিল তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো:

'With single minded devotion, with no considerations other than those of the highest civic interests, with great agility, strict impartiality and wonderful dignity, Mr. J. M. Sen-Gupta discharged the duties of his exalted office, and his achievement evoked the admiration not only of those who called him to the Mayoral chair but of people of all shades of opinion inhabiting this vast cosmopolitan city.'

বস্তুত মেয়র হিসাবে তিনি যে কী পরিমাণ সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তা তাঁর কারান্তরালে থাকার সময়ে পঞ্চমবারের মতো ঐ উচ্চপদে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারেই যেন চূড়ান্তভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল সেদিন। এই কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে, কলকাতা পৌরসভায় মেয়র-পদে দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয়ের তুল্য এমন জনপ্রিয় মেয়র আজ পর্যন্ত নাগরিকগণ আর কাউকেই প্রত্যক্ষ করেন নি—কখনো করবেন কিনা সন্দেহ।

বলেছি, উনিশশো ত্রিশ সালটি ছিল যতীন্দ্রমোহনের জীবনে অত্যন্ত ঘটনাবহুল। ব্যাধির প্রকোপ অগ্রাহ্য করেই তিনি সেই সব তরঙ্গ-সঙ্কুল ঘটনাস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। দেশ-

ব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল; নেতারা সব একে একে কারারুদ্ধ হলেন। সেই সময়ে জওহরলাল নেহেরুর কারাদণ্ডের পর তাঁর স্থলে যতীন্দ্রমোহন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি-পদে মনোনীত হয়েছিলেন। এবং এই পদাধিকার বলে তিনিই তখন কংগ্রেসের এ্যাকটিং প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তরঙ্গায়িত স্বাধীনতা-সংগ্রামে সৈনিকগণের পুরোভাগে ন্যায্য স্থান গ্রহণ করে দেশপ্রিয় তাঁর দেশপ্রেমের যে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তা কোন-দিনই মুছে যাওয়ার নয়। দেশের কাজে দুঃখ ও নির্যাতনের কণ্টক-মুকুট হাসিমুখে শিরে ধারণ করতে তিনি কখনো পশ্চাদপদ হন নি। এমন কি বিপক্ষদলের বৈরিতা বা বিদ্বেষ তাঁকে কখনো বিচলিত করতে পারে নি।

১৯৩০। ১৫শে সেপ্টেম্বর।

দেশপ্রিয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে কারামুক্ত হলেন।

আইন-অমান্য আন্দোলন দেশে তখনো পুরোদমে চলছে। লর্ড আরউইনের গভর্নমেণ্ট কঠোর হাতে সেই আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছেন। ওয়ার্কিং কমিটি পর্যন্ত বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ তখন খুবই উত্তপ্ত ছিল। সদ্য কারামুক্ত যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে তখন একটু বিশ্রামেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি ওয়ার্কিং কমিটির প্রেসিডেণ্ট এবং বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে আর কেউ তখন বাইরে ছিলেন না, সেইজন্য তাঁকে এই সময়ে উত্তর-ভারতের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য সস্ত্রীক সফরে বেরুতে হলো। একে একে পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করে অবশেষে তিনি অমৃতসরে উপনীত হন।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৩০।

স্থান—অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগ।

অতীতের এক রক্তাক্ত স্মৃতি-বিমণ্ডিত এইস্থানে ঐ দিন যে জনসভা

হয়েছিল তাতে প্রধান বক্তা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি যখন দিল্লী থেকে অমৃতসর অভিমুখে যাত্রা করেন তখন দিল্লীর অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট দেশপ্রিয়ের উপর ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তিনি সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই এসেছিলেন এবং জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সভার অদূরেই পুলিশের গাড়ি মোতায়েন ছিল। তাঁকে সভাক্ষেত্রেই গ্রেপ্তার করে সেই গাড়িতে তুলে নিয়ে পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট সগর্বে প্রস্থান করেন। সঙ্গে সঙ্গে সভায় তুমুল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে পুলিশ তৎক্ষণাৎ সভা ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ওয়াকিং কমিটি তথা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের গ্রেপ্তারে বিক্ষুব্ধ হয়ে স্থানীয় মিউনিসিপালিটি ২৭শে অক্টোবর একটি প্রতিবাদ সভা করলেন। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ পাহারায় তাঁকে দিল্লীতে আনা হয়। দিল্লীর অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট যতীন্দ্রমোহনের বিরুদ্ধে ১২৪ (ক), সংশোধিত দণ্ডবিধি আইনের ১৭(১) ধারা ও Instigation Ordinance-এর ৩নং ধারা—এই তিন দফা আইন অনুসারে অভিযোগ নিয়ে এলেন। ৩০শে অক্টোবর তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হয়। যথারীতি এই বিচারেও দেশপ্রিয় আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। কিন্তু একটি বিবৃতি দাখিল করেছিলেন। এই বিবৃতিটির একস্থলে তিনি বলেছিলেন :

'You will no doubt send me to prison and I shall gladly go there as the day is fast approaching, when the noblest sons of India, now in jail, will demand an explanation from your masters.'

তাঁর নেতৃত্বের পরিণতি বুঝবার পক্ষে এই উদ্ধৃত অংশটুকুই যথেষ্ট। বিচারে এক বৎসর কালের জন্য তাঁর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হলো। ধীর ও শান্তভাবে দেশপ্রিয় সেই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করলেন। ৩রা অক্টোবর

দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর গ্রেপ্তারে রাজধানীতে জনসাধারণের মধ্যে সেদিন তুমুল বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। কংগ্রেস তথা ওয়ার্কিং কমিটির প্রেসিডেন্টের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড তারা সহজভাবে গ্রহণ করল না— তারা এর প্রতিবাদ জানাতে চাইল। কিন্তু দিল্লীতে তখন সমস্ত রকম রাজনৈতিক সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হয়েছে। সভা হবে কি করে? তথাপি সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই ৩০শে অক্টোবর দিল্লীতে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। দেশপ্রিয়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা সেই সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। এই অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও আত্মপক্ষ সমর্থনে বিরত থাকেন। বিচারে তাঁর চারমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার জীবনে সেই প্রথম কারাদণ্ড লাভ হলো এবং এজন্য তিনি নিজেকে বিশেষ গর্বিত বোধ করেছিলেন সেদিন। যাঁকে একদিন তিনি স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সেই তাঁর জীবনাদর্শের অনুগামিনী তিনি হতে পেরেছিলেন বলেই না পরবর্তীকালে শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা জাতির হৃদয়ে তাঁর স্বামীর তুল্যই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। একজন য়ুরোপীয় মহিলার পক্ষে এ বড়ো কম গৌরবের কথা ছিল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর সহধর্মিণীর এই কারাদণ্ড উপলক্ষে কলকাতা কর্পোরেশনে একটি বিশেষ সভা আহূত হয়েছিল ও সর্বসম্মতিক্রমে অভিনন্দন-জ্ঞাপক একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। সেদিন এই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বসু অকপটে যতীন্দ্রমোহনের গুণ-কীর্তন করেছিলেন। কর্পোরেশন ব্যতীত কলকাতার অন্যতম প্রভাবশালী ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা দেশপ্রিয়ের কারাগমন সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে যা লিখেছিল তা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। 'পত্রিকায়' লেখা হয়েছিল:

'The expected has happened. Sj. Jatindra Mohan

Sen-Gupta, the Acting President of the Congress, has been convicted by the District Magistrate of Delhi, of sedition as also of an offence under the Criminal Law Amendment Act and another under the Instigation Ordinance.···The Acting President of the Indian National Congress will therefore have to suffer incarceration for a period of one year and the country will be deprived of his wise counsel and mature judgment for a period of 12 months. It was only the other day that this brave and self-sacrificing son of Bengal came out of jail.'

অসুস্থ শরীরে বার বার এইভাবে কারাদণ্ড কিন্তু দেশপ্রিয়কে বিচলিত করতে পারে নি। তিনি শান্তভাবেই তাঁর প্রতি প্রদত্ত এই নতুন দণ্ডাদেশ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। দেশমাতৃকার সেবায় দেশপ্রিয় যে কী অসাধারণ দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছিলেন তা আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হয় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরই কলেজ-জীবনের সহপাঠী ও রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মজীবনীতে যতীন্দ্রমোহনের দেশপ্রেম ও দেশসেবার কথা খুব সামান্যই বলা হয়েছে। নেহেরুর আত্মচরিতেও তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয় নি। সুভাষচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইটিতেও যতীন্দ্রমোহনের কথা নেই বললেই হয়। অথচ কে না জানে যে, একসময়ে এই তিনজন দেশনেতা একই পতাকাতলে দেশপ্রিয়ের সতীর্থ ছিলেন। কিন্তু সে-কথা থাক, আমরা আমাদের কাহিনীতে ফিরে যাই।

১৯৩০ সালটি ছিল আন্দোলনেব বছর।

আইন-অমান্য আন্দোলনের তরঙ্গ শতধারায় যেন সেদিন প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল ভারতের সবত্র -শহব, জনপদ, গ্রাম সবত্রই জনসাধারণ কংগ্রেসেব নির্দেশে এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল। এই আন্দোলনের সাফল্য ও পূর্বেকার অসহযোগ আন্দোলন অপেক্ষা অনেক বেশি, অনেক ব্যাপক ছিল। এই আন্দোলন চলার কালেই কংগ্রেস তথা কংগ্রেসের প্রধান নেতা গান্ধীকে বাদ দিয়েই আপোস-আলোচনার জন্য বিলাতে প্রথম পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠক বসেছিল। এই বৈঠকে যোগদান করেছিলেন মডারেট নেতৃবৃন্দ যাঁরা ভারতবাসীব হয়ে শাসকেব সঙ্গে কথা বলার আদৌ যোগ্য ছিলেন না। তাই প্রথম পর্যায়েব বৈঠক বিশেষ ফলপ্রসূ হলো না দেখে ব্রিটিশ সবকার কংগ্রেসেব সঙ্গে আলোচনা করাব জন্য ব্যগ্র হলেন।

কংগ্রেস-বর্জিত প্রথম গোলটেবিল বৈঠকেব প্রতিনিধিরা খালি-হাতেই ফিরে এলেন। কাযত এই বৈঠক নিষ্ফল হয়। ইংল্যাণ্ডেব প্রধানমন্ত্রী তখন ম্যাকডোনাল্ড। সেই সময়ে এক বক্তৃতায় তিনি পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকে আইন-অমান্য আন্দোলন থেকে বিবত হতে অনুরোধ করেন। ঠিক এই সময়েই (৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১) মতিলাল নেহেরুব মৃত্যু হয়। তাব মৃত্যুর দিনেই তখন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকাবী প্রতিনিধিদের একদল ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এর ঠিক এগার দিন আগে, অর্থাৎ ১৯৩১-এব ২৬শে জানুয়ারি যারবেদা জেল থেকে গান্ধী মুক্তিলাভ করেছেন। ঐ একই তারিখে জওহরলালও মুক্তিলাভ কবেছিলেন।

আনন্দ ভবন, এলাহাবাদ।

মতিলালেব সেই প্রসিদ্ধ বাসভবন। তাঁর জীবিতকালেই নেহেরু-পরিবারের প্রাসাদোপম এই বাসভবনের অর্ধাংশ রূপান্তরিত হয়েছিল স্বরাজভবনে। কংগ্রেসের সদর দপ্তর তখন এখানেই অবস্থিত ছিল।

সেই স্বরাজভবনে গান্ধী তখন ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে মিলিত হন। গোলটেবিল বৈঠকে কতদূর কি হয়েছে তার আলোচনা হলো। বিশেষ নিমন্ত্রণে এই আলোচনায় দুইজন মডারেট নেতা স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী যোগদান করেছিলেন। এই বৈঠকেই ঠিক হয় যে, গান্ধী বড়লাট লর্ড আরউইনকে একটি পত্র লিখে তাঁর সঙ্গে একটা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করুন ও সাক্ষাৎকারের সময় খোলাখুলিভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করুন।

গান্ধী সম্মত হলেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধী লর্ড আরউইনকে একটি চিঠি পাঠালেন। বড়লাট গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সানন্দে রাজী হলেন। দিল্লী থেকে তারযোগে এই বার্তা এসে পৌঁছল এলাহাবাদে। কালবিলম্ব না করে গান্ধী দিল্লী যাত্রা করলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি বেলা দু'টোর সময়ে লাটভবনে আরম্ভ হয় গান্ধী-আরউইন সাক্ষাৎকার। সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের আনুপূর্বিক বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে শুধু উল্লেখ করব সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের ফলাফল যা এখন গান্ধী-আরউইন চুক্তি নামে ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই চুক্তিই সেদিনকার রাজনীতিতে একটা বড়ো রকমের দিক্-পরিবর্তন সূচিত করে দিয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না, বরং সমসাময়িক রাজনীতি বা রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা এই প্রসিদ্ধ চুক্তিদ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল।

গান্ধী-আরউইন আলোচনা দীর্ঘকাল চলেছিল—প্রায় কুড়ি দিন। এর আগে বা পরে ভারতের আর কোনো বড়লাটের সঙ্গে এমন গুরুত্ব-পূর্ণ আলোচনা গান্ধীর কখনো হয় নি। তাই সেদিন সারা ভারতের দৃষ্টি যেন সহসা নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এই আলোচনার উপর। আলোচনা যখন কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে তখন নেহেরু প্রমুখ ওয়ার্কিং

কমিটির কয়েকজন সদস্যকে গান্ধীজি দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আইন-অমান্য আন্দোলন কিন্তু তখনো চলছিল। আর চলছিল সরকারী দমননীতি। আন্দোলন আর আপোসের জন্য আলোচনা—ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে যুগপৎ এমন দু'টি বিপরীত জিনিস আমরা কখনো প্রত্যক্ষ করি নি।

গান্ধী কি সরকারের সঙ্গে আপোস করবেন?

সত্যাগ্রহীর কি উচিত রাজশক্তির প্রতিনিধির সঙ্গে এইভাবে সাক্ষাৎ করা? এই রকম কত প্রশ্ন সেদিন জেগেছিল জনসাধারণের মনে। জেগেছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মনেও। সবাই ভাবে কী অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ গান্ধীজি। যিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, আবার তিনিই যাদের প্রতি আপোসের হস্ত প্রসারিত করে দেন! তাদের শয়তান বলেন, আবার তাদের সঙ্গেই বন্ধুভাবে কথাবার্তা বলেন। গান্ধী নিঃসন্দেহে মূর্তিমান স্ব-বিরোধিতা, তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয়রাই সময় সময় এই রকম মন্তব্য করতেন। আজকেও এই গান্ধী-আরউইন সাক্ষাৎকারের সময়ে অনেকে সেই কথা বললেন।

কিন্তু বললে কি হয়, তিনিই যে জাতির নেতা।

শুধু নেতা নন, বর্তমানের আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব যে তাঁকেই দিয়েছে কংগ্রেস। তাই দেখা যায় যে, এই-সময়ে যখন দিল্লীতে একদিন জওহরলাল গান্ধীজিকে প্রশ্ন করলেন: 'সংগ্রামের সঙ্গে আপোস-আলোচনার মিল কোথায়?'—তখন তিনি এই উত্তর দিয়েছিলেন: 'একজন সত্যাগ্রহী হিসাবে যাদের সঙ্গে আমার প্রবল মতভেদ আছে সেই বিরোধীদলের সঙ্গেও আপোসের কথা বলতে বাধা কোথায়?'

যে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমরা আজ সংগ্রামে লিপ্ত আছি তাদের সঙ্গে আপোসের কথা চিন্তাই করা যায় না।—এই ছিল সেদিন-কার সংগ্রামী ভারতের মনোভাব। এই পটভূমিকাতেই ঘটেছিল এই গান্ধী-আরউইন সাক্ষাৎকার। আর এর ফলাফলের জন্য সকলেই

সেদিন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। ছয় দফা দাবী জানিয়েছিলেন গান্ধী বড়লাটের কাছে : ১. রাজনৈতিক বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তিদান ; ২. অবিলম্বে দমননীতির প্রত্যাহার ; ৩. বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া ; ৪. রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত সকল সরকারী কর্মচারীর পুনর্নিয়োগ ; ৫. লবণ তৈরি করার জন্য সকলকে স্বাধীনতা দান এবং ৬. মদের দোকান ও বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং ও পুলিশি অত্যাচারের যথোপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করা।

লর্ড আরউইন শান্তিবাদী ছিলেন।

আবার গান্ধীর মতো তিনিও ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ।

সহসা গান্ধী-আরউইন আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল।

কয়েকদিন ধরে বড়লাট গান্ধীজিকে আর ডেকে পাঠালেন না।

তবে কি কথাবার্তা মাঝপথে ভেঙে গেল ?—সকলের মনে জাগল এই সংশয়, এই প্রশ্ন। তারপর ৪ঠা মার্চ তারিখে স্বাক্ষরিত হলো বহু-প্রত্যাশিত গান্ধী-আরউইন চুক্তি। ঐ দিন মধ্যরাত্রে লাটভবন থেকে গান্ধী ফিরলেন চুক্তির খসড়া নিয়ে। নেহেরু খসড়াখানি দেখলেন। দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। মনের মধ্যে নানা চিন্তা ভীড় করে আসে। আইন-অমান্য আন্দোলন শেষ হলো—আন্দোলনের নেতা স্বয়ং কথা দিয়ে এসেছেন। কংগ্রেসের অন্যান্য সদস্যরাও দেখলেন চুক্তির সেই খসড়া। আলাপ-আলোচনার পর সকলে এতে সম্মতি দিলেন। তবে সেই সঙ্গে তাঁরা এই কথাটাও গান্ধীকে জানিয়ে দিলেন যে, এই সন্ধি দ্বারা কংগ্রেস তার মূলনীতি প্রত্যাহার করছে না। অর্থাৎ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঠিকই রইল। অতঃপর ৫ই মার্চ মধ্যাহ্নকালে লাটভবনে স্বাক্ষরিত হলো গান্ধী-আরউইন চুক্তি।

এই চুক্তির ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বন্দী-সভ্যগণ মুক্তি লাভ করেন। তারপর বিভিন্ন প্রদেশের হাজার হাজার অহিংস-বন্দী বেরিয়ে এলেন কারাগার থেকে। শান্ত হয়ে ওঠে চারদিকের পরিবেশ, বইতে থাকে শান্তির বাতাস। এই চুক্তিতেই ঠিক হয়েছিল

যে, কংগ্রেস-পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধী লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন। প্রথমবারের বৈঠকটি ছিল অনেকটা শিবহীন যজ্ঞের মতো। তাই সেই বৈঠক ব্যর্থ হয়েছিল বললেই হয়। গান্ধী-আরউইন চুক্তি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস-পক্ষ থেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং যাতে দেশের লোক এই চুক্তির সকল শর্ত প্রতিপালনে যত্নবান হন, তারও নির্দেশ দেওয়া হয়। আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছিল বললে ঠিক বলা হবে না। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তিটা ছিল একটা সাময়িক সন্ধি বা Truce এবং এই সন্ধি অনুসারে আন্দোলন তখনকার মতো মুলতুবী রাখা হয়েছিল।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্তানুসারে ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৩১, যতীন্দ্রমোহন মুক্তিলাভ করেন। কারণ তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তাও স্বামীর সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন। দেশপ্রিয় যখন দিল্লী জেলে বন্দীজীবন যাপন করছিলেন তখন সেখানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদও কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনিও তাঁদের সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন, কারণ মৌলানা সাহেবও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। সকলেই একসঙ্গে কলকাতায় ফিরলেন ৩রা ফেব্রুয়ারি হাওড়া স্টেশনে উপনীত হন। সেখানেই এক বিশাল জনতা তাঁদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল। পৌরসভার ডেপুটি মেয়র শ্রীসন্তোষকুমার বসু কয়েকজন কাউন্সিলর-সহ সেদিন হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন দেশপ্রিয়কে অভিনন্দিত করবার জন্য।

॥ আঠারো ॥

১৯৩১। করাচী কংগ্রেস।

এই বছরের বসন্তকালে করাচীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হয় তাতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতের কয়েকটি প্রদেশ থেকে সভাপতির জন্য যতীন্দ্রমোহনের নামও প্রস্তাবিত হয়েছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত ছিল। কারণ এই সময়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে দেশপ্রিয় সত্যিই একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন।

করাচী কংগ্রেসের কথা বলবার আগে যতীন্দ্রমোহনের চট্টগ্রাম পরিদর্শনের কাহিনীটা সংক্ষেপে উল্লেখ করব। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি এখানে আসতে পারেন নি: তাই তাঁর কারামুক্তির পর চট্টগ্রাম-বাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি দিল্লী থেকে কলকাতায় পৌঁছে এখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর সস্ত্রীক চট্টগ্রাম যাত্রা করেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, চট্টগ্রামে উপনীত হওয়ার পর যতীন্দ্রমোহন বিপুলভাবেই অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। স্টেশন থেকে তাঁর বাসভবন পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পাঁচটি তোরণ দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল এবং পথের দু'পাশেই অজস্র নর-নারীর সমাবেশ ঘটেছিল। সে যেন এক দিগ্বিজয়ী বীরের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু তাঁর সেই অভ্যর্থনা একেবারে অনাবিল আনন্দের মধ্যে সম্পন্ন হতে পারে নি। কারণ গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে কেবলমাত্র অহিংস রাজবন্দীরাই

কারামুক্ত হয়েছিলেন ; কিন্তু যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লব পথের পথিক, অথবা যাঁরা মনে-প্রাণে অসহযোগী তেমন বন্দীদের এই উপলক্ষে মুক্তি দেওয়া হয় নি। দেশে যখন পূর্ণোদ্যমে আইন-অমান্য আন্দোলন চলছিল তখন একদিন (১৮ এপ্রিল, ১৯৩০) চট্টগ্রামের স্বাধীনতা-কামী কয়েকজন বিপ্লবী যুবক সূর্য সেনের নেতৃত্বে সরকারের স্থানীয় অস্ত্রাগারটি লুণ্ঠন করে। সেই দুঃসাহসিক ঘটনা সারা ভারতবর্ষে চমকের সৃষ্টি করেছিল সরকারের মনে ও অহিংসবাদীদের মনে।

বস্তুত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনাবলী সেদিন প্রমাণিত করে দিয়েছিল যে, বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলন স্তিমিত হয় নি। বিপ্লবীরাও দেশপ্রেমিক ছিলেন। কিন্তু গান্ধী-আরউইন চুক্তির মধ্যে বিপ্লবাত্মক নীতির অনুসরণকারী বন্দীদের মুক্তিপ্রদানের কোনো কথা ছিল না। এইজন্য চট্টগ্রামের জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ সেদিন যতীন্দ্রমোহনের অভ্যর্থনায় যোগদান করেন নি। তখনো এখানে স্পেশাল ট্রিবিউনালের আদালতে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা চলছিল। এই মামলারই জনৈক তরুণ একটি কৃষ্ণপতাকা হস্তে দেশপ্রিয়কে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন। কথিত আছে, যতীন্দ্রমোহন হাসি-মুখেই যুবকটির হাত থেকে সেই কৃষ্ণপতাকা গ্রহণ করেছিলেন। এখানকার সমারোহপূর্ণ অভ্যর্থনা তাঁকে আনন্দ দান করলেও, তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে, গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে দেশের জনসাধারণ খুব বেশি উল্লসিত হতে পারে নি। মহাত্মা গান্ধী সহিংস রাজবন্দিগণের অনুকূলে কোনরকম চেষ্টা করেন নি--জনসাধারণের এই মনোভাব থেকে যতীন্দ্রমোহন বুঝলেন যে, তাঁরা যে শুধু গান্ধীর উপরে বিদ্বিষ্ট তা নয়, তাঁর সহযোগী নেতাদের প্রতিও তাঁরা বিরূপ হয়ে উঠেছেন। সেই কৃষ্ণপতাকাটি ছিল এরই প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি।

যতীন্দ্রমোহন অহিংসার একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন, তিনি মাটির তলার অর্থাৎ গুপ্ত আন্দোলনে কোনদিনই আস্থাবান ছিলেন না। তিনি

প্রকাশ্য আন্দোলনেই বিশ্বাসী ছিলেন। এইজন্য বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে কোনদিনই তাঁর যোগাযোগ ছিল না। ছিল না বলেই তাঁর নেতৃত্বের পিছনে বিপ্লবীদের কোনো সমর্থনই ছিল না। দেশবন্ধু বা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এইখানে তাঁর একটা বড়ো রকমের পার্থক্য ছিল। হিংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে ভারতবাসী কোনদিনই স্বাধীনতা লাভ করবে না—এই বিশ্বাসে তিনি অটল ছিলেন। চিত্তরঞ্জনও এই মত পোষণ করতেন, কিন্তু তিনি বিপ্লবীদের তাঁর বুকে টেনে নিতে পেরেছিলেন এবং এইজন্য তাঁদের উপরে তিনি অমন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন তা পারেন নি; বরং তাঁকে বহুবার বিপ্লবীদের কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। চট্টগ্রামের একজন বিপ্লবী তাঁকে বলেছিলেন, মহাত্মাজি শুধু তাঁর অহিংস অনুগামীদের সমর্থন করেন; এই চুক্তিদ্বারা তিনি তাঁদের পথে বসিয়ে দিয়েছেন। যতীন্দ্রমোহন এর কোনো উত্তর দিতে পারেন নি। কিন্তু বিপ্লবীদের দেশপ্রেম সম্পর্কে তাঁর মধ্যে শ্রদ্ধা-বোধের অভাব কখনো দেখা যায় নি।

চট্টগ্রামে এইবার তিনি একটি বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর সেই বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি বিপ্লবীদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অকপটভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'এখন দেশে একটি গুরুতর সমস্যা এসেছে। অহিংস ও সহিংস অসহযোগে দেশে দুইটি বিভিন্নমুখী কর্ম-প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা বিপ্লবপন্থী, তাঁরা অহিংস-অসহযোগের উপযোগিতায় বিশ্বাসহীন, আবার যাঁরা অহিংস-অসহযোগে আস্থাবান, তাঁরা বিপ্লববাদে আস্থাহীন। একথা স্বীকার করতেই হবে, দেশে বিপ্লববাদীদের সংখ্যা খুব কম। আমরা তাঁদের দেশপ্রেমের খুবই প্রশংসা করি। কিন্তু একথাও আমি বলি যে, এই পথে আমাদের মুক্তি আসবে না। কয়েকটি ইংরেজকে মারলেই যে তাঁরা শঙ্কিত হয়ে আমাদের সঙ্গে মীমাংসা করতে ব্যগ্র হয়ে উঠবেন, এ বিশ্বাস আমার একেবারেই নেই। আমাদের স্থির বিশ্বাস, এই

অসহযোগ আন্দোলন শাসক জাতিকে শঙ্কিত করে তুলেছে ও ব্যস্ত করে তুলেছে এবং এই পথেই আমাদের মুক্তি আসবে।'

যতীন্দ্রমোহন কলকাতায় ফিরলেন একটি নতুন চিন্তা নিয়ে। দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ গান্ধী-আরউইন চুক্তির জন্য অনেকখানি শান্ত ছিল বললেই হয়। কিন্তু তিনি বুঝলেন দিল্লী-চুক্তির প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে নানাভাবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে এবং এই বিষয়ে জনসাধারণের ধারণা তখনো পর্যন্ত খুব পরিষ্কার ছিল না। সামনেই করাচী কংগ্রেস এবং সেখানেই এই চুক্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

করাচী কংগ্রেসের কথা এইবার বলি।

১৯৩০ সালটি সত্যাগ্রহের বৎসর ছিল—ছিল আন্দোলনের বৎসর। তাই ঐ বছরে কংগ্রেসের অধিবেশন যথাসময়ে হতে পারে নি। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিকায় ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে করাচীতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসল। এই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এই কংগ্রেসেই গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও সেই চুক্তির শর্তগুলি অনুমোদিত হয় ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য গান্ধীকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি সদলে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে গমন করেন।

করাচী কংগ্রেসের ঠিক প্রাক্কালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শেষ হয়। এই ষড়যন্ত্র মামলারই অন্যতম আসামী ছিলেন যতীন দাস, যিনি তেষট্টি দিন অনশন করার পর লাহোর জেলে মারা যান। এই মামলায় বহু আসামী ছিলেন; তাঁদের মধ্যে বিচারে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু—এই তিনজনের প্রাণদণ্ড হয়। দেশের বহু লোক এবং বহু প্রতিষ্ঠান ভগৎ সিং-এর প্রাণরক্ষার জন্য গান্ধীকে চাপ

দেন এবং সেই চাপের দরুন তিনি লর্ড আরউইনের কাছে একটি পত্র লিখে ভগৎ সিং-এর ফাঁসির হুকুম মকুব করবার জন্য অনুরোধ করেন। সে অনুরোধ উপেক্ষিত হয় এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বেই ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়। বলা বাহুল্য, এই ঘটনাটি সেদিন কংগ্রেস অধিবেশনে একটি গভীর শোকের ছায়াপাত করেছিল।

করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এই গুরুত্বের হেতু ছিল বহু-বিতর্কিত গান্ধী-আরউইন চুক্তি। সমসাময়িক বিবরণ ও কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে এই চুক্তির বিষয়টি নিয়ে সেদিন দারুণ মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। অথচ এটি কংগ্রেস কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন, নতুবা গান্ধীর পক্ষে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান সহজ হবে না। কথিত আছে, ভগৎ সিং-এর ফাঁসির প্রতিক্রিয়া এমন তীব্র হয়েছিল যে, গান্ধী যখন করাচী অভিমুখে যাত্রা করেন তখন পথিমধ্যে বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁর প্রতি কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শন করেছিল; কোথাও কোথাও তাঁর মাথার উপরে কালোরঙের পুষ্প বর্ষণ করা হয়েছিল। সমগ্র অধিবেশনটি কি রকম পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার একটি বর্ণনা আছে রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন:

'Throughout the Karachi session, public feelings remained at a fever pitch. Though the people were not disrespectful to Gandhiji, they unburdened their feelings at the mammoth prayer meetings held every morning and evening. The deep agitation of the Congress delegates was evident in their speeches at the session.'

চুক্তির শর্ত অনুসারে বহু সত্যাগ্রহী কারামুক্ত হয়ে করাচী কংগ্রেসে যোগদান করতে এসেছিলেন এবং তাঁদের একটি বৃহৎ

অংশ চুক্তিকে এই বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, অবশেষে সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। এই জাতীয় প্রচার যদিও কিছুটা অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, তথাপি চুক্তি-বিরোধীদের কলগুঞ্জন বড়ো কম সোচ্চার ছিল না এবং বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে অনেকের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত গান্ধী-আরউইন চুক্তি কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করতে পারবে কিনা। করাচী কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাবটিই ছিল গান্ধী-আরউইন চুক্তির অনুমোদন। মোট কথা, কংগ্রেসের এই অধিবেশনে একটি প্রবল প্রতিপক্ষ গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরোধিতা করবার জন্য যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই সমবেত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল তাঁর আত্মচরিতে যা লিখেছেন তা বিশেষভাবেই স্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন

'The principal resolution at Karachi dealt with the Delhi Pact and Round Table Conference. I accepted it, of course, as it emerged from the Working Committee but when I was asked by Gandhiji to move it in the open Congress, I hesitated. It went against the grain and I refused at first.'

দেখা যাচ্ছে যিনি ভবিষ্যতে গান্ধীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহন করবেন সেই জওহরলালের মনেও দিল্লী চুক্তি অনুমোদন করা খুব সহজ ছিল না সেদিন। ছিল না গান্ধীর আরো অনেক ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের যাঁরা মনে করেছিলেন যে, দিল্লী চুক্তির ফলে স্বাধীনতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, স্বীকৃত হয়েছে ব্রিটিশ রাজশক্তির সার্বভৌমত্ব এবং প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি একান্তভাবেই ব্রিটিশ রাজশক্তির উপর নির্ভর করছে। এইপ্রকার যুক্তির সম্মুখীন হওয়া গান্ধী-সমর্থকদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই সেদিন কঠিন ছিল। কিন্তু করাচী কংগ্রেসে একজন উপস্থিত

ছিলেন যিনি বিরোধী পক্ষের সম্মুখীন হতে পেরেছিলেন। তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যতীন্দ্রমোহন তখন একটি অনন্যলব্ধ গৌরবের স্থান অধিকার করেছেন। প্রথম সারির একজন নেতা হিসাবে তখন তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। শুধু যে ত্যাগ, নির্ভীকতা, বাগ্মিতা ও ঐকান্তিক দেশপ্রেমের জন্য কংগ্রেসে তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল তা নয়, তাঁর তৎকালীন 'ইমেজের' পিছনে ছিল দেশপ্রিয়ের অত্যাশ্চর্য রাজনৈতিক জ্ঞান আর কংগ্রেস তথা গান্ধীর প্রতি তাঁর আনুগত্য। তাই দিল্লী চুক্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থাপনের দায়িত্ব ন্যস্ত হলো জওহরলাল নেহেরুর উপর কিন্তু ঐটি সমর্থন করার দায়িত্ব দেওয়া হলো যতীন্দ্রমোহনের উপর।

যথাসময়ে নেহেরু প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন।

যমুনাদাস মেহতা করলেন তার তীব্র বিরোধিতা।

গান্ধী তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে স্থিরভাবে বসে আছেন মঞ্চের একপাশে। দিল্লী চুক্তি তখন তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন সময়ে মঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়ালেন শুভ্র খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরিশোভিত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। অপূর্ব ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক তাঁর চেহারা। মুহূর্তমধ্যে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো তাঁর প্রতি। অভ্যাসমতো তিনি চোখ থেকে তাঁর সেই প্রসিদ্ধ পাঁসনেটা একবার খুললেন, রুমাল দিয়ে সেটি মুছলেন এবং আবার স্বস্থানে সেটিকে স্থাপন করে তিনি একবার তাঁর সামনে উপবিষ্ট প্রতিনিধিদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর জলদগম্ভীর স্বরে প্রস্তাবটির অনুমোদনে একটি যুক্তিগর্ভ বক্তৃতা দান করলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন :

'Mr. Mehta has not yet realised that the great movement which was led by Mahatmaji and the Indian National Congress, during the last twelve

months had demonstrated to the whole world that the Congress has got power behind it, that it has got the whole Indian masses behind it···. Those, who are opposed to the resolution say, 'Let us first cut off British connection and for a period, let there be no connection, equal or otherwise, with Britain'.···Those people do not realise the gigantic power, which the Indian nation has got behind the leadership of Mahatma Gandhi. It is that which will give us Swaraj, which, at one stroke, will give up the British connection of master and slave, of exploiter and exploited that exists today.

'Remember that never in the history of modern India did you see the spectacle of the high and mighty British Government in India, talking, negotiating and pleading on equal terms, with Mahatmaji the representative of the Indian nation. For the first time in the history of modern India has this been done, namely, recognition of the power behind that frail man, the power of the nation'.

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, যতীন্দ্রমোহনের এই দৃপ্ত বক্তৃতাটি ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং কংগ্রেসে দিল্লী চুক্তি বিরোধীদলের সংখ্যা বহুল পরিমাণেই হ্রাস পেয়েছিল। এইকথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সেদিন করাচী কংগ্রেসে জওহরলালের প্রস্তাব যে গৃহীত হয়েছিল তার পিছনে ছিল দেশপ্রিয়ের এই যুক্তিগর্ভ বক্তৃতা। তাঁর এই বক্তৃতাটিই সেদিন বিপক্ষ শিবিরে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিঃসন্দেহে এটা ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনে একটি বড়ো রকমের achievement বা সাফল্যলাভ। কিন্তু নেহেরু তাঁর আত্মচরিতে করাচী কংগ্রেসে শুধু

নিজের বক্তৃতার কথাই উল্লেখ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, দেশপ্রিয়ের এই বিখ্যাত বক্তৃতাটি সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সতীর্থ সম্পর্কে এই রকম অনুদারতা প্রদর্শন আমরা কোনোমতেই সমর্থন করতে পারি না।

দেশপ্রিয়ের নেতৃত্বের যশোগৌরব তখন সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কংগ্রেসের একজন শক্তিমান নেতা হিসাবে তিনি ইতি-পূর্বেই স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করেছিলেন, কিন্তু করাচী কংগ্রেসের পর জনচিত্তে তিনি যেন অধিকতর মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং তারই নিদর্শন দেখা গেল যখন করাচী কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে তিনি কেরল প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি-পদে নির্বাচিত হলেন। এই কনফারেন্সে সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটিরও প্রশংসা মাদ্রাজের বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই বক্তৃতার মধ্যে দিল্লী চুক্তির কথা উল্লেখ করে দেশপ্রিয় বলেছিলেন: 'এই সন্ধিতে এই অর্থ স্পষ্টই নিহিত রয়েছে যে, যদি এর সকল শর্ত প্রতিপালিত না হয়, অথবা, যদি এর শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কংগ্রেস পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ করতে পারবে।···ব্রিটিশ জাতি আগামী গোলটেবিল বৈঠকে যে মনোভাবের পরিচয় দেবেন, তার উপরেই নির্ভর করছে সংগ্রাম আবার শুরু করা বা না করা। সন্ধিতে এমন কোনো কথাই নেই, যাতে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ বৈঠকে ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করতে পারবেন না।' তাঁর এই বক্তৃতার শেষেই দেশপ্রিয় এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন: 'There can be no compromise with the principle of political sovereignty.' একমাত্র দেশবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার উত্তরাধিকারীর পক্ষেই এমন আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ কথা বলা সম্ভবপর ছিল। দেশপ্রিয় নিঃসন্দেহে অনেক বিষয়ে দেশবন্ধুরই প্রতিমূর্তি ছিলেন।

॥ উনিশ ॥

স্যর স্ট্যানলি জ্যাকসন তখন বাংলার গভর্নর।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকে বাংলায় সন্ত্রাসবাদীদের কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, বৃদ্ধি পেতে থাকে রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা। বিপ্লবীদের একটা বৃহৎ অংশ তখন বক্সা দুর্গে ও হিজলী জেলে অন্তরীণাবদ্ধ হয়ে আছেন। এই কারণে জনসাধারণ খুবই বিক্ষুব্ধ ছিল। তাদের সেই বিক্ষুব্ধ মনোভাব আরো বৃদ্ধি পেল যখন দেখা গেল যে, দিল্লী চুক্তির ফলে সন্ত্রাসবাদী একটি বন্দীও মুক্তিলাভ করল না। এই অবস্থার প্রতিকার কিভাবে সম্ভব এবং জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, লাট সাহেব বিশেষভাবেই তা নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। তখন বাংলার নেতা বলতে একজনই ছিলেন যাঁর সঙ্গে গভর্নর এই বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাইলেন। অবশেষে অনেক চিন্তার পর তিনি একদিন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে লাটভবনে আহ্বান করলেন।

যতীন্দ্রমোহন ইতিমধ্যে করাচী কংগ্রেস থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে বাংলার অশান্তিকর পরিবেশ সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ বোধ করছিলেন। সামনেই গোলটেবিল বৈঠক, আর সেই বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করতে চলেছেন মহাত্মা গান্ধী। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে এই বৈঠকে। এমন অবস্থায় ভারতের, বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা শান্তিপূর্ণ থাকাই বাঞ্ছনীয়—এই রকম চিন্তা দেশপ্রিয় যখন তাঁর এলগিন রোডের

বাসভবনে বসে করছিলেন ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখনই একদিন লাটভবন থেকে চিঠি এলো তাঁর কাছে। গভর্নর তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চান—এই ছিল চিঠির বক্তব্য। যতীন্দ্রমোহন এলেন।

—Mr. Sen-Gupta, I want to discuss with you about the situation now prevailing in Bengal.

—That's very nice, your Excellency. But it is very much desired that the discussion between ourselves should be free and frank.

—Most certainly, Mr. Sen-Gupta.

তারপর উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ আলোচনা হয়। আলোচনার শেষে গভর্নর যতীন্দ্রমোহনকে একবার হিজলী ও বক্সায় অন্তরীণাবদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে সাড়া দিলেন তিনি এবং পর-পর ঐ দু'টি স্থানে গিয়ে অন্তরীণাবদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁর এই আলোচনার ফলাফল গভর্নরকে জানাবার জন্য তিনি যখন দার্জিলিং গমন করেন তখন চাঁদপুরের পুলিশ ইনসপেক্টর তারিণী মুখার্জি বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে নিহত হয়েছেন। এই ঘটনাটি দেশপ্রিয় জানতেন না; তাই দার্জিলিং-এ এসে গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে তাঁর কথাবার্তা শুনে তিনি বিস্ময় বোধ না ক'রে পারেন নি; বুঝলেন সরকার এখন কঠোরহস্তে দমননীতি চালাতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আর কথাবার্তা না বলে দেশপ্রিয় কলকাতায় এলেন।

এই সময়ে বাংলাদেশে যে তিনটি ঘটনা ঘটেছিল এবং যার ফলে সমগ্র বাংলাদেশে গভীর শোকের ছায়াপাত হয়েছিল, সেই ঘটনা তিনটি এখানে উল্লেখ করা হলো। প্রথমটি ছিল উত্তরবঙ্গে বন্যার ভয়াবহ প্লাবন, দ্বিতীয়টি ছিল চট্টগ্রামে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের

অত্যাচার ও ব্যাপক লুঠতরাজ, আর তৃতীয়টি ছিল হিজলী বন্দী-শিবিরে গুলি-বর্ষণ ও তার ফলে দু'জন রাজবন্দীর মৃত্যু। বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তার উপরে মানুষের হাত নেই, তবে ত্রাণকার্যের ব্যবস্থাদ্বারা দুর্গতদের দুঃখ মোচন অনেকটা সাধ্যের মধ্যে। যে চট্টগ্রামে দীর্ঘকাল যাবৎ হিন্দু-মুসলমান পরম সম্প্রীতির মধ্যে বাস করে এসেছে, সেই চট্টগ্রামে মুসলমানের হাতে হিন্দুদের নিগৃহীত হওয়া এক মর্মান্তিক ঘটনা সন্দেহ নেই এবং চেষ্টা করলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব হয়ত ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর। কিন্তু সবচেয়ে বেদনাদায়ক ছিল হিজলীর ঘটনাটি—যার তুল্য নৃশংস ঘটনা ভারতের কোনো জেলে কখনো ঘটতে দেখা যায় নি। তাই সেদিন হিজলীর ঘটনা সর্বভারতীয় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছিল। তবে ঘটনা তিনটিই মর্মন্তুদ ছিল এবং যতীন্দ্রমোহন স্বয়ং যারপরনাই উদ্বেগ বোধ করেছিলেন সেদিন এই ঘটনা তিনটির জন্য এবং তিনটিতেই তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বাংলার নেতা হিসাবে, কংগ্রেসের একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে।

প্রথমে উত্তরবঙ্গের বন্যার কথা বলি।

১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে জলপাইগুড়ি, পাবনা, বগুড়া ও রাজসাহী অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে এক ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। এই কয়টি জেলাই বন্যার প্রকোপে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করবার জন্য এই সময়ে 'সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি' গঠিত হয়; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন এই সমিতির সভাপতি আর খাদি-প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন এর সেক্রেটারি। রিলিফের ব্যাপারে আরো দু'টি প্রতিষ্ঠান—প্রদেশ কংগ্রেস ও রামকৃষ্ণ মিশন—সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি সাহায্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। লেখক এই সময়ে কিছুকালের জন্য 'সঙ্কটত্রাণ সমিতি'র কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এই সময়ে বন্যা-প্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করবার জন্য পাবনা, বগুড়া ও রাজশাহী থেকে কর্মীরা কলকাতায় এসে যতীন্দ্রমোহনকে অনুরোধ করেন। সংবাদপত্রে বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী পাঠ করে তিনি বিচলিত বোধ করেছিলেন। বাংলার অন্যতম জননেতারূপে এই দুঃসময়ে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না—দুর্দশা-গ্রস্ত নরনারীর প্রতি তাঁর যে বিরাট কর্তব্য ছিল, দেশপ্রিয় মনে-প্রাণে তা অনুভব করছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী ক্ষিতীশচন্দ্র গাঙ্গুলিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এই সময়ে বন্যা-প্লাবিত কয়েকটি অঞ্চল পরিদর্শন করেন ও ঐ অঞ্চলগুলিতে রিলিফের কাজ যাতে আরো সুশৃঙ্খলার সঙ্গে নির্বাহিত হয় সেজন্য রিলিফ-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এই সময়ে উত্তরবঙ্গের বন্যা-বিধ্বস্ত স্থানগুলি বহুবিধ অসুবিধার মধ্যে তিনি এমন আন্তরিকতার সঙ্গে পরিভ্রমণ করেছিলেন যে, তাঁকে দর্শন করবার জন্য নদীর ঘাটে ঘাটে সহস্র সহস্র হিন্দু-মুসলমান নরনারীর সমাবেশ হতো। তাঁকে সন্দর্শন করা মাত্র জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠতো 'গান্ধীলাট' বলে।

কথিত আছে, প্রথম যখন 'গান্ধীলাট' কথাটি তাঁর কানে যায়, দেশপ্রিয় তার অর্থ বুঝতে পারেন নি।—'ক্ষিতীশ, এটা আবার কী শুনছি? গান্ধীলাট কথাটার মানেই বা কী?'—জিজ্ঞাসা করলেন দেশপ্রিয়। ক্ষিতীশবাবু কথাটার মানে বুঝিয়ে দিলেন—'লাটসাহেব যেমন রাজার প্রতিনিধি, তোমাকে ওরা মনে করে গান্ধীজির প্রতিনিধি, তাই একটি নতুন উপাধি বানিয়েছে 'গান্ধীলাট'।' অতি সাধারণ ও নিরক্ষর জনসাধারণের কাছ থেকে এই উপাধি লাভ করে যতীন্দ্রমোহন নিশ্চয়ই খুব পুলকিত বোধ করে থাকবেন। তিনি যে সেদিন বাঙালির কাছে কতদূর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, এই 'গান্ধীলাট' কথাটিই তার অভ্রান্ত নিদর্শন বহন করে। বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করা বড়ো সহজ ছিল না—পথঘাট সব ডুবে গিয়েছে, যানবাহন বিরল বললেই হয়। তথাপি পথের শত অসুবিধা উপেক্ষা করেই যতীন্দ্র-

মোহন সেদিন যেভাবে বন্যার্ত নরনারীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য উত্তরবঙ্গে ছুটে গিয়েছিলেন তা থেকেই আমরা তাঁর হৃদয়বত্তার পরিচয় পাই।

যতীন্দ্রমোহন যখন উত্তরবঙ্গে বন্যা-প্লাবিত স্থানগুলি পরিদর্শনে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে তাঁর কাছে চট্টগ্রাম থেকে এক ভয়াবহ সংবাদ এলো। সংবাদ এলো যে, সেখানে মুসলমানগণ স্থানীয় হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছে ও তাদের ঘর-বাড়ি লুঠতরাজ করেছে। খবর এলো যে, হিন্দু যুবকরা পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে, অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শহরে অরাজকতা, মুসলমান-সমাজে উত্তেজনা ও হিন্দু-সমাজে আশঙ্কা। খবর এলো যে, মুসলমানেরা অন্দরকিল্লায় হিন্দুদের দোকানগুলি লুঠ করেছে, কোনো কোনো দোকানে অগ্নি-সংযোগও করেছে। উপদ্রব সর্বত্রই হয়েছে—টেরীবাজার, বক্‌সির হাট, খাতুনগঞ্জ, লামাবাজার, চাকতাই, চর চাকতাই, ফিরিঙ্গি বাজার, সদর ঘাট, স্টেশন রোড—প্রভৃতি চট্টগ্রামের ব্যবসায়-প্রধান অঞ্চল-সমূহে কেবলমাত্র হিন্দুদের দোকানগুলিই লুণ্ঠিত হয়েছে, কোনো মুসলমানের দোকান কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

চট্টগ্রামের জনসাধারণ এই অবস্থায় তাদের নেতাকে স্মরণ করলো এবং অবিলম্বে তাঁর উপস্থিতি প্রার্থনা করলো। এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাটির সূত্রপাত হয়েছিল নিজাম-পল্টন মাঠে। সেদিন (আগস্ট ৩০, ১৯৩১) এই মাঠে একটি শিল্ড ফাইন্যালের খেলা ছিল। প্রায় বিশ হাজার দর্শকের সমাবেশ ঘটেছিল এই চমকপ্রদ খেলাটি দেখবার জন্য। বহু গণ্যমান্য দর্শকও উপস্থিত ছিলেন—তাঁদের মধ্যে উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারও ছিলেন। খেলায় যে দলে পুলিশের সহানুভূতি ছিল সেই দলটি জয়লাভ করে এবং এর ফলে পুলিশ-মহলে প্রচুর উত্তেজনা ও উল্লাস দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হয় যে, গুর্খা সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকে তলব করতে হয়। এই উন্মত্ত জনতার মধ্য থেকে একজনের বন্দুকের গুলিতে নিহত হলেন ইন্সপেক্টার খান-

বাহাদুর আসানুল্লা। এর থেকেই শুরু হয় হাঙ্গামা ও তা সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে।

এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে শুধু যে চট্টগ্রামের হিন্দু ব্যবসায়ীদের ক্ষতিসাধন হয়েছিল তা নয়, অনেক হিন্দু গৃহস্থের যথা-সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছিল। এমন অবস্থায় যতীন্দ্রমোহনকে চট্টগ্রামে আসতেই হলো। এই লুণ্ঠতরাজ ও হাঙ্গামার সংবাদ অনেকদিন চাপা ছিল—কলকাতার সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হতে পারে নি সরকারী সেন্সার-ব্যবস্থার জন্য। মহিমচন্দ্র দাস যখন চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার সকল সংবাদ নিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন তখন দেশপ্রিয় সবেমাত্র পাবনার বন্যা-প্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করে এখানে ফিরেছেন। সমস্ত বিবরণ শুনবার পর, বিষয়টি তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটিতে যতীন্দ্রমোহন ভিন্ন আরো দশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তদন্ত কমিটির সেক্রেটারি ব্যারিস্টার নিশীথচন্দ্র সেন ও আরো পাঁচজন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রমোহন সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগেই চট্টগ্রাম রওনা হন।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন: তখন চট্টগ্রামে নিদারুণ আতঙ্কের সময়। তদন্ত কমিটির সভ্যগণের পদার্পণে সে আতঙ্ক কিয়ৎপরিমাণ নিবারিত হয়। তখনো চট্টগ্রামে ১৪৪ ধারা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং কোনো জনসভা আহ্বান করা সম্ভবপর হইল না। যতীন্দ্রমোহনের অনুরোধে হিন্দু ব্যবসায়িগণ দোকান খুলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিশ্রুতির কথা সর্বত্র প্রচার করিতেছিলেন। ইহাতে আতঙ্কিত জনগণ আশ্বস্ত হইল। তৎপর তদন্ত কমিটির সভ্যগণ দুই-তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সাক্ষ্য-গ্রহণ ও লুণ্ঠিত দোকান-পাট পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করেন।'

যতীন্দ্রমোহন তাঁর পরিদর্শন ও তদন্ত কেবলমাত্র শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি পাঠীয়া ও বোয়ালখালি থানা দু'টির

অন্তর্গত প্রায় দশ-বারোটি গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং এইসব স্থানেও তিনি প্রত্যেকটি গ্রামের অধিবাসীদের দুর্দশা ও নির্যাতন কাহিনী শুনতে পেলেন। সর্বত্রই তিনি আতঙ্কিত ও নির্যাতিত গ্রামবাসিগণের প্রাণে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিলেন এবং সর্বত্রই তিনি সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর কথাও প্রচার করেছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাবর্তন করেই যতীন্দ্রমোহন আর কাল বিলম্ব করলেন না। কলকাতার জনসাধারণকে চট্টগ্রামের দুর্দশার কাহিনী জানাবার জন্য ও বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাবার জন্য তিনি টাউন হলে একটি সভার আয়োজন করলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর এই সভা হয়েছিল। লেখক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টার হিসাবে। বিরাট জনসভা হয়েছিল সেদিন টাউন হলে। এই সভায়, লেখকের আজো স্মরণ আছে, দেশপ্রিয় যে বক্তৃতাটি করেছিলেন তেমন প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা লেখক খুব কমই শুনেছেন। চট্টগ্রামের নির্যাতনের করুণ কাহিনীর সবটাই যেন তিনি তুলে ধরেছিলেন শ্রোতাদের সামনে। দেশপ্রিয় যে কত উঁচুদরের একজন বাগ্মী ছিলেন তা সেদিন অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার চট্টগ্রামের ঘটনার জন্য সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা টাউন হলের জনসভার পরে হয়। এই সময়ে স্যর স্ট্যানলি জ্যাকসনের সরকার নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার এক পত্রের উত্তরে দাবি করেছিলেন যে, 'কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দূরদর্শিতা ও কর্মতৎপরতার ফলেই চট্টগ্রামের হাঙ্গামা এত সত্বর নিবারিত হয়েছে।' সংবাদপত্রে যখন এই সংবাদ প্রকাশিত হয় তখন যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে গঠিত তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে এর একটি সমুচিত জবাব দেওয়া হয়েছিল। ঐ চিঠিতে সরকারী দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লেখা হয়েছিল: 'We do challenge the statement that it was wholly due to the foresight and energy of the local authorities that the trouble was so quickly

suppresed.....It is apparent that you are not even now in possession of correct facts, the incidents, which are the subject matter of our enquiry, are much too serious to be lightly dismissed by a mere official statement.'

টাউন হলের এই জনসভার অব্যবহিত পরে ২৮শে সেপ্টেম্বর কলকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় চট্টগ্রাম হাঙ্গামার বিষয়টি আলোচিত হয়। তখন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মেয়র ছিলেন আর যতীন্দ্রমোহন মহানগরীর ছয় নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাউন্সিলররূপে নির্বাচিত হয়ে পৌরসভায় প্রবেশ করেছিলেন। অল্ডারম্যান শরৎচন্দ্র বসু চট্টগ্রাম হাঙ্গামার জন্য একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবের সমর্থনে সেদিন পৌরসভার সেই বিশেষ সভায় যতীন্দ্রমোহন যে বক্তৃতা করেন তাতে তিনি সরকারী নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। এইভাবে যতীন্দ্রমোহন সেদিন চট্টগ্রামের হাঙ্গামার বিষয়টি নিয়ে নিজেকে যেভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, দেশবন্ধু-সম্পাদিত হিন্দু-মুসলমান চুক্তির তিনি যে একজন প্রবল সমর্থক মাত্র ছিলেন, তা নয়—তিনি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আজীবন মৈত্রী স্থাপনে তৎপর ছিলেন। কবি মিথ্যা বলেন নি যে, দেশপ্রিয় ছিলেন 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সেতু।'

হিজলী বন্দীনিবাসের মর্মন্তুদ ঘটনার কথা এইবার বলি।

১৯৩১, ১৬ই সেপ্টেম্বর।

হিজলী বন্দীনিবাসে নিরস্ত্র রাজবন্দিগণের উপর ক্যাম্পের প্রহরীরা বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে সন্তোষকুমার মিত্র এম. এ. বি. এল. ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত, এই দু'জন রাজবন্দী নিহত হন ও কুড়িজন রাজবন্দী আহত হন। হিজলীর সংবাদ যখন কলকাতায়

পৌঁছল তখন সমগ্র শহরে সে কী উত্তেজনা! নিহত বন্দী দু'জনের মধ্যে সন্তোষকুমার ছিলেন মধ্য কলকাতার কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি আর তারকেশ্বর ছিলেন বরিশালের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেলেন যতীন্দ্রমোহন এ্যাটর্নী রাজকুমার বসুর কাছ থেকে। রাজকুমারবাবু ছিলেন সন্তোষকুমারের ভগিনীপতি। যখন টেলিফোনে যতীন্দ্রমোহন রাজকুমারবাবুর কাছ থেকে এই নিদারুণ সংবাদ জানতে পারেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। তিনি যারপরনাই বিচলিত হয়ে উঠলেন। বিচলিত এবং মর্মাহত। সেই রাত্রিতে আর হিজলী যাত্রা করা গেল না। পরের দিন সকালেই তিনি হিজলী যাত্রা করলেন।

হিজলী বন্দীনিবাস।

খড়্গপুর স্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে জনমানবশূন্য প্রান্তরে অবস্থিত এই বন্দীনিবাসটি লেখক একবার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হিজলীতে উপস্থিত হয়েই দেশপ্রিয় বন্দীনিবাসের কম্যাণ্ডাণ্টের সঙ্গে টেলিফোনে সংযোগ করলেন ও বন্দীনিবাসের ভিতরে ঢুকবার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি মিলল না। ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে তিনি খড়্গপুর ফিরে এলেন। সেখানকার হাসপাতালে আহত রাজবন্দীদের কাছ থেকে গুলিবর্ষণের সমস্ত বিবরণ অবগত হলেন। ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি যখন প্রত্যাখ্যাত হলো তখন যতীন্দ্রমোহন মৃতদেহ দুইটি কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য দাবি করলেন। ক্যাম্প-কর্তৃপক্ষ তাঁর সেই দাবি উপেক্ষা করতে পারলেন না। খড়্গপুর থেকে একটি স্পেশাল ট্রেনে করে তিনি কলকাতায় নিয়ে এলেন সন্তোষকুমার ও তারকেশ্বরের প্রাণহীন দেহ দুইটি। লেখক সেদিন হাওড়া স্টেশনে যে করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা তাঁর স্মৃতিপটে আজো অম্লান আছে। যতীন দাসের শবদেহ হাওড়া স্টেশনে উপনীত হলে যে রকম জনসমাবেশ হয়েছিল, আজ যেন তার দ্বিগুণ জনসমাবেশ প্রত্যক্ষ করা গেল। এক বিরাট জনতা পুষ্পস্তবকে সজ্জিত একটি শবাধারে শহীদ-

যুগলের মৃতদেহ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল এবং কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

হিজলীর এই মর্মান্তিক ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ যারপরনাই বিচলিত হয়েছিলেন। কবি তখন অসুস্থ। তথাপি ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে মনুমেণ্টের পাদদেশে যে মহতী জনসভা হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য যখন দেশপ্রিয় তাঁর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেন, কবি তাঁর অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বীকৃত হলেন। এই স্মরণীয় সভায় কবি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তারই ফলে বাংলা সরকার হিজলী হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বিচারপতি এস. সি. মল্লিক। লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে উদ্বেলিত এই জনসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

'প্রথমে ব'লে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্র-আন্দোলনের বাহিরে। কর্তৃপক্ষের কৃত কোনো অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব সম্পর্কে যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে। এতবড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক; কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব ক'রে দিয়েছে।

'যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা ক'রে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধ'রে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা

ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অবমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাঁদের 'পরে, সেইসব শাসনকর্তা এবং তাঁহাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই, এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

'এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই ব'লে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী রাজা যত পরাক্রমশালী হোন না কেন, আত্মসম্মান হারানো তাঁর পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরায়ণতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিবৃত্ত করতে পারে কোন্ শক্তি! এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

'আমি আজ উত্তেজনা-বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাই না এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এ কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতঃই আপন কলঙ্ক-লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যত উচ্চে ধ'রে আছে, তত ঊর্ধ্বে আমাদের ধিক্কার-বাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছতে পারবে না। এ কথাও মনে রাখতে হবে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গভীর শান্তি যেন রক্ষা করি, যাতে ক'রে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করার ধৈর্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্বাসিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারি। উপসংহারে শোকসন্তপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের

আন্তরিক সমবেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও জানাই যে, এই মর্মভেদী দুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হ'লেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্যশিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।'

হিজলীর এই নৃশংস ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেইরকম বেদনা বোধ করেছিলেন, যেমন তিনি বোধ করেছিলেন বারো বছর আগে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই মর্মন্তুদ ঘটনায়। কবি সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রাজার দেওয়া মানের মুকুট 'নাইটহুড' উপাধি বর্জন করে। মনুমেণ্টের সভায় কবি তাঁর মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন ; এটি ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু কবি ভাষণ দিয়েই নিরস্ত থাকেন নি। এই সময়ে হিজলীর ঘটনা সম্পর্কে কারারক্ষীদের প্রতি দরদ দেখিয়ে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় যে সম্পাদকীয়টি লেখা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তারও একটি সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন। জাতির দুর্দিনে জাতির কবি এইভাবেই সেদিন জাতির স্বার্থকে রক্ষা করেছেন আর বেদনাকে দিয়েছেন ভাষা। দেশপ্রিয় তাই একান্তভাবে কবির গুণমুগ্ধ ছিলেন।

দু'দিন পরে ২৮শে সেপ্টেম্বর হিজলীর বন্দীনিবাসে গুলিবর্ষণ সম্বন্ধে কর্পোরেশনের এক সভায় যে আলোচনা হয় তাতে যতীন্দ্রমোহন সরকারের এই নৃশংস আচরণের তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন : 'The assault on the Hijli detenus was deliberate and not only that, it amounted to culpable homicide. I invite the Public Prosecutor of Calcutta to prosecute me when I publicly proclaim that the killing of the two detenus amounted to culpable homicide.' একমাত্র দেশবন্ধুর পক্ষে এইরকম নির্ভীক উক্তি করা সম্ভবপর ছিল।

কিছুদিন পরের কথা।

যতীন্দ্রমোহন এসেছেন সন্তোষকুমার মিত্রের বাড়িতে। তিনি কংগ্রেসের নেতা, মৃত সন্তোষকুমার কংগ্রেসেরই একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। তাই কর্তব্যবোধেই তাঁকে আসতে হয়েছিল। দেশপ্রিয়কে দেখতে পেয়ে সন্তোষকুমারের বিধবা স্ত্রী তাঁর সামনে এসে সজল নয়নে যখন বললেন—'আমার স্বামীকে এনে দিন, তিনি তো আপনারই একজন অনুগামী কর্মী ছিলেন'—তখন সেই করুণ দৃশ্য দেখে আর কাতর আর্তনাদ শুনে তাঁর পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়েছিল। অদূরে পাষাণ প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে সন্তোষ-কুমারের জননী এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। নিঃসন্দেহে দেশপ্রিয় একটি সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বের মহত্ত্ব এইখানেই।

॥ কুড়ি ॥

তাঁর বিরামহীন কর্মজীবনে বিশ্রামের অবকাশ খুব কমই ছিল। রক্তের চাপবৃদ্ধি-জনিত অসুখের ফলে এইসময়ে যতীন্দ্রমোহনের স্বাস্থ্যের খুবই অবনতি ঘটেছিল। তাই তাঁর বন্ধুগণ ও চিকিৎসকগণ তাঁকে সমস্ত রকম কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে বিশেষভাবেই অনুরোধ করলেন এবং কিছু দিনের জন্য ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও গিয়ে বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দেশের সেই সঙ্কটজনক সময়ে তিনি সহসা দেশ ত্যাগ করতে সম্মত হলেন না। শুধু স্বাস্থ্যের অবনতি নয়, এই সময়ে তাঁর আর্থিক দুশ্চিন্তাও প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেশপ্রিয় তখন বিপুলভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত থাকার দরুন তাঁর অর্থাগম একেবারে ছিল না বললেই হয়। নিয়মিত প্র্যাকটিসও করতে পারতেন না, অথচ তাঁকে একটি বিরাট পরিবার প্রতিপালন করতে হতো। তাঁদের চট্টগ্রাম ও গ্রামের বাড়িতে বহু ভাড়াটিয়া ছিল, কিন্তু তারা কেউ নিয়মিত ভাড়া দিত না।

অবশেষে হৃতস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ইংল্যাণ্ডে যাওয়া স্থির হলো। লাইফ ইনসিওরেন্সের পলিসি বন্ধক রেখে তিনি ইংল্যাণ্ড যাওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করলেন। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে দেশপ্রিয় সস্ত্রীক ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলেন। সমুদ্রযাত্রার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছিল এবং কিছুটা মানসিক প্রফুল্লতা তিনি লাভ করেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে কন্যা ও জামাতাকে সন্দর্শন করে মিসেস গ্রে খুবই আনন্দিত হলেন। তাঁর জামাতা আজ ভারতবর্ষের

জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতার গৌরব লাভ করেছেন, এজন্য তাঁর গর্বের সীমা ছিল না। যতীন্দ্রমোহন যখন ইংল্যাণ্ডে এসে উপনীত হলেন তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করতে মহাত্মা গান্ধী লণ্ডনে রয়েছেন। কাজেই যতীন্দ্রমোহন এখানে এসে প্রথম সুযোগেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হিজলীর বন্দীনিবাসে গুলিবর্ষণ ও বন্দীহত্যা, চট্টগ্রামের হাঙ্গামা ও লুঠতরাজ সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা যতীন্দ্রমোহন গান্ধীকে জানালেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বা হিজলীর ঘটনার বিবরণ লণ্ডনের কোনো সংবাদপত্রেই সেদিন প্রকাশিত হয় নি এবং সেইজন্য এই দু'টি ঘটনা সম্পর্কে গান্ধী কিছুই অবগত ছিলেন না। যতীন্দ্রমোহনের কাছে সব কথা শুনে তিনি যুগপৎ বিচলিত এবং বিস্মিত হয়েছিলেন। বিস্ময় এই কারণে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কোনো বিবরণ লণ্ডনের কোনো কাগজে প্রকাশিত হয় নি। তাই সেদিন কথাপ্রসঙ্গে গান্ধী তাঁকে বলেছিলেন : 'To remain silent over these incidents is the result of a conspiracy.' এ কথা সেদিন অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে অথবা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডে বা য়ুরোপের অন্যত্র যথোপযুক্ত প্রচারের অভাব দেখেই তো সুভাষচন্দ্র সেই সময়ে বিদেশে একটি ভারতীয় সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। তাঁরই প্রস্তাবানুসারে বিদেশে প্রচারের জন্য তখন থেকে এই কংগ্রেসের একটি বৈদেশিক বিভাগ খোলা হয়েছিল।

বিশ্রামলাভের জন্য তিনি লণ্ডনে এসেছিলেন, কিন্তু যতীন্দ্র-মোহনের ভাগ্যে বিশ্রামসুখ বোধ হয় ছিল না। তা যদি থাকত, তাহলে তাঁকে আমরা অকালে হারাতাম কিনা সন্দেহ। এখানে উপনীত হয়েই তিনি তাই আবার বহুবিধ রাজনৈতিক কর্মের আবর্তের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়লেন। লণ্ডনে তাঁর বিবিধ রাজনৈতিক কর্মের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হাউস অব কমন্স-এ প্রদত্ত বক্তৃতা। স্থানীয় ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগেই এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটাও তাঁর সর্বভারতীয় নেতৃত্বের একটা পরোক্ষ স্বীকৃতি ছিল বললেই হয়। হাউস অব কমন্স-এ দাঁড়িয়ে দেশপ্রিয় সেদিন বলেছিলেন :

'ভারতবর্ষে আজ এমন সময় উপস্থিত হয়েছে, যখন দু'হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ইণ্ডিয়া হাউস থেকে আর শাসন করা চলবে না। ভারতের ব্যুরোক্রেসী দায়িত্বহীন, এবং দায়িত্বহীন বলেই হিজলীতে বন্দীহত্যা ও চট্টগ্রামে অত্যাচার, অনাচার সংঘটন সম্ভবপর হয়েছে। দায়িত্ববিহীন এই শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ করা দরকার। ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার ভারতবাসীর হাতেই ছেড়ে দিতে হবে।'

সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দেশপ্রিয়ের এই বক্তৃতাটির প্রশংসা বিলাতের রক্ষণশীল দলের অনেক সভ্য করেছিলেন। তাঁর অভিমতের সঙ্গে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যতীন্দ্রমোহনের স্পষ্টবাদিতা ও ঐকান্তিকতার খুব প্রশংসা করেন।

লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শেষ হলো।

গান্ধী ভারতবর্ষে ফিরলেন শূন্য হাতে। বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া ভারতবাসীর মনে দেখা দিতে বিলম্ব হয় নি। ১৯৩১, ২৮শে ডিসেম্বর, গান্ধী বোম্বাইতে পদার্পণ করলেন। তখন ভারতের নতুন বড়লাট লর্ড উইলিংডন। ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেই তিনি কঠোর হস্তে দমননীতি চালাতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে সীমান্ত প্রদেশে আব্দুল গফুর খাঁ, উত্তরপ্রদেশে জওহরলাল গ্রেপ্তার হয়েছেন। এছাড়া, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক রাখার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে। এই অর্ডিন্যান্সকে 'The X'mas gift from our Christian Viceroy'—এই বলে অভিহিত করেছিলেন গান্ধী সেদিন। তিনি বুঝলেন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে। তিনি এই বিষয়ে নতুন বড়লাটের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে আলোচনা করতে চাইলেন। একবার নয়, তিনি দু'বার এই

অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়। তিনি তখন প্রকাশ্যে সরকারকে চুক্তিভঙ্গের জন্য দায়ী করে একটি বিবৃতি দিলেন। উইলিংডন এর জবাব দিলেন সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর তিনি আবার যারবেদা জেলে প্রেরিত হলেন। বাংলায় সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুও গ্রেপ্তার হলেন।

ইংল্যাণ্ডে বসে এইসব সংবাদ পেয়ে যতীন্দ্রমোহন আর কাল-বিলম্ব না করে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। তখনো তাঁর স্বাস্থ্যের লক্ষ্যণীয় উন্নতি হয় নি, হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আরো কিছুকাল ওদেশে অবস্থান করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির আকস্মিক পট-পরিবর্তন তাঁর মনে স্বভাবতই গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। নিজের অসুস্থ শরীরের কথা চিন্তা করলেন না। স্বাস্থ্যের কথা তিনি বিবেচনা করলেন না—ইংল্যাণ্ডে থাকতে তাঁর মন যেন আর কিছুতেই চাইছিল না। প্যারিস হয়ে তিনি একটি ইতালীয় জাহাজে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন। ভারতে ফিরে আসা প্রয়োজন হয়েছিল আরো এই কারণে যে, নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে আইন-অমান্য আন্দোলন আবার পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়েছিল।

১৯৩২। ২০শে জানুয়ারি।

যতীন্দ্রমোহনের জীবনের আর একটি স্মরণীয় তারিখ।

জাহাজ সবেমাত্র বোম্বাই বন্দরে এসে পৌঁছেছে। তখনো নোঙর করা হয় নি। সেই অবস্থায় একদল পুলিশ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে একটি মোটর-লঞ্চে জাহাজের মধ্যে উঠে এল এবং যতীন্দ্র-মোহনকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হলো। জাহাজের কাপ্তেন তীব্রভাবে আপত্তি জানালেন। কারণ সেটা ছিল ইতালীয় জাহাজ এবং সেই জাহাজের কোনো আরোহীকে জাহাজের মধ্যে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা

ভারত সরকারের ছিল না। পুলিশ ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পরে ইতালীয় দূতাবাসের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তাঁকে ১৮১৮ সালের তিন আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। এই শেষবারের মতো যতীন্দ্রমোহন ভারত সরকারের হাতে বন্দী হলেন এবং বন্দী অবস্থাতেই তাঁর জীবনান্ত ঘটে। যতীন্দ্রমোহন যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর পত্নী ও ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী আইলীন। জাহাজ ঘাটে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন তাঁর পুত্র শিশির এবং সহকর্মী ক্ষিতীশ গাঙ্গুলি ও দ্বিজেন কুণ্ড।

গ্রেপ্তার করার পর দেশপ্রিয়কে যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো সেই সংবাদ কিছুকাল তাঁর পরিবারবর্গের নিকট অজ্ঞাত ছিল। পরে জানা গিয়েছিল যে, তাঁকে দার্জিলিঙ্ জেলে রাখা হয়েছে। এইখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্ষিতীশবাবু দেশপ্রিয়ের শরীরের অবস্থা দেখে যারপরনাই উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। অসুখ বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ কোনো সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। খবর পেয়ে শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা তৎক্ষণাৎ তাঁর স্বামীকে দেখবার জন্যে দার্জিলিঙ্ এলেন। স্বামীর অবস্থা দেখে তিনিও রীতিমত শঙ্কিত হলেন এবং বড়লাট থেকে আরম্ভ করে বাংলার গভর্নর--সকলের কাছে তারযোগে যতীন্দ্রমোহনের স্বাস্থ্যের অবস্থা জানিয়ে অবিলম্বে তাঁকে একটি স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে স্থানান্তরিত করার জন্য আবেদন জানালেন. তারপর কিছুকাল যাবৎ তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলে রেখে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, যেহেতু তাঁকে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়েছিল সেইজন্য তাঁর পরিবারবর্গের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার থেকে মাসিক এক হাজার টাকা করে দেওয়া হতো।

এক বছরের কিছু বেশি সময় দেশপ্রিয়কে জলপাইগুড়ি জেলে বন্দীজীবন যাপন করতে হয়েছিল। এখানে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু সুচিকিৎসার আয়োজন এখানে ছিল না। অনেক বিষয়ে তাঁকে স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাধির

উপশম হওয়া দূরে থাক, রোগ বৃদ্ধি পেতেই লাগল। তখন তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেও তাঁকে সর্বদা পুলিশ পাহারায় থাকতে হতো, কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কারো সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ করার উপায় ছিল না। একমাত্র তাঁর পত্নী প্রত্যহ বৈকালে স্বামীর সঙ্গে অবস্থানের অনুমতি পেয়েছিলেন। তখন যাঁরা বাইরে থেকে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে লাঠিতে ভর দিয়ে পদ-চারণারত যতীন্দ্রমোহনকে দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, তাঁর সেই বলিষ্ঠ দেহ ব্যাধির প্রকোপে সেইসময়ে কিরকম জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে যতীন্দ্রমোহনের এক জীবনীকার লিখেছেন: 'রোগ-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট যতীন্দ্রমোহন মরণের কথাই বেশি ভাবিতেন—তাঁহার জীবন-দীপ যে নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছে, তাহা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন। কারা-জীবনের বজ্রচাপে একদিকে তিনি যেমন আত্মীয়-স্বজনগণের নিত্য সাহচর্যে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া একাকী রোগশয্যায় ছটফট করিতে থাকিতেন। প্রাণের উৎসাহ, উদ্যম, আশা-ভরসা, হাসি-আমোদ ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিতেছিল।'

এর উপর ছিল বাংলাদেশের সেই চিরন্তন রাজনৈতিক কলহ। সুভাষ-সেনগুপ্ত বিরোধ তখনো চলেছে। সুভাষচন্দ্রও তখন ঐ একই মরচে-পড়া আইনে ধৃত হয়ে দেশপ্রিয়ের মতো বন্দীজীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু দুই পক্ষের অনুগামীদের মধ্যে দলীয় সংঘর্ষের উত্তাপ হাসপাতালে বসে যতীন্দ্রমোহন অনুভব করতেন, কারণ এই সময়ে দুইপক্ষের লোকই এসে এই বিষয়ে তাঁর মতামত চাইতেন। রোগশয্যায় শায়িত যতীন্দ্রমোহনের মনের শান্তি এজন্য কতদূর বিঘ্নিত হয়েছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। আত্মকলহের অভিশাপ থেকে দেশ মুক্ত হোক, এই তিনি চাইতেন।

হাসপাতালে যতীন্দ্রমোহন যখন ব্যাধি-ক্লিষ্ট দীর্ঘ কারাবাস ভোগ করছিলেন তখন (১৯৩৩) কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হওয়ার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসের বিশিষ্ট সকল নেতাই তখন কারাগারে। বাংলার নেতারা সবাই তখন কারারুদ্ধ। পুরুষসিংহ যতীন্দ্রমোহন হাসপাতালে বন্দীজীবন যাপন করছেন। দেশের সর্বত্র চলেছে নেতাবিহীন আন্দোলন। সেই বিক্ষুব্ধ পরিবেশে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হলে সরকার থেকে তা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে, এমন আশঙ্কাও অনেকে করলেন। তথাপি বাংলার অবশিষ্ট নেতারা গোপনে আয়োজন করতে লাগলেন। কোথায় অধিবেশন হবে, সে-কথা গোপন রাখা হয়েছিল। এই অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করার জন্য শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাকে অনুরোধ করা হয়। তিনি স্বামীর অনুমতি নিয়ে সম্মতি দিলেন। এই অধিবেশন বিপজ্জনক হবে জেনেও বহু প্রতিনিধি কলকাতায় আসতে লাগলেন। একমাত্র তাঁরাই জানতেন মহানগরীর কোন্ স্থানে এই অধিবেশন বসবে। এই অধিবেশন বসেছিল চৌরঙ্গীর নিকটবর্তী ট্রাম কোম্পানীর বিশ্রামাগারে। প্রতিনিধিরা একে একে এখানেই সমবেত হয়েছিলেন। নির্ধারিত সময়ে নির্বাচিত সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। তার পর দু'-তিনটি প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হয়। ঠিক সেই সময়ে দলে দলে পুলিশ সেই স্থানটি ঘিরে ফেলল। পুলিশ আগে থেকেই সতর্ক ছিল। কিন্তু এমন একটা স্থানে, মাত্র স্বল্পসংখ্যক জনতার সম্মুখে কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে, এটা তাদের ধারণায় আসে নি। বহু প্রতিনিধিসহ সভানেত্রী গ্রেপ্তার হলেন ও পুলিশের লাঠিতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। এই লেখক সেই অভিনব দৃশ্যের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা ও কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ দু'দিন হাজতবাসের পর কারামুক্ত হন।

স্থান : 'নগেন্দ্র লজ' ; রাঁচী।

অবশেষে বাংলা সরকার যতীন্দ্রমোহনের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে ও সার্জন-জেনারেলের পরামর্শে তাঁকে রাঁচীতে স্থানান্তরিত করলেন। কারাবন্দী হিসাবে নয়। অন্তরীণাবদ্ধ রাজবন্দীরূপে। তাঁর রাঁচী-যাত্রার দিন যতীন্দ্রমোহনের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু গোপনে সংবাদ পেয়ে তাঁকে বিদায় জ্ঞাপন করবার জন্য হাওড়া স্টেশনে সমবেত হয়েছিলেন। হায়! তাঁরা কি তখন জানতেন যে, এর অল্পকাল পরেই এইখানেই তাঁরা আবার সমবেত হবেন তাঁদের প্রিয়তম নেতার প্রাণহীন দেহকে অভ্যর্থনা করবার জন্য!

পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তরীণের জীবন যাপন করতে লাগলেন যতীন্দ্রমোহন। মনে কত আশা, তিনি আরোগ্য লাভ করবেন, তিনি কারামুক্ত হবেন এবং তিনি আবার রাজনীতিতে ফিরে আসবেন। বাংলার রাজনীতিকে ভেদ-বিরোধের কলুষ থেকে মুক্ত করার বিষয়টিও এই সময়ে তাঁর চিন্তায় বিশেষভাবেই স্থান পেয়েছিল বলে জানা যায়। আমরা কল্পনা করতে পারি যে, রাঁচীর সেই নির্জন 'নগেন্দ্র লজে' কতদিন গভীর রাত্রে বিনিদ্র শয্যায় বসে যতীন্দ্রমোহন কখনো জীবনের পশ্চাতে কখনো বা জীবনের সম্মুখে চেয়ে দেখতেন। লক্ষ চিন্তার ফুলঝুরি যেন তখন তাঁর মনের আকাশে ফেটে ফেটে ঝরে পড়ত। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি তাঁর রাঁচী-জীবনের সঙ্গীদের কাছে প্রায়ই বলতেন, 'ভবিষ্যতের জন্য প্ল্যান তো অনেক করছি, কিন্তু শরীরের যা অবস্থা দেখছি তাতে আর বেশি দিন মেয়াদ আছে বলে মনে হয় না।'

দেশপ্রিয় কি জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে এই কথা বলেছিলেন?

তিনি কি ব্যাধির প্রকোপে মনোবল হারিয়েছিলেন?

অথবা, এই সময়ে মাঝে মাঝে মৃত্যুর ছায়া তাঁর মনের মধ্যে উঁকি মারত?

প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। তাঁর জীবনের দুই তট দিয়ে সর্বদা আশা-ভরসা হিল্লোলিত হতো। তথাপি তাঁর রাঁচী-জীবনের দিনগুলি আনন্দ ও বেদনা মিশ্রিত ছিল। এই সময়ে তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করে মাঝে মাঝে শান্তি লাভ করতেন। সারা বাংলাদেশের জনসাধারণ যখন নিত্য তাঁর আরোগ্য কামনা করছিল, তখন একদিন আচম্বিতে রাঁচীর শৈলশিখর থেকে বজ্র নিপতিত হলো বাঙালির মাথায়—দেশপ্রিয় আর নেই।

১৯৩৩। ২২শে জুলাই। শনিবার।

ঐ দিন রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে দেশপ্রিয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর শেষ মুহূর্তে কোনোরকম শারীরিক আক্ষেপ-বিক্ষেপ পরিদৃষ্ট হয় নি···অতি শান্তভাবেই তিনি দেহত্যাগ করেন। পত্নী নিকটেই ছিলেন, কিন্তু তাঁকে শেষ কথা বলতে পারলেন না—এমন কি শেষ সম্ভাষণটি পর্যন্ত নয়।

আট বছর আগে প্রায় একই সময়ে দার্জিলিঙ্-এর শৈলশিখরে দেহরক্ষা করেছিলেন দেশবন্ধু। তবে তাঁকে তখন বন্দীজীবন যাপন করতে হয় নি। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু ছিল বড়ো বেদনাদায়ক। সিংহ যেন বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করলেন। যাঁর মাথায় একদিন সম্মানের ত্রিমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং, যাঁর নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদী, জনসাধারণের হৃদয়-আসনে যাঁর ছিল প্রতিষ্ঠা—বাঙালির সেই সর্বজনপ্রিয় নেতার এইভাবে বন্দীশালায় মৃত্যু বাঙালির কাছে চিরকাল এক পরম বেদনার কাহিনী হয়ে থাকবে। দেশপ্রিয় তখন কতখানি জনপ্রিয় ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এই মহানগরীতে তাঁর শবযাত্রার সময়ে। লেখক সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের প্রাণহীন দেহ তাঁর স্বজাতির কাছ থেকে কী অভূতপূর্ব সম্মানই না লাভ করেছিল।

যতীন্দ্রমোহনের জীবনের বিকাশ ছিল, কিন্তু পরিণতি ছিল না ; কারণ পরিণতির মধ্যপথেই মহাকালের রূঢ় বিধানে সেই জীবনের উপরে নেমে এসেছিল যবনিকা। বয়সের বিচারে তাঁর নেতৃত্বের চরম পরিণতি ভারত বাসী দেখবার সুযোগ পায় নি। প্রতিশ্রুতিপূর্ণ এমন নেতৃত্বের অবসান আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা বলেই ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকের কাছে পরিগণিত হবে। আরো গভীর বেদনাদায়ক বলে বিবেচিত হবে এইজন্য যে, বাংলা থেকে সুদূর বিহারে বন্দিশালায় তাঁর জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়েছিল। কলকাতা থেকে দার্জিলিঙ্-এ 'স্টেপ য়্যাসাইডে' পীড়িত অবস্থায় দেশবন্ধুর মৃত্যু আর কলকাতা থেকে রাঁচীতে 'নগেন্দ্র লজে' বন্দী অবস্থায় দেশপ্রিয়ের মৃত্যু বাঙালির কাছে দু'টি সমান বেদনাদায়ক ঘটনা হিসাবে তাঁদের স্মৃতিতে চির-জাগ্রত থাকবে। দেশবন্ধু আর দেশপ্রিয়—এই দু'টি নাম তাই ধ্রুবতারার মতোই বাঙালির মনের আকাশে চিরদিন—নিরবধি কাল—ভাস্বর হয়ে বিরাজ করবে ত্যাগ ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে। যুগ হতে যুগান্তরে—কাল হতে কালান্তরে পরিকীর্তিত হবে এই দু'টি নাম—দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয়।

এই দুই মহান্ নেতা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের এক জীবনীকার যথার্থই লিখেছেন : 'বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে চিত্তরঞ্জন ও যতীন্দ্রমোহন দুইটি ধ্রুব নক্ষত্র। যে বয়সে প্রকৃত কর্মজীবন, নেতৃ-জীবন বিকশিত হওয়া স্বাভাবিক, তাঁহারা সে বয়সেই মহাকালের ফুৎকারে অস্তমিত হইয়া গিয়াছেন। উভয়ের জীবনে কয়েকটি বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান এবং উভয়ের আদর্শ একমুখী হইলেও উভয়ের জীবন-নাট্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যতীন্দ্রমোহন স্বীয় জীবনে বারংবার চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্ব প্রভাব স্বীকার করিলেও কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার জীবনে একটি স্বতন্ত্র সত্তার বিকাশ-

লাভ ঘটিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন ও যতীন্দ্রমোহন উভয়েই অসহযোগী, উভয়েই জাতির বিরাট নেতা। উভয়েই জাতির চিত্তকে নেতৃত্বের উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উভয়েই বিরাট ব্যক্তিত্বপূর্ণ নেতা। উভয়ের ত্যাগ ও দেশ-সেবা অনন্যসাধারণ।—দেশবন্ধু নেতৃত্বের সাধনা করেন নাই—নেতৃত্বই সাধিয়া আসিয়া তাঁহার ললাটে জয়টীকা অঙ্কন করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু লোকমতের শ্বেত-হস্তী যতীন্দ্রমোহনের শিরে নেতৃত্বের মুকুট স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে নেতৃত্ব আকৃষ্ট হয় নাই। দেশবন্ধু নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—যতীন্দ্রমোহন নেতৃত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্ব গণ-নেতৃত্ব হইলেও উহা আভিজাত্যের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের নিকট গণ-নেতৃত্ব গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে স্থাপিত হইয়াছিল।'

দেশপ্রিয়ের মৃত্যুর পরে এই লোকপ্রিয় নেতার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্ভীক যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তাঁর মাতৃভূমির উন্নতিবিধানের জন্য তাঁর কাছে কোনো ত্যাগই বড়ো বলে বিবেচিত হয় নি। আইন-ব্যবসায়ে তাঁর প্রচুর পশার ছিল, কিন্তু দেশের আহ্বানে তিনি সেই ব্যবসায় ত্যাগ করেন এবং সপরিবারে দুঃখকষ্টের জীবনকে বরণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আচরণে মহৎ, শিষ্টাচারে বিনম্র ছিলেন বলেই না তিনি ভারতবর্ষের একজন সর্বজনপ্রিয় নেতা বলে গণ্য হয়েছিলেন। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটকালে তাঁর মতো একজন নেতাকে হারানো জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাজবন্দী হিসাবে দীর্ঘকাল কারান্তরালে থাকার ফলেই তাঁর অকাল-মৃত্যু ঘটেছে। তিনি যেমন শান্তিকামী তেমনি মার্জিত রুচির মানুষ ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেশজননীর আহ্বান শুনলেন তখন স্বাধীনতার বেদীমূলে স্বীয় জীবনকে সানন্দে প্রদান করতে

তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। কর্মে মহৎ ও ত্যাগে বিশুদ্ধ এমন একটি জীবনের স্মৃতি আমাদের কাছে যুগপৎ গৌরব ও লজ্জার বিষয়।'

যতীন্দ্রমোহন একজন প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে যখন মহানগরীতে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়, তখন অনেকের হয়ত স্মরণ আছে, দেশীয় সংবাদপত্রের শিরোনামায় একটি প্রসিদ্ধ ইংরেজী কবিতা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছিল: 'Home they brought her warrior dead.' সত্যিই রণস্থলে মৃত যোদ্ধাকে যেমন সমারোহের সঙ্গে তাঁর স্বদেশবাসী এনেছিলেন, ঠিক সেই রকম সমারোহের সঙ্গেই রাঁচী থেকে কলকাতায় পুষ্পস্তবকে সজ্জিত দেশ-প্রিয়ের মরদেহ নীত হয়েছিল। সে যেন রণক্ষেত্রে নিহত এক বীর যোদ্ধারই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন! মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন: 'Deshapriya has died the death of a martyr.' সত্যি, চরম আত্মোৎসর্গের ভিতর দিয়ে যতীন্দ্রমোহন শহীদের মৃত্যুকেই বরণ করেছিলেন। এমন মৃত্যু যাঁর ভাগ্যে ঘটে, অমরত্ব লাভ একমাত্র তাঁর পক্ষেই সুনিশ্চিত।

যে পৌরসভা তাঁকে পাঁচবার মেয়রের পদে নির্বাচিত করেছিল সেই কর্পোরেশনের নিজস্ব মুখপত্র 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে' যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে যে সম্পাদকীয়টি লেখা হয়েছিল তার এক স্থলে বলা হয়েছিল:

'It is not however, as Mayor alone that we must see him today···We should indeed be false to his memory if we did not recognise that it was not a mere personal honour which his fellow-citizens did him by placing on his modest brow the Mayoral laurels on five occasions, but that it was the tribute of his people through their representative in the

city council to the great cause he made his own. It was the cause of India's freedom. Jatindramohan had seen a vision—vision of a liberated India. No service was too exacting, no sacrifice too great for him for the achievement of that vision.'

স্বপ্ন অনেকের জীবনে থাকে, কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলবার জন্য যে ত্যাগ, যে সাহসের প্রয়োজন হয়, অনেক নেতার জীবনে তার অভিব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয় না। সুখের বিষয় যতীন্দ্রমোহনের স্বপ্ন ছিল এবং সাধনাও ছিল—ত্যাগের সাধনা, বীর্যের সাধনা। বাংলা তথা ভারতের সমকালীন রাজনীতিতে এই-খানে তিনি অপ্রতিরথ ছিলেন বললেই হয়।

সকল শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবনে তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে থাকে দ্বিবিধ সত্তা, তার একটির প্রকাশ হলো বাইরে জনসাধারণের কাছে—নির্ভীক, অপরাজেয়, ও অমিত প্রভাবসম্পন্ন। আর অপরটি—যা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত—হলো শান্ত, সরল এবং স্নেহপ্রবণ। যতীন্দ্র-মোহনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরাই তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই দ্বিবিধ সত্তা প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হতেন। যাঁরা তাঁর বক্তৃতাগুলি পাঠ করেছেন তাঁরা দেখেছেন এক যতীন্দ্রমোহনকে, অন্যদিকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে জানতেন তাঁরা তাঁর মধ্যে একজন পুরোদস্তুর বাঙালী ভদ্রলোককেই দেখেছেন—দেখেছেন তাঁর মুখের সেই বিনম্র হাসি, যে হাসিটির পরেই তিনি সব সময়ে তাঁর পাঁসনেটি একবার খুলে আবার নাকের উপরে ঠিকভাবে বসাতেন। আর কৌতুকপ্রিয়তা। দেশবন্ধুর মতোই আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় দেশপ্রিয় আপাদমস্তক খাঁটি বাঙালী ছিলেন। এইটাই ছিল তাঁর চরিত্রের বড়ো গৌরব।

যতীন্দ্রমোহন, সকলেই জানেন, একজন সুদক্ষ স্পোর্টসম্যান ছিলেন। স্পোর্টসম্যানসুলভ বহু গুণ তাঁর ব্যক্তিত্বকে একটা আশ্চর্য

ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছিল। একজন বিদেশী সাংবাদিক তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন :

'An all-round sportsman, Mr. J. M. Sen-Gupta played cricket all his life. Politician and a sportsman is a rare combination in India. He combined in himself with these virtues. He was a virile politician and a versatile sportsman.'

রাজনীতি ভদ্রলোকের নয়—এই ছিল দেশপ্রিয়ের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। তথাপি তিনি যে বাংলার দল ও উপদলীয় স্বার্থ-সংঘাত-জনিত পঙ্কিল রাজনীতির আবর্তের মধ্যে থেকেও তাঁর মনের প্রসন্নতা ও হৃদয়ের উদারতা দুই-ই অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তার কারণ, তিনি সারাজীবনই ছিলেন ক্রীড়াসুলভ এক দুর্লভ মানসিকতার অধিকারী। এই ক্ষেত্রে তিনি সত্যিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আর এই গুণেই দেশপ্রিয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনে 'The idol of the people' হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। একজন সুদক্ষ স্পোর্টসম্যান ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে অত সহজে দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মবলিদান সম্ভবপর হয়েছিল। তাঁর অন্তরঙ্গজনের মুখে বহুবার শুনেছি—'He was a perfect gentleman as well as a sportsman at the same time.' ভদ্রতা ও সৌজন্যে তিনি শত্রু-মিত্র সকলেরই প্রিয় ছিলেন। এই ভদ্রতা ও সৌজন্য তাঁর পক্ষে কোনো অর্জিত সম্পদ ছিল না—এ ছিল প্রকৃতির দান। প্রকৃতিই যেন তাঁকে ভদ্রতা ও সৌজন্যের প্রতিমূর্তি করে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। এই কথা বললে সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ হবে না যে, বাংলাদেশে আমাদের কালে দেশপ্রিয়ের মতো এমন ভদ্রতা ও সৌজন্যের আধার মানুষ আমরা খুব কমই দেখেছি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে এই গুণ দু'টি সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। আর এই ছিল তাঁর জীবনব্যাপী জনপ্রিয়তার মূল ভিত্তি।

অনেককে বলতে শুনেছি যে, যতীন্দ্রমোহন দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেও দেশবন্ধুর মতো একেবারে প্র্যাকটিস ত্যাগ করেন নি বরং বরাবর তিনি আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। কথাটি সত্য এবং সত্য নয়—দুই-ই। তাঁর অর্থের প্রয়োজন ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের গোড়ার দিকে দেশবন্ধু তাঁকে তিন মাস প্র্যাকটিস বন্ধ রাখতে বলেছিলেন। তখন আন্দোলনের আবর্তে পড়ে তিন মাসের স্থলে প্রায় তিন বছর তিনি হাইকোর্টে যেতেই পারেন নি। পরে গান্ধীজির অনুমতি নিয়ে তিনি আবার প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল কঠোর সংগ্রামের পর যখন সবেমাত্র ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এবং তাঁর প্র্যাকটিস জমতে শুরু হয়েছে, তখনি তাঁকে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। হাইকোর্টে পুনরায় ফিরে এসেও কর্পোরেশন ও কাউন্সিলের কাজে তাঁকে এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হতো যে, এদিকে তিনি প্রয়োজনমত সময় দিতেই পারতেন না। সেইজন্য ব্যবসায়ে থেকেও তিনি নামেমাত্র ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর ফলে অনেক সময়ে ব্রীফ গ্রহণ করেও তা ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। বাওলা-হত্যা মামলাটি ছিল এরই একটি দৃষ্টান্ত।

এই সুবিখ্যাত মামলায় যখন (১৯২৪) তিনি প্রধান আসামীর পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত হন তখন দেশবন্ধু জীবিত ছিলেন। কাউন্সিল চলছে—সেখানে তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। যদি বোম্বাই হাইকোর্ট তাঁকে সময় না দিতেন তাহলে যতীন্দ্রমোহনের পক্ষে প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার এই মামলাটি গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভবপর হতো না। প্রকৃত কথা এই যে, মানুষকে বিচার করতে হলে তার ভিতরটা দেখতে হয়, বাইরের দিকটা দেখে বিচার করা কখনই সঙ্গত নয়। তাই কোনো প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই আমরা বলব যে, তাঁর যদি অভাব অনটন না থাকত তবে অনেক আগেই তিনি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিতেন, কারণ দেশসেবার কাজে তিনি

নিজেকে সম্পূর্ণভাবেই সঁপে দিয়েছিলেন। অর্থ উপার্জনটা তাঁর কাছে গৌণ ছিল, মুখ্য হয়ে উঠেছিল দেশের কাজ। তাই দেখা যায় যে, দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে বাংলার নেতৃত্বের সকল দায়-দায়িত্ব যখন তাঁর উপর ন্যস্ত হলো, তখন ব্যবসায়ে তিনি একরকম উদাসীন ছিলেন বললেই হয়। আইনের বই বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন, তথাপি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হন নি। শেষজীবনে তাঁকে তো এইজন্যই ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু সে-সব ইতিহাসের সন্ধান কে রাখে? দুঃখের বিষয়, যতীন্দ্রমোহনের মতো এহেন কৃতবিদ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবীর মৃত্যুতে হাইকোর্টে কোনো আলোচনা বা শোকসভার অনুষ্ঠান হয় নি।

দেশপ্রিয়ের নেতৃত্বের মূলে ছিল তাঁর বাগ্মিতা। আমরা আগেই বলেছি যে, তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই যতীন্দ্রমোহন সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন। বহু যত্নে তিনি এই অভ্যাস আয়ত্ত করেছিলেন। উত্তরকালে রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করার পর এবং বিশেষ করে দেশবন্ধুর সহকর্মীরূপে কাউন্সিলে প্রবেশ করার পর থেকেই তাঁর বক্তৃতা-শক্তি যথার্থ পরিণতি লাভ করে। যখন তিনি নেতৃত্বের তুঙ্গ-শিখরে, তখন তো যতীন্দ্রমোহনের বাগ্মিতা সারা ভারতের প্রশংসা লাভ করেছিল। গান্ধী-যুগে আমরা একাধিক বক্তাকে পেয়েছি—পেয়েছি বিপিনচন্দ্রকে, পেয়েছি দেশবন্ধুকে, পেয়েছি শ্যামসুন্দরকে এবং আরো অনেককেই। এঁদের প্রত্যেকের বাগ্মিতার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। দেশপ্রিয়ের বক্তৃতারও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল যা তাঁর শ্রোতাকে মুগ্ধ করত, আলোড়িত করত। আইনসভায় স্যর মন্মথনাথ চৌধুরী যখন সভাপতি ছিলেন তখন স্বরাজ্য দলপতি যতীন্দ্রমোহনের বক্তৃতা শুনে তিনি তাঁকে একজন যথার্থ শক্তিশালী বক্তা হিসাবে বর্ণনা করেছেন—'The most elequent, persuasive and forceful public speaker of his time.' তাঁর বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরাই এই

উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করবেন। আন্তরিকতা, সরলতা ও যুক্তির সমাবেশে যতীন্দ্রমোহনের বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে এক গভীর আবেগের সঞ্চার করে দিত। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল প্রকৃতি-দত্ত এক দুর্লভ সম্পদ আর সেইসঙ্গে মিলেছিল অপূর্ব প্রাণোচ্ছলতা। ইংরেজী ও বাংলায় সমান দক্ষতার সঙ্গেই তিনি বক্তৃতা দিতে পারতেন।

আগেই বলেছি, রাজনীতিতে দেশপ্রিয়কে বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে বহুবার, যেমন ঘটেছিল তাঁর নেতা দেশবন্ধুর জীবনে। তার চেয়েও বড়ো কথা ছিল দলীয় কলহ ও সংঘর্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব কোনোদিন গ্লানিযুক্ত হতে দেখা যায় নি। তাঁর অন্তরের সরলতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে করে তুলেছিল মধুর ও স্নিগ্ধ। তাঁর মন ও মুখ এক ছিল এবং এই গুণেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন যেমন কলুষমুক্ত ছিল, তেমনি উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় ছিল তাঁর সামাজিক জীবন। এই কলকাতা শহরেই তাঁর কত ইংরেজ বন্ধু ছিলেন যাঁদের সঙ্গে রাজনীতি-ক্ষেত্র বৈরিতা থাকলেও, সামাজিক জীবনে ছিল তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা। একজন মানুষের শুচি-শুভ্র মহত্ত্বের পরিচায়ক এর চেয়ে আর কী হতে পারে? 'A nature's gentleman'—এই বোধহয় তাঁর সত্যিকার পরিচয়। এই শ্রেণীর নেতারই আজ বড়ো অভাব।

উপসংহারে আমরা দেশপ্রিয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং প্রখ্যাত অসহযোগী নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের একটি অভিমত উল্লেখ করে আমাদের এই চরিতালোচনা শেষ করছি। কিরণশঙ্কর লিখেছেন: 'রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময়োপযোগী নীতির উদ্ভাবন করিবার শক্তি যতীন্দ্রমোহনের ছিল। একদিকে তিনি যেমন অকুতোভয় যোদ্ধা ছিলেন, অন্যদিকে তিনি তেমন কৌশলী সেনাপতি ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি তাঁহার গুরু দেশবন্ধুর শিক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।...বাদ-বিসম্বাদ ও মতান্তর সত্ত্বেও তাঁহার উদার চরিত্রে আমাদের শ্রদ্ধা কিছুমাত্র কমিয়া যায় নাই।

তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়া আমরাও যেরূপ বেদনা পাইয়াছি, আমাদের সহিত ছাড়াছাড়ি হওয়াতে তিনিও কম পান নাই।'

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে তাঁর 'সার্ভেন্ট' পত্রিকায় শ্যামসুন্দর লিখেছিলেন :

'The passion for freedom has consumed his physical frame. It is a death which is the envy of mortals. · Few could have died in a brighter blaze of glory'.

দেশপ্রিয় সম্পর্কে আমরাও কি এই কথাগুলি প্রয়োগ করতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। আমরা দেখেছি, স্বাধীনতার জন্য যে তীব্র দহন জ্বালা তিনি বোধ করতেন তাতেই তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল। দেশবন্ধুর মতো দেশপ্রিয়কেও আমরা দেখলাম সেই একই গৌরব-উদ্ভাসিত মৃত্যুকে বরণ করতে—এমন মৃত্যু খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। অপূর্ব তার জীবন, অপূর্ব তার মরণ—এই অপূর্ব জীবন-মরণের ভিতর দিয়েই তো দেশপ্রিয় স্বরাজের সাধনা করে গিয়েছেন।

সবশেষে বলব যে, তার পিতার মতো যতীন্দ্রমোহনও বলতে পারতেন : 'দেশপ্রেম বা দেশসেবায় আত্মনিয়োগের আকাঙ্ক্ষায় আমি কারো কাছে ন্যূনতা স্বীকার করি না।' তাঁর মহিমান্বিত জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় এই প্রত্যয়ের উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে।